সূচীপত্র।

নানা-কথা।

তেল, নুন, লক্ড়ি।

যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশীরকমে অভ্যাস করেছি, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশী নিয়মে চর্চ্চা কর্‌তে হবে। আমরা সাহেব হয়েছিলুম বাঙ্গালীভাবে। সে ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক ঢিলেমি এবং এলো-মেলোভাবেরই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দলবেধে বিধিব্যবস্থাপূর্ব্বক সাহেব হইনি। প্রতিজনেই নিজের খুসি কিম্বা সুবিধা অনুসারে, নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ-সাহেব হয়ে উঠেছি। ইঙ্গ-বঙ্গসমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। স্বদেশী আচার-ব্যবহার ছাড়্‌বার সময় আমরা পুরুষেরা পহিলা সমিতি করিনি, এখন ফিরে ধর্‌বার ইচ্ছেয় আমরা মহিলা-সমিতি পর্য্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে, আমাদের নূতন ভাব কার্য্যে পরিণত কর্‌তে হলে ভাবনা-চিন্তা চাই; কি রাখ্‌ব, কি ছাড়্‌ব, তার বিচার চাই; পাঁচজনে একত্র হয়ে কি কর্‌তে পারব এবং কি করা উচিত, তার একটা মীমাংসা করা চাই; এক কথায়, ইংরেজ যে উপায়ে কৃতকার্য্য হয়েছে সেই উপায়—একটা পদ্ধতি, অবলম্বন করা চাই। সমাজ থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে যাবার ভিতর নিয়ম নেই। ঝোঁকের

মাথায় রোখের সহিত কাজ কর্‌তে গেলে দিক্‌বিদিকজ্ঞানশূন্য হওয়াই দরকার। কিন্তু সমাজে থাক্‌তে কিম্বা ফির্‌তে হলে, সকলেরই মানসিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই, এক নিয়মে অনেককে ধরা দেওয়া চাই। আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিল না, স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই। যে পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি, তার বিষয় হচ্ছে প্রধানত বাহ্যবস্তু। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সুসাধ্য কর্‌তে হলে, মনকে অনেকটা খাটাতে হবে। সমাজে থাক্‌তে হলে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোন চর্চ্চা কর্‌বার দরকার নেই, প্রচলিত নিয়মের নির্ব্বিচারে দাসত্ব স্বীকার কর্‌লেই হল; ছাড়্‌তে হলেও দরকার নেই—নির্ব্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌লেই হল। কিন্তু ফির্‌তে হলে, মানুষ হওয়া চাই; কারণ যে ফেরে, সে নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করে নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে। আমরা বাঙ্গালী-সাহেবই হই, আর খাঁটি বাঙ্গালীই হই, আমরা সকলেই এক পথের পথিক হয়েছিলুম; কেউ বা বিপথে বেশি দূর এগিয়েছি, কেউ বা কিছু পিছিয়ে আছি। আমাদের সমাজস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ণচোরা-বাঙ্গালী-সাহেব। আমাদের হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা অতীতে গঠিত হয়েছিল, আজকালকার দিনে নূতন অবস্থায় কতকাংশে তা সকলেরই পক্ষে শৃঙ্খল মনে হয়। আমরা জনকতক শুধু উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি, বাদবাকী সকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে ফেলেছেন। সুতরাং সকলে মিলেই স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি। সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সুতরাং যে-পরিমাণে সাধ্য এবং উচিত সেই পরিমাণে ফির্‌ব, তার বেশি নয়। জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না বলে, এতদিন আমরা গা
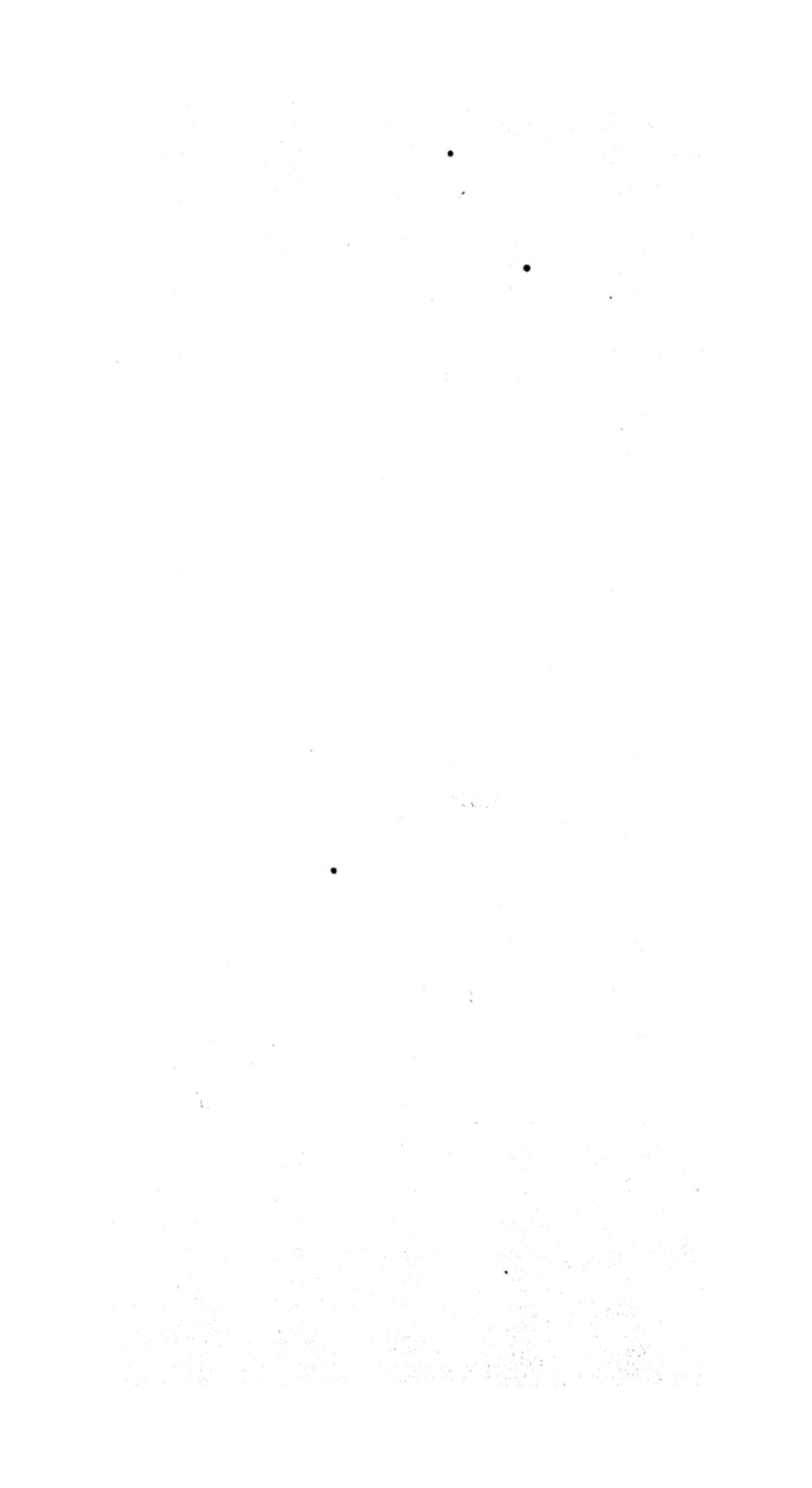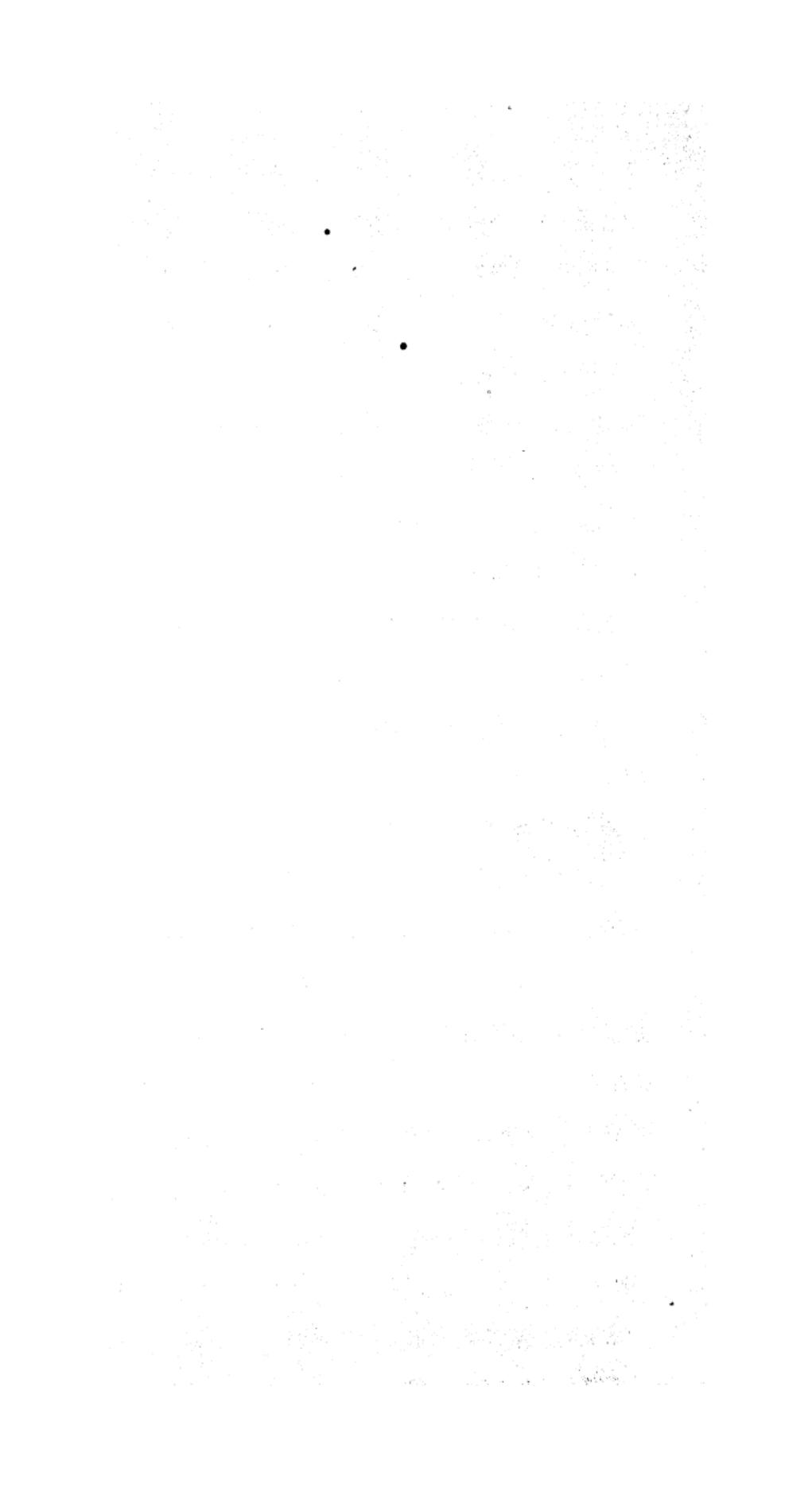
আছে; সেই কবিত্বপূর্ণ দর্শন কিম্বা দার্শনিক কবিত্বের প্রকাশ New India সংবাদপত্রে। উক্ত ব্যাপারের স্বপক্ষে New India-র মতামত, India না হোক্ new বটে। জষ্টিস্ অনুকূল মুখার্জ্জির জীবনীর ভাষা যেমন নতুন, এর ভাবও তেমনি নতুন; এবং উভয় রচনাই এক উপায়ে সিদ্ধ হয়েছে। ইংরাজি, ফরাসি, লাটিন, গ্রীক এবং ইটালিয়ান নানা ছোট-বড় বাছা-বাছা বাক্য ও পদের অসঙ্গত সমাবেশে মুখোপাধ্যায় ম'শায়ের জীবনী-লেখকের রচনা, ভাষার রাজ্যে যেমন এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি;—জীব-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের ছোট-বড় নানা বাছা-বাছা শব্দ এবং বাক্যের অসঙ্গত সমাবেশে সম্পাদক ম'শায়ের রচনা চিন্তার রাজ্যে তেমনি এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। লেখক কিছুই বাদ দেন নি—চিত্রকলাও নয়, নৃত্য-কলাও নয়। কলাবিদ্যার কতকটা জ্ঞান অনেকটা চর্চ্চার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উল্টো। দাম্ভিকতার বলে অজ্ঞতা বিজ্ঞতার সিংহাসনে অধিরোহণ করতে পারে। কলাবিদ্যার শুধু শেষাংশ দেখাবার চেষ্টা করে অনেকে, তাঁরা যে শুধু তার প্রথমাংশ জানেন, এই প্রমাণ করেন। এ বিশ্ব ভগবানের লীলাখেলা হ'তে পারে, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি এবং উন্নতি মানুষের লীলাখেলার ফল নয়। এই প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারের অবতারণা কর্‌বার একটু বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের নকল সভ্যতা এর ঊর্দ্ধে আর উঠতে পারে না। আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা, পেণ্ডুলম্‌কে ঐখান হতেই ফির্‌তে হবে, এবং কার্য্যত ফির্‌তে আরম্ভ করেছে। ঘরে বিদেশী অনাচারের ঠেলা এবং বাইরে বিদেশী অত্যাচারের চাপ, এই দু'য়ের ভিতর পড়ে যাঁরা কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব কর্‌ছিলেন,

তাঁদের অনেকেরই আজ চৈতন্য হয়েছে। ঐ ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেক অন্যমনস্ক লোকেরও মনে পড়ে গেছে যে, আমাদের একটা সমাজ ব'লে কোন জিনিষ নেই। আমরা ঝরা পাতার দল, হাওয়ায় আমাদের কখন বা একত্র জড় করে, কখনও বা ছড়িয়ে দেয়। গাছের অসংখ্য পাতা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হলেও তাদের সকলের ভিতর নাড়ীর এবং রক্তের বন্ধন আছে—তাদের একের প্রাণের মূলও যেখানে, অপরের প্রাণের মূলও সেখানে—দেশের মাটিতে। কিন্তু আজ আমাদের অনেকেরই চোখ ফুটেছে। আমরা নিজের নিজের সঙ্কীর্ণ সমাজ ত্যাগ করলেও, হিন্দুসমাজ আমাদের ত্যাগ করেনি। আমরা নিজেরা শুধু সেই বৃহৎ সমাজের মধ্যে আর একটি সঙ্কীর্ণ সমাজ গড়তে চেষ্টা করেছিলুম,—সৌভাগ্যক্রমে তাতে কৃতকার্য্য হইনি। আজকাল ভারতবাসীর দেহে নূতন প্রাণ এসেছে; হিন্দুসমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজে পরিণত হচ্ছে, জাতের ভাব দূর হয়ে জাতীয় ভাব উপস্থিত হয়েছে, আমরা পরস্পরের পার্থক্য ভুলে গিয়ে স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর পার্থক্য অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। এ অবস্থায় আমাদের স্বদেশীয়তায় ফেরার অর্থ, আমরা যে বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্ভূত হয়েই আছি, সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান জন্মান। আমরা যে সমাজে ফিরছি, সে সমাজ পূর্ব্বে ছিল না, আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয়নি, ভবিষ্যতে তার রূপ যে কি হবে, তাও আমরা আজ ঠিক ধরতে পারিনে। তার স্বরূপ জানবারও কোন আবশ্যক নেই; শুধু এই জানি যে, আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে। সেই শক্তি আমাদের সকলেরই প্রাণে জাগরূক হয়ে উঠেছে, যে শক্তির কার্য্য হচ্ছে আমাদের সমগ্র জাতির অপরূপ শ্রী এবং উন্নতি সাধন করা।

জড় পদার্থ নিয়ে একটা কিছু গড়্‌তে হলে—আগে হতেই একটা plan এবং estimate কর্‌তে হয়; . কিন্তু প্রাণ নিজের আকৃতি নিজে গড়ে নেয়, বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রকৃতি যে ফুল ফোটাবে, মানুষ তার সাহায্য কর্‌তে পারে কিম্বা বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাতে স্বকপোল-কল্পিত বর্ণ, গন্ধ, আকার এনে দিতে পারে না। কাগজের ফুল রচনায় আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, গাছের ফুল ভাল করে ফোটানোতে সে স্বাধীনতা নেই। আমাদের স্বদেশী সমাজের অক্ষয়-বটে নূতন পাতা দেখা দিয়েছে, আমাদের কর্ত্তব্য এখন তার গোড়ায় প্রচুর সার এবং জল যোগান, আর চারপাশের জঞ্জাল ও জঙ্গল দূর করা। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক-সকল স্বদেশী সমাজ অবলম্বন করেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর্‌ব, কিন্তু সে তার শাখা-প্রশাখা হয়ে—পরগাছা হয়ে নয়। সুতরাং আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশী না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা কর্‌তে হবে। আমাদের তন-মন-ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে,—বিদেশের পায়ে নয়। আমাদের এই ধারণাটুকু জন্মানো উচিত যে, আমাদের কেউ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত করে ফেল্‌বার অধিকারী নন; সকলের শক্তি একত্র করে, সংহত করে, স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির কার্য্যে প্রয়োগ কর্‌তে হবে। অল্প হোক্, বিস্তর হোক্, আমাদের প্রত্যেকের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয়, তার জন্য প্রথমত দিকনির্ণয় করা দরকার। তারপর, কোথায় কি উপায়ে নিজশক্তি প্রয়োগ কর্‌তে পারি, তার হিসাব জান্‌তে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার বক্তব্য দেখ্‌তে পাচ্ছি ক্রমে ফলাও এবং গুরুতর হয়ে আস্‌ছে। এই স্থানেই সুতরাং

আমাকে মনের রাশ টেনে ধর্‌তে হবে। এ প্রবন্ধে আমার কতক-গুলো সাদাসিধে ছোটখাটো দৈনিক আচারব্যবহারের আলোচনা কর্‌বার অভিপ্রায় আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখ্‌ছি ধান ভান্‌তে বসে শিবের গীত সুরু করে দিয়েছি। এখন ভূমিকা ছেড়ে জমিতে নামাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। আর একটি কথা বলেই আমি প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ কর্‌ব। সে কথাটি হচ্ছে এই—ভারত-বর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়;—আজকের দিনে নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নূতন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি, তাকেই পত্র-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্ব-দেশের জ্ঞান লাভ কর্‌তে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই। আমাদের নূতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক না কেন, মাটির গুণে তাকে স্বদেশী হতেই হবে। জীবনীশক্তির স্ফূর্ত্তি, পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একটা ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে না, অদ্ভুত সমাজও হবে না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চ্চা কর্‌ছিলুম, কিন্তু ভূতে না পেলে যে অদ্ভুতত্ব বর্জ্জন করা যায় না, এমন নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্ত্তমান অশান্তি শুধু নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্ব বিকারের ছটফটানি নয়। যে সমাজে প্রাণ আছে, সে সমাজে প্রাণের যে প্রধান লক্ষণ,—বাইরের অবস্থার উপযোগী আত্মপরিবর্ত্তন,—সে লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ জগৎ গম ধাতু হতে উৎপন্ন,—এমন গুণী আমরা কেউ নই যে, জগতের ধাত বদলে দিতে পারি। স্বদেশীভাবের মুল হতে অনেক আশার ফুল ফুটবে, কিন্তু ফল

ধর্‌বে না। দেশের মাটি ভালবাসি বলে যে, মাটি নিতে হবে, মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌তে হবে, শেষটা মাটি হতে হবে, এ ভুল যেন কেউ না করেন। আমরা আজ যখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে চলেছি, তখন এইটে মনে রাখ্‌তে হবে যে, দেশের মাটি আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে ভগবানদত্ত অটল নির্ভর। অতীতের যে আগুন নিবেছে, যার এখন ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাতে অতি ভক্তিভরে বাতাস দিলেও শুধু ছাই উড়িয়ে সমাজের চোখে ফেল্‌বো; কিন্তু আমাদের জাতির প্রাণে যেখানে আজও আগুন আছে, সেখানেই ফুঁ দিতে হবে, পাখা কর্‌তে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন,—কোথায় শুধু ছাই, আর কোথায় ছাই-ঢাকা আগুন আছে, কি করে জান্‌ব? তার উত্তর,—যদি স্পর্শ করে আগুন না চিন্‌তে পার ত পাঁজি-পুথির সাহায্যে তা পারবে না। অতঃপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এগোতে হবে। বড়গোছের একটা লাফ মার্‌বার পূর্ব্বে মানুষ কিঞ্চিৎ পিছু হটে পাল্লা নেয় —আমাদের সমাজ এখন পাল্লা নিচ্ছে। সরিসৃপের মত সমাজও ক্রমাগত দেহকে আকুঞ্চন প্রসারণ ক'রে অগ্রসর হয়। কি উপায়ে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্ত্তব্য, সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বল্‌তে উদ্যত হয়েছি।

(২)

বিবাহিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,—

"ভুল গেয়া রাগরঙ্গ, ভুল গেয়া ইয়কড়ি,
ইয়াদ রহা আজ খালি তেল নুন লক্‌ড়ি"।

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আজকাল কতকটা ঐ ভাবের দাঁড়িয়েছে। আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরা এতদিন প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ করবার জন্য কতই না হাবভাব, লীলা-খেলার চর্চ্চা করেছি। ওনার মনোমত কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস বাগ্‌বিন্যাসের চাতুরী অভ্যাস করেছি। আত্মহারা হয়ে ইউরোপের আত্মীয় হতে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নি। এত করেও যখন মন পেলুম না, তখন মান-অভিমানের পালা সুরু করলুম। ফল তাতে উল্টো হল,—দাম্পত্য প্রণয়ের দাবি করাতে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ তেল, নুন, লক্‌ড়ির কথাই আমাদের মনে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানবজাতিকে আমরা যে যেই ভাবে দেখি না কেন, মানবজীবনে সকলেই তেল, নুন, লক্‌ড়ির গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। দেহকে আত্মার কারাগারই মনে করি, আর আত্মার মন্দিরই মনে করি, এ পৃথিবীতে দেহমনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন গড়তে হবে। ইহলোকের সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করলে শুধু পরলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে অন্ন প্রাণ। সুতরাং অন্নচিন্তাই প্রাণীমাত্রেরই আদিম চিন্তা। এই অন্নচিন্তা হতে উদ্ধার না পেলে অন্য চিন্তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেল, নুন, লক্‌ড়ির অধীনতাপাশ মোচন না করতে পারলে, মনের এবং আত্মার পুরো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। Material prosperity সভ্যতার চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু একটি বিশিষ্ট উপায়। তেল, নুন, লক্‌ড়ির অধীনতা হতে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়—তেল, নুন, লক্‌ড়ির সংস্থান করা। আমাদের আজ হঠাৎ চৈতন্য হয়েছে যে, ভারতবাসীর সে সংস্থান নেই। আমরা শুকিয়ে যাচ্ছি, কেননা

দেশের রস বিদেশে টেনে নিচ্ছে। নিজ দেশের রস নিজ দেহের রক্তে কিরূপে পরিণত কর্‌তে পারি, সেই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, তাহলে আমাদের "রাগরঙ্গ ইয়কড়ি" ভুলে যেতে হবে, আর আমাদের মনে যদি না থাকে, তা হ'লে মনে রাখ্‌তে হবে, শুধু "তেল নুন লক্‌ড়ি" রাস্কিন্ সমস্ত জীবন ধরে' ইংলণ্ডকে এই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, economics—এই গ্রীক শব্দের আদিম অর্থ household management, অর্থাৎ গেরস্থালী। প্রতিগৃহে যদি লক্ষ্মী না থাকেন, তা হলে সমগ্রজাতি লক্ষ্মীছাড়া হবে। ঘর যদি অগোছাল রাখ, তাহ'লে হাটে-বাজারে যতই কেনা-বেচা করনা কেন, তাতে নিজে কিম্বা জাতি যথার্থ শ্রী এবং সুখলাভে সমর্থ হবে না। এ মতের মধ্যে এইটুকু খাঁটি সত্য নিহিত আছে যে, দশে মিলে জাতীয় সমৃদ্ধিলাভের যে সমবেত চেষ্টা করি, তার সুফল আমরা ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাচারিতায় নিস্ফল করে দিতে পারি। আমরা যদি সকলে একত্র হয়ে বাইরে একদিকে টানি, আর প্রতিলোক ঘরে এসে তার উল্টো টান টানি—তাহ'লে ঘর বার দুই নষ্ট হবে। আমি রাস্কিনের শিষ্যস্বরূপে এই কথা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছি যে, সু-গৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ—গৃহের সম্মার্জ্জনা করা।

(৩)

আমরা যে গৃহে বাস করি, সে যে কোন্ দেশীয় বলা কঠিন। বাঙ্গলার বাইরে, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কোথায়ও তার জুড়ি দেখ্‌তে পাইনে। গৃহ যেমন সমাজের মূল, তেমনি আবার সহরেরও বুনিয়াদ। গৃহ হতে পল্লী, পল্লী হতে নগর,

নগর হতে সহর,—ক্রমবিকাশের এই নিয়ম। রোম, প্যারিস্ প্রভৃতি বনেদি সহরের architecture-এতেই তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। ঐ architecture-এর প্রসাদেই নাগরিকগণ বর্ত্তমানে অতীতের সঙ্গে ঘর করে, অতীতের সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, সফলতা ও বিফলতা, গৌরব ও লজ্জা অলক্ষিতে তাদের মন অধিকার করে নেয়; প্রত্যেকেই নিজের আত্মার ভিতর বৃহত্তর জাতীয় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের পক্ষে স্বজাতীয়তার ও স্বদেশীয়তার কাছে নিজেদের ধরা দেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক; তা হ'তে মুক্তি পাওয়াই আয়াসসাধ্য। আমাদের ভিতর মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরা যেমন অহংজ্ঞান খর্ব্ব ক'রে, স্বজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন—তেমনি ইউরোপের মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরাও স্বজাতিজ্ঞান খর্ব্ব ক'রে, মানবজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করেন। আমাদের সাধনার বিষয় হচ্চে Nationalism, তাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্ছে Internationalism। সে যাই হোক, কলিকাতার মত ভুঁই-ফোঁড় সহরে, শ্রীহীন, অর্থহীন, কিম্ভূতকিমাকার ভুঁইফোঁড় গৃহে বাস ক'রে, আমাদের পক্ষে স্বদেশী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়। চক-মেলানো বাড়ী হালফেসানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একটি লম্বা গোছের ঘর, তার এপাশে দুটি, ওপাশে দুটি—এই পাঁচ কামরা নিয়ে আমাদের গৃহ। মধ্যের ঘরটি হচ্ছে বাইরের ঘর, এবং উভয় পার্শ্বের বহির্দিকের ঘর কটী হচ্ছে অন্দর। বাসস্থানের এই উল্টোপাল্টা ভাবের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের বরাবর যোগ রয়ে গেছে। আমাদের গ্রীষ্মের দেশে ঘরে হাওয়াও চাই ছায়াও চাই,—এক সঙ্গে দুই পাওয়া অসম্ভব

ব'লে এদেশের গৃহ দুভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক অংশ বায়ুর পক্ষে যথেষ্ট খোলা, অপর অংশ সূর্য্যের পক্ষে যথেষ্ট রুদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত মিলে মানুষের গৃহনির্ম্মাণের হিসাব বাৎলে দেয়। প্রকৃতিই এদেশের গৃহ, সদর এবং অন্দরে ভাগ করতে শিখিয়েছিলেন। এবং আমাদের সমাজের গঠনও গৃহের গঠনের অনেকটা অনুসরণ করেছে। এই কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অবরোধ একটি সামাজিক প্রথা। আমার বিশ্বাস, এই কড়া রোদ এবং চড়া আলোর দেশে অসূর্য্যম্পশ্যা হ'বার লোভেই রমণীজাতি স্বেচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন। যেখানে গৃহে স্ত্রী-পুরুষের স্বতন্ত্র রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট নেই—সেখানে সমাজেও স্ত্রী-পুরুষের সাম্য অর্থে ঐক্য—এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করে। ইংরেজিয়ানার প্রসাদে আমাদের বাসগৃহের সদর অন্দর ভেস্তে যাবার প্রধান ফল এই যে, আমাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গৃহে অনেকটা সঙ্কুচিত ভাবে বাস করে। আমাদের ড্রয়িংরুম পাড়া-পড়সীর বৈঠকখানা হতে পারে না, এবং বাড়ীর কোন অংশই মেয়েদের দুর্গ নয়। এ দেশটি যে বিদেশ, সেটা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখ্‌বার জন্য ইংরাজ দেশীয় সমাজ হতে আলগোছ হয়ে থাকেন, নইলে ভয় পাছে জাতিরক্ষা না হয়। আমরা তাঁদের অনুকরণে বাসা বাঁধ্‌লে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ব-সমাজ হতে দূর হয়ে পড়ি। মোটামুটি আমার বক্তব্য কথা এই, মানুষমাত্রেরই দেশের সঙ্গে প্রধান যোগ গৃহ দিয়ে; স্বদেশীয়তার গোড়াপত্তন ঐখানেই, গৃহসূত্র হ'তেই মানবধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। গৃহের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীর রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমি কাউকে বাড়ীবদ্‌লানোর পরামর্শ দিয়ে লোকসমাজে নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে প্রমাণ করতে রাজি

নই। এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যতের আশার একমাত্র ভরসা—একটা বড় গোছের ভূমিকম্প।

গৃহে প্রবেশ করেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখ্‌তে পাই যে, বিদেশী বস্তু আমাদের গৃহ আক্রমণ করেছে, এবং তার অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করে বসে আছে। সাহেবিয়ানার খাতিরে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভবরকম জটিল হয়ে পড়েছে। আস্‌বাবের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকাই মুস্কিল, চলে ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা ত একবারেই নেই। এই জটিলতার মধ্যে সকলকেই কুটিল গতি অবলম্বন কর্‌তে হয়। প্রথমেই মনে হয় যে, এ ঘর বাসের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য নয়,—সাজাবার জন্য, দেখাবার জন্য; গৃহস্বামীর ধন এবং শিক্ষার পরিচয় দেবার একটা প্রদর্শনী মাত্র—লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলনের অ-প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের নূতন ধরণের গৃহসজ্জার বর্ণনা কর্‌বার কোনও দরকার নেই, কারণ তা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। চেয়ার, টেবিল, কোচ, টিপয়, পিয়ানো, আয়না, ছিটের পরদা, ব্রাসেল্‌সের কারপেট, চীনের পুতুল, ওলিওগ্রাফের ছবি,—এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ এবং নিদর্শন। গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে এই সকল উপকরণ হয় Lazarus এবং Osler, নয় বৌবাজারের বিক্রী-ওয়ালার দোকান হতে সংগ্রহ করা হয়। যিনি ধনী, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখ্‌তে দোকান বলে ভুল হয়। আর যিনি লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখ্‌তে যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতাল বলে ভ্রম হয়; আসবাব-পত্র সব যেন লড়াই থেকে ফিরে এসে, হয় মেরামত, নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। কোন চৌকির হাত নেই, কোন টিপয়ের পা নেই, কোন টেবিলের

পক্ষাঘাত হয়েছে ; পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কৌচের নাড়িভুঁড়ি নির্গত হয়ে পড়েছে, চীনের পুতুলের ধড় আছে, কিন্তু মুণ্ডু নেই, পারিস পালেস্তারার ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত ; ওলিওগ্রাফ সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে, আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো দন্তহীন এবং হারমোনিয়ম শ্বাসরোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা এই সকল অব্যবহার্য্য, কদর্য্য আবর্জ্জনা দূর করে, তার পরিবর্ত্তে ফরাস বিছিয়ে বসি না কেন ?—কারণ ইংরাজের কাছে আমরা শিখেছি যে, দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।

আমাদের এই নবসভ্যতার আজবঘরে স্বর্গীয় পিতামহগণ যদি দৈবাৎ এসে উপস্থিত হন, তাহলে নিঃসন্দেহ সব দেখেশুনে তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। অবাক হয়ে তাঁরা ঊর্দ্ধনেত্রে চেয়ে থাক্‌বেন, নির্ব্বাক্ হয়ে আমরাও অধোবদনে বসে থাক্‌ব। উভয় পক্ষে কোন বোঝা-পড়া হওয়া অসম্ভব। অপরিচিত অশন-বসন, আসন ভূষণের ভিতরে কিরূপে জাতি রক্ষা হয়, তা তাঁরা বুঝতে পারবেন না ; কৈফিয়ৎ চাইলে আমাদের মধ্যে যাঁর কিছু বল্‌বার আছে, তিনি সম্ভবত এই উত্তর দেবেন যে, "জাতি শব্দের অর্থ আপনাদের নিকট সংঙ্কীর্ণ ছিল, আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে। রক্ষা অর্থে আপনারা বুঝ্‌তেন শুধু স্থিতি, আমরা বুঝি উন্নতি ; আপনাদের গুরু ছিল মনু, আমাদের গুরু হার্বার্ট স্পেন্‌সার ; আমাদের নূতন চাল আপনাদের হিসাবে জাতিরক্ষার প্রতিকূল, কিন্তু আমাদের হিসাবে অনুকূল"। এ কথা যদি সত্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তাহলে আমার আপত্তির কোন কারণ নেই ; কেননা যে প্রথা অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, এমন কি, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আচার-

ব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে, আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন, জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন কর্‌তেই হবে, তার কোন প্রমাণ নেই। গতিমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান-ভূমি আছে, একটি দিক নির্দ্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্ব্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়। কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করি, সেটা যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তেমনি কোন্ সমাজে জন্মগ্রহণ করি, সেও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। পরিবর্ত্তন যেমন কালসাপেক্ষ, পরিবর্দ্ধন তেমনি দেশ ও পাত্রসাপেক্ষ। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনের মূলে পূর্ব্বপুরুষরা বিরাজ কর্‌ছেন, এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সামাজিকতার মূলে পূর্ব্বপুরুষদের সমাজ বিরাজ কর্‌ছে। বংশপরম্পরা heredity হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন উন্নতি অসম্ভব। যে গৃহে পূর্ব্বপুরুষদের স্থান হয় না, সে গৃহে ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু মানবজীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। স্মৃতি যেমন প্রতি মানবের অহংজ্ঞানের মূল,—পূর্ব্বাপরের যোগসূত্র-স্বরূপ স্মৃতির অস্তিত্ব না থাক্‌লে, আত্মোন্নতি দূরে থাকুক কেহই আত্মার সন্ধানও পেতেন না,—তেমনি অতীতের স্মৃতি জাতীয় অহংজ্ঞানেরও মূল। অতীতের জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন জাতি জাতীয় আত্মার সন্ধান পায় না,—জাতীয় আত্মোন্নতি দূরে থাকুক। সামাজিক জীবের পক্ষে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হচ্চে, পিতা-পিতামহ ইত্যাদি, এবং ক্ষেত্র হচ্ছে বাস্তু। সেই বাস্তুজ্ঞান-রহিত হলে আমাদের বস্তুজ্ঞানশূন্য হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তর্ক

তুলে ইঙ্গ-বঙ্গনামক খেটে-খাওয়াদলের লোককে বিরক্ত কর্বার কোন সার্থকতা নেই। এঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দেন, আলোচনা বন্ধ কর্বার জন্য—আরম্ভ কর্বার জন্য নয়। হার্বার্ট স্পেন্সার এঁদের গুরু, কিন্তু শিক্ষাগুরু নন্, দীক্ষাগুরু। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে এঁরা কিছুই শিক্ষালাভ করেন নি, শুধু দুটি একটি বীজমন্ত্র গ্রহণ করেছেন,—যথা, সভ্যতা উন্নতি ইত্যাদি। অন্যান্য তান্ত্রিকদের মত এই তান্ত্রিকদেরও নিকটে বীজমন্ত্র যত দুর্ব্বোধ, সম্ভবত যত অর্থশূন্য, তত তার মাহাত্ম্য। ইউরোপীয় সভ্যতা এঁরা জ্ঞানের দ্বারা পেতে চাম্ না, ভক্তির দ্বারা পেতে চান। দাস্যভাব সখ্যভাবের চর্চ্চাই এঁরা মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করেছেন। আমরা এঁদের যে অবস্থাটাকে দুর্দ্দশা বলে মনে করি, সেটি শুধু ইউরোপ-ভক্তির দশা মাত্র।

যাঁরা তর্ক কর্তে প্রস্তুত, তাঁরা তর্কে হার মান্তেও প্রস্তুত, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গের মনোভাব এই যে, নগদ দামে না হয়, ধার ক'রে দুখানা কোচ কেজ কিন্ব,—এর মধ্যে আবার দর্শন বিজ্ঞান কোথায়? নিজের কি আবশ্যক এবং নিজের কি মনোমত, সেটা ঠিক কর্তে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করবার দরকার নেই। সুতরাং সাহেবিয়ানার স্বপক্ষে এঁরা হয় সুবিধা, না হয় সুরুচির দোহাই দেন। যখন beauty-র দোহাই চলে না, তখন utility-র দোহাই দেন; যখন utility-র দোহাই চলে না, তখন beauty-র দোহাই দেন। যখন এ শ্রেণীর লোকেরা বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের utility-র ব্যাখ্যান সুরু করেন, তখন মনে হয় এঁরা জনষ্টুয়ার্ট মিলের কৃষ্ণপক্ষীয় সন্তান; আর যখন এঁরা বিলাতি ছিট, বিলাতি কারপেটের beauty-র ব্যাখ্যান সুরু করেন, তখন মনে হয়

Oscar Wilde-এর মাসতুতো ভাই। উদাহরণস্বরূপ—যদি কেউ এঁদের জিজ্ঞাসা করে যে, জেল কিম্বা পাগলাগারদের অধিবাসী না হয়েও চুলের অবস্থা ও রকম কেন, এঁরা হেসে উত্তর কর্‌বেন "আমরা কবি নই, কাজের লোক"। এঁদের বিশ্বাস দোঁ-আঁস্‌লা কুকুরের ল্যাজের মত ইঙ্গ-বঙ্গের চুল যত গোড়াঘেঁসে কাটা যায়, তার তেজ তত বৃদ্ধি হয়, তত রোখ বাড়ে। এবং এই বিশ্বাস মিলের (Mill) মতানুযায়ী। এঁদের রুচিসম্বন্ধেও এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ইংরাজি আসবাবের আবশ্যকতা এবং সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক।

বিদেশীরকমে ঘর সাজানোতে যে আমাদের কি পর্য্যন্ত অর্থের শ্রাদ্ধ হয়, তা ত সকলেই জানেন। অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গের পক্ষে ঠাট্ বজায় রাখ্‌তেই প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হতে হয়। ধার-করা সভ্যতা রক্ষা কর্‌তে শুধু ধার বাড়ে। আমাদের এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে অনাবশ্যক বহুব্যয়সাধ্য আচার-ব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকী ত বটেই, সম্ভবত অন্যায়ও; ক্ষমতার বহির্ভূত চাল বাড়ানো, গৃহ হতে লক্ষ্মীকে বিদায় কর্‌বার প্রশস্ত উপায়। তা ছাড়া বিদেশীর অনুকরণে বিদেশী বস্তুতে যদি গৃহ পূর্ণ করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, দেশের ধনে যদি বিদেশীর পকেট পূর্ণ করতে হয়, তাহলে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সে অনুকরণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইউরোপে সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত বাড়ান যায়, জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিষ্কার হয়। যদি আমার এত না হলে দিন চলে না এমন হয়, তাহলে তত সংগ্রহ কর্‌বার জন্য পরিশ্রম স্বীকার কর্‌তে হবে; এবং যে জাতি যত অধিক শ্রম স্বীকার কর্‌তে বাধ্য, সে জাতি তত উন্নত, তত সৌভাগ্য-

বান। কিন্তু ফলে কি দেখতে পাওয়া যায়? ইউরোপবাসীরা এই বাহুল্যচর্চ্চার দ্বারা জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে বলে' কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসিয়াবাসীদের নিকট সর্ব্বত্রই হার মান্‌ছে। এই কারণেই দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চীনে, জাপানী, হিন্দুস্থানী শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে নানা গর্হিত বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এসিয়াবাসীরা খাওয়া-পরাটা দেহধারণের জন্য আবশ্যক মনে করে, মনের সুখের জন্য নয়; সেইজন্য তারা পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই সন্তোষ আমাদের জাতিরক্ষার, জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমরা যদি আমাদের পরিশ্রমের ফলের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ লাভ কর্‌তুম, আমরা যদি বঞ্চিত, প্রতারিত না হতুম, তাহলে দেশে অন্নের জন্য এত হাহাকার উঠ্‌ত না। আমাদের এ দোষে কেউ দোষী কর্‌বেন না যে, আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিনে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে। আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষিত লোকের, বিশেষতঃ ইঙ্গ-বঙ্গসম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, standard of life বাড়ানো সভ্যতার একটি অঙ্গ। এ সর্ব্বনেশে ধারণা তাঁদের মন থেকে যত শীঘ্র দূর হয় ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। উপরোক্ত যুক্তি ছাড়া জীবনযাত্রার উপযোগী ইউরোপীয় সরঞ্জামের স্বপক্ষে আর কোন যুক্তি শুনেছি বলে ত মনে পড়ে না। তবে অনেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বলে থাকেন, "আমার খুসি"! আমাদের দেশের রাজা সমাজের অধিনায়ক নন্। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা এদেশে কখন সামাজিক দলপতি হতে পারেন না—সুতরাং আমাদের সমাজে এখন অরাজকতা প্রবেশ করেছে। যে সমাজে শাস্ত্র আছে কিন্তু

শাসন মানাবার কোনও উপায় নেই, সেখানে শাসন না মেনে,—যে কাজে কোনও বাইরের শাস্তি নেই, সে কার্য্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে, এঁরা যে নিজেদের বিশেষরূপে নির্ভীক, স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দ্দূল বলে প্রমাণ করেন, তার আর সন্দেহ কি? অবশ্য এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, এঁদের "খুসি", প্রভুদের খুসির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বদলায়। সে ত হবারই কথা। এঁরাও সভ্য, তাঁরাও সভ্য, সুতরাং পরস্পরের মিল,—সে শুধু সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যদি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, চেয়ার, টেবিল, কোচ, মেজ, ইত্যাদি দেহ, আত্মা, কিম্বা মনের উন্নতির কিরূপে এবং কতদূর সাহায্য করে, তাহ'লে আমি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকব, কারণ সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, চৌকি, কোচ অনেকটা আরামের জিনিষ, এবং আমরা অনেকেই অভ্যস্ত আরামভোগে বঞ্চিত হ'তে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদণ্ড কিঞ্চিৎ কম-জোর এবং ঈষৎ বক্র, সুতরাং আমরা পৃষ্ঠের একটা আশ্রয়ের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী। এবং আরাম-চৌকি এখন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যোগশাস্ত্রে বলে, সকলপ্রকার আত্মোন্নতির মূলে সরল পৃষ্ঠদণ্ড বর্ত্তমান। সুতরাং যোগের প্রথম সাধনা হচ্ছে আসন অভ্যাস করা—পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করা। দাসজাতির দেহভঙ্গী স্ত্রীলোকের মত, সম্মুখ দিকে ঈষৎ আনমিত,—অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভারে নয়, অতি অভ্যস্ত সেলাম এবং নমস্কারচর্চ্চাবশত। আমাদের জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগ্রত করতে হয়, তাহলে আমাদের পিঠের দাঁড়া খাড়া করতে হবে, অনেক অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ করতে হবে। সুতরাং একমাত্র দৈহিক আরামের খাতিরে বিদেশী

আসবাবের প্রচার এবং অবলম্বন সমর্থন করা যায় না। সকলেই জানেন যে, জাপান ইউরোপের কাছে যা শিখেছে আমরা তা শিখি নি; কিন্তু খুব কম লোকেই জানেন যে, ইউরোপের কাছে আমরা যা শিখেছি জাপান তা শেখেনি। ফলে ইউরোপের সঙ্গে কারবারে জাপান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে, ইউরোপের সঙ্গে কারবারে আমরা শুধু শক্তির অপচয় করেছি। এই কারণেই আমাদের জাপানের কাছে এই শিক্ষালাভ করতে হবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কি আমাদের বর্জ্জন করা উচিত। এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাটাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান দরকার, এবং জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আমাদের গুরু হতে পারে না, কারণ জাপান শুধু এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করেছে।—খাওয়া-পরা-থাকা-শোওয়া সম্বন্ধে জাপান স্বদেশের সনাতন প্রথা ত্যাগ করে নি। বিলেতি আস্‌বাব জাপানের ঘরে স্থান পায় নি। আজও সমগ্র জাপান মাদুরের উপর বীরাসনে আসীন। *

(৪)

বিলেতি জিনিষের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিচার শেষ করে, এখন তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক।

* জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ যাঁরা জান্‌তে চান তাঁদের আমি বক্ষ্যমান গ্রন্থগুলি পড়্‌তে অনুরোধ করি:—K. Okakura-র Ideals of the East এবং The Awakening of Japan, Y. Okakura-র Spirit of Japan, Nitobe-র Bushido, Lafcadio Hearn-এর Kokora প্রমুখ গ্রন্থাবলী। যদি কারও এত বই পড়বার সময় এবং সুবিধা না থাকে এবং ফরাসি ভাষা জানা থাকে, তাহলে তাঁকে আমি Felicien Challaye-র Au Japan নামক গ্রন্থ পড়্‌তে অনুরোধ করি। লেখক গুটি পঞ্চাশ পাতায় আসল কথা অতি পরিষ্কার করে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের দেশে যে ছেলের কিছু হবার নয় তাকে আর্টস্কুলে পাঠানো হয়; এবং ঐ একই কারণে যুক্তি যখন অন্য কোন দাঁড়াবার স্থান না পায় তখন তা আর্টের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনায় "আমি বিশ্বাস করি"—এ কথার উপর যেমন আর কোন কথা চলে না; আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় "আমার চোখে সুন্দর লাগে" এ কথার উপরও তেমনি আর কোন কথা চলে না। সৌন্দর্য্য অনুভূতির বিষয়—জ্ঞানের বিষয় নয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে তার প্রমাণ দেওয়া যায় না। অতএব যিনি আর্ট জিনিষটা অপরকে যত কম বোঝাতে পারেন, নিজে তিনি তত বেশী বোঝেন। ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হলেও সম্ভবত লোক ধর্ম্মজ্ঞ হতে পারে, কিন্তু রূপসম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোকে সৌন্দর্য্যজ্ঞ হতে পারে না। কারণ সৌন্দর্য্য স্ব-প্রকাশ। সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং অস্তিত্ব উভয়ই কেবলমাত্র প্রকাশের উপর নির্ভর করে। সেই পদার্থকে আমরা সুন্দর বলি, যার স্বরূপ পূর্ণব্যক্ত হয়েছে। রূপ হচ্ছে বিশ্বের ভাষা, এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শেষ কথা। প্রকৃতিও বৃথায় কিছু করেন না, মানুষেও বিনা উদ্দেশ্যে কোনও পদার্থে হাত দেয় না। যা মানবজীবনের পক্ষে আবশ্যকীয়, মানুষে তাই হাতে গড়ে; সেই গঠনকার্য্যের সার্থকতা এবং কৃতার্থতার নামই আর্ট। নিরর্থক দ্রব্য সুন্দর হয় না। আবশ্যকতার বিরহে সৌন্দর্য্য শুকিয়ে মারা যায়। সুতরাং যে জাতির পক্ষে যে সকল জিনিষ জীবনযাত্রার জন্যে আবশ্যকীয় নয়, সে জাতির পক্ষে সে সকল জিনিষের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন। আর্ট একটি সৃষ্টি-প্রকরণ, একটি ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং আর্টের প্রাণ কর্ত্তার হাতে এবং মনে, ভোক্তার চোখে এবং কাণে নয়।

আর্টের সন্ধান তার স্রষ্টার কাছে মেলে, দর্শক কিম্বা শ্রোতার কাছে নয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্‌বার ভিতর যেটুকু আনন্দ, প্রাণ ও ক্ষমতা আছে, সেইটুকু অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য ভোগ করা। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে যে আর্টিষ্টের সঙ্গে আমাদের চরিত্রের, ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের, রীতি এবং নীতির মিল আছে, আমরা অনেক পরিমাণে যার সুখ-দুঃখের ভাগী, যার সঙ্গে আমরা একই বাহ্য প্রকৃতির ভিতর, একই সমাজের অন্তর্ভূত হয়ে বাস করি, তার আর্টই আমদের পক্ষে যথার্থ আর্ট। বিদেশী এবং বিজাতীয় আর্টের আদর কেবল কাল্পনিক মাত্র। এই কারণেই আমাদের অনেকেরই পক্ষে বিদেশী আর্টের চর্চ্চাটা লাঞ্ছনা মাত্র হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে বিদেশী দোকানদারের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, পরে নিজেদের মনকে প্রবঞ্চিত করি। আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে। আমরা ছবি চিনিনে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়্‌তে বাঁদর গড়ে, তাদেরই হস্ত-রচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে সুখী না হই, খুসি থাকি। আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলামচোর হওয়ায়, লজ্জা পাওয়া দূরে যাক্, আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আমার মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, আমরা যদি ইউরোপীয় আর্টের মর্য্যাদা না বুঝ্‌তে পারি, তাহ'লে ইউরোপীয় সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য, বিজ্ঞানচর্চ্চাও আমাদের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এ আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন দেশের লোকের ভিতর পার্থক্য যতই থাকুক, মানুষে মানুষে প্রবৃত্তির, বাসনার,

মনোভাবের মিলও যথেষ্ট আছে। সাহিত্যের বিষয় হচ্ছে প্রধানত—মানবপ্রকৃতি; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল-অতিরিক্ত মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চির-নবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার করে। এই হেতু সকল দেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বিশ্ব-মানবের সমান অধিকার আছে। কিন্তু ইউ-রোপীয় সাহিত্যে যে অংশটুকু আর্ট, সে অংশ আমরা ঠিক ধর্‌তে পারি নে। বিদেশী লেখকের লেখনীর পরিচয় আমরা অনেকেই পাই না। সে যাই হোক্‌, সাহিত্যে এবং আর্টে, কাব্যে এবং কলায় প্রধান পার্থক্য এই যে, কাব্যের উপকরণ অন্তর্জ্জগৎ হতে আসে, কলার উপকরণ বাহ্যজগৎ হতে আসে। মনোজগতে দেশভেদ নেই, এসিয়া ইউরোপ নেই,—এক কথায়, মনোজগতের ভূগোল নেই। কিন্তু বাহ্যজগতে ঠিক তার উল্টো। এক দেশের ভৌতিক গঠন অপর দেশ হতে বিভিন্ন। দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রসের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যই কাব্য অপেক্ষা কলার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। এই উপকরণের বিশেষত্ব হ'তে প্রতি দেশের শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। আর্ট সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়তা অসম্ভব; সুতরাং, এক্ষেত্রে স্বদেশের অধীনতা-পাশ মোচন কর্‌বার জো নেই। বিজ্ঞানের বিষয়ও বস্তুজগৎ; কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বজনীন, কেননা বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য বস্তুজগতের বিশেষত্ব বাদ দিয়ে তার সামান্য ক্রিয়াগুলির সন্ধান নেওয়া। আর্টের সম্পর্ক বস্তুজগতের শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে। বিজ্ঞানের অভি-প্রায় বিশ্বকে এক করে আনা, আর্টের কার্য্য নিত্য বৈচিত্র্য সাধন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলের দিকে, আর্টের লক্ষ্য ফুলের দিকে। বিজ্ঞানের দেশ নেই, আর্টের আছে। এই সকল কারণে Newton এবং Darwin আমাদের জ্ঞাতি, Shakespeare

এবং Milton আমাদের কুটুম্ব, কিন্তু Raphael এবং Beethoven আমাদের পর। এই জন্যই জাপান ইউরোপের বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে, কিন্তু নিজের আর্ট ছাড়েনি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইউরোপের উচ্চাঙ্গের আর্টের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেন, তিনি অবশ্য ভক্তির পাত্র। পৃথিবীর যে দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আছে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা মানবের মুক্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যখন প্রায়ই দেখ্‌তে পাই যে, যিনি স্বরগ্রামের "গা" থেকে "পা"র প্রভেদ ধর্‌তে পারেন না, তিনিই Beethoven-এর প্রধান সমজদার; এবং যিনি রংটা নীল কিম্বা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বল্‌তে অপারগ, তিনিই Titian-এর চিত্রে মুগ্ধ,—তখন স্বজাতির ভবিষ্যতের বিষয় একটু হতাশ হয়ে পড়্‌তে হয়। সে যাই হোক্, উপস্থিত প্রবন্ধে যে-সকল বস্তুর আলোচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছি—যথা ছিটের পরদা, ব্রাসল্‌সের কারপেট, চিনের পুতুল, কাঁচের ফুলদানী,—কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলপ্রকার আর্টের অভাবেই তাদের বিশেষত্ব। বিলাতের সচরাচর গৃহ-ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিৎ। এর দুটি কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞানের ন্যায় আর্টেরও বিষয় বাহ্য-জগৎ। যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, আর্টেরও বিষয় হতে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম aesthetical quality, অর্থাৎ "রূপ"; এবং মনের সেই সুখলাভ কর্‌বার ক্ষমতার নাম aesthetic faculty, অর্থাৎ "রূপজ্ঞান"।

ইংরাজ বিশেষ খোসাপুরু জাত। ভগবান্ ইংরাজকে নিতান্ত স্থূলভাবে গড়েছেন; তার দেহ স্থূল, প্রকৃতি স্থূল, ইন্দ্রিয়ও তাদৃশ সূক্ষ্ম নয়। বস্তুমাত্রেই ইংরাজের হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু রূপ-মাত্রেই ইংরাজের চোখে কিম্বা কাণে ধরা পড়ে না। সচরাচর শিক্ষিত ইংরাজের চাইতে আমাদের দেশের সচরাচর রঙ্গরেজের চোখ রং সম্বন্ধে অনেক বেশি পরিমার্জ্জিত। এই কারণেই বিলাতের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাতসকল নয়নের তৃপ্তিকর নয়। এই গোড়ায় গলদ্ থাক্‌বার দরুণ, ইংরাজের হাতগড়া জিনিষ প্রায়ই artistic হয় না। ইউরোপের অন্যান্য জাতিসকল এ বিষয়ে ইংরাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও, অপর আর একটি কারণে ইউরোপের art-এর আজকাল হীনাবস্থা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞান বিশ্বকে এক-ভাবে দেখে, আর্ট আর একভাবে দেখে। বিজ্ঞানের চেষ্টা সোনা-মুঠোকে ধূলোমুঠো করা, আর্টের চেষ্টা ধূলামুঠোকে সোনামুঠো করা। বিজ্ঞান আজকাল ইউরোপীয় মানবের মনের উপর অযথা প্রতিপত্তি লাভ করেছে, কেননা বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে আলাদিনের প্রদীপ। সে প্রদীপের সাহায্যে যে শুধু অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায় তাই নয়—আলোকও লাভ করা যায়। সে আলোকে শুধু প্রকাশ করে বিশ্বের কায়া, বাদবাকী সব ছায়ায় পড়ে যায়, যথা—মন, প্রাণ ইত্যাদি। সেই বিজ্ঞানের আলোককে, আমরা যদি একমাত্র আলোক বলে ভ্রম করি, তাহ'লে মানব-জীবনের প্রকৃত অর্থ, চরম লক্ষ্য, এবং অচ্যুত আনন্দ হতে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। বিশ্বকে শুধু জড়ভাবে দেখ্‌লে মনেরও জড়তা এসে পড়ে। কেবলমাত্র পরমাণুর স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্ম্মের সখী হয়েই কলাবিদ্যা

পৃথিবীতে দেখা দেয়। সে সখ্য-বন্ধন ছিন্ন করে আর্টকে জীবন্ত রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্বের মতে মানবের আদিম চেষ্টা নিজের এবং জাতীয় জীবন রক্ষা করা। নিজে বেঁচে থাকা এবং সন্তান উৎপাদন করা, এই দুটি জীবজগতের মূল নিয়ম। এই দুটি আদিম দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠে, তাহলে "আবশ্যকতার" অর্থ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। যা দেহের জন্য আবশ্যক তাই যথার্থ আবশ্যকীয় বলে গণ্য হয়, আর যা মনের জন্য, আত্মার জন্য আবশ্যক, তা আবশ্যকীয় বলে মনে হয় না। ইউ-রোপে Utility-র এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য হবার দরুণ Utility এবং Beauty-র বিচ্ছেদ জন্মেছে। ইউরোপের আবশ্যকীয় জিনিষ কদর্য্য, এবং সুন্দর জিনিষ অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই কারণে আর্ট এখন ইউরোপে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুল্‌ছে। আহার বিহার এখন ইউরোপের প্রধান কাজ হয়ে ওঠার দরুণ, যে আর্টিষ্ট আর্টকে জীবনের ভিতর নিয়ে আস্‌তে চান্‌, তিনি আর্টকে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের দাসী করে তোলেন। এই কারণেই ইউরোপে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির এত ছড়াছড়ি। শতকরা একজনে যদি ঐরূপ মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য খোঁজেন, অবশিষ্ট নিরনব্বই জনে তার নগ্নতা দেখেই খুসি থাকেন। এ অবস্থায় আর্ট যে শুধু ভোগবিলাসের অঙ্গ হয়ে উঠ্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ইউরোপের পক্ষে কি ভাল কি মন্দ, তা ইউরোপ স্থির কর্‌বে। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমাদের জাতির পক্ষে বিলাসের প্রবৃত্তি আর বাড়ানো ইচ্ছনীয় নয়। ইউরোপের যথার্থ আর্ট আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার ভোগের অংশটা আমরা

সহজেই অভ্যাস করতে পারি। আমার প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। আর্টকে ভোক্তার দিক থেকে দেখা, দুরবিনের উল্টো দিক থেকে দেখার তুল্য—দ্রষ্টব্য পদার্থ আরও দূরে চ'লে যায়। কর্ত্তার দিক থেকে দেখাটাই ঠিক দেখা। আমরা নিজে যা রচনা করেছি, তারই মর্ম্ম, তারই মর্য্যাদা আমরা প্রকৃষ্ট-রূপে বুঝতে পারি। আমাদের স্বদেশের কীর্ত্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমরা জাতীয় আত্মসম্মানের চর্চ্চা করব বলে চীৎকার করছি, কিন্তু জাতীয় কৃতিত্বের যদি জ্ঞান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসম্মান কিসের উপর দাঁড় করাব, বোঝা কঠিন। আর্ট যে শ্রেণীরই হোক্, তার চর্চ্চায় আমাদের জাতীয় কর্ত্তৃত্ব-বুদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠবে। এই পরম লাভ। সুলভ এবং সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিষের পক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চলতে পারে, কিন্তু আর্টের দোহাই একে-বারেই চলে না। বিলাতি-ছিটগ্রস্ত না হ'লে বিলাতি-ছিটভক্ত হওয়া যায় না। আর যিনি আদর ক'রে দুয়ারে বিলাতি পর্দ্দা ঝোলান তাঁর পর্দ্দানশীন্ হওয়া উচিত।

(৫)

সভ্যজাতির পক্ষে দেশের কথা অনেকটা বেশের কথা। পরিচ্ছদের ঐক্য সামাজিক ঐক্যের লক্ষণও বটে, কারণও বটে। আমরা প্রতিবাসীকে প্রতিবেশী বলেই জানি। হিন্দুরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসের প্রথম দীক্ষা ডোর-কৌপীন ধারণ। আমাদেরও বিদেশীয়তার প্রথম সংস্কার কোট পেণ্ট্লুন ধারণ। বিলেতের বেশ যে ভারতবাসীর পক্ষে সকল

বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। কথাটা এতই সাদা যে, যিনি তা বুঝ্তে পারেন না, তাঁর ঔষধ মধ্যম-নারায়ণ তৈল, যুক্তি নয়। দেহকে কষ্ট দিলেই যদি মনের উৎকর্ষ লাভ করা যেত, তাহ’লেও নয় এই বোতাম-বক্‌লসের অধীনতা এবং বন্ধন একরকম কায়ক্লেশে সহ্য করা যেত। কিন্তু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবার মাহাত্ম্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। যিনিই “কলার” ব্যবহার করেছেন, তিনিই কোন না কোন সময়ে রাগে, দুঃখে এবং ক্ষোভে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে—

“ভুষণ বলে কিন্‌ব না আর
পরের ঘরে গলার ফাঁসি।”

ইউরোপ যে আমাদের বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরিয়েছে, তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট ও কাফ এবং বুটজুতা ধারণ করি। আমাদের স্বদেশী বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। বিলাতী সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে, অহর্নিশি গলদঘর্ম্ম হওয়াতেই সভ্য-মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ বলে মনে হয়, বিলাতী সভ্যতার প্রতি অতিভক্তি-পরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরাজি পোষাক যে নয়নের সুখকর নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার কর্‌তে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্য্যের অভাবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। ঐ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের একান্ত অভাববশত পুরুষ সাজ্‌বার ইচ্ছাটা অত্যন্ত বলবতী। কাজেই আমরা ইংরাজের অনুকরণে, অন্য সব রং ত্যাগ করে, কাপড়ে ছাইপাঁশ মাটির রং চাপিয়েছি। আমাদের ধারণা, সব চাইতে সভ্য এবং সব চাইতে পুরুষালি

রং হচ্ছে কালো রং। সুতরাং আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্র বসন ত্যাগ করে কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে। শ্বেতবর্ণ আলোকের রং, সকল বর্ণের সমাবেশে তার উৎপত্তি; আর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের রং, সকল বর্ণের অভাবে তার উৎপত্তি। আমরা করজোড়ে ইউরোপীয় সভ্যতার কাছে প্রার্থনা করেছি যে, "আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও"—এবং আমাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদ্‌মদ্‌গারির পুরস্কারস্বরূপ হ্যাট নামক কিম্ভূতকিমাকার এক চিজ শিরোপা লাভ করেছি, তাই আমারা আনন্দে শিরোধার্য্য করে নিয়েছি। কিন্তু ইংরাজি পোষাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু তা নয়। বেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মনের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। পুরোহিতের বেশ ধারণ কর্‌লে মানুষকে হয় ভণ্ড নয় ধার্ম্মিক হতে হয়। সাহেবি কাপড়ের সঙ্গে মনেও সাহেবিয়ানার ছোপ ধরে। হ্যাট-কোট ধারণ কর্‌লেই বঙ্গসন্তান ইংরাজি এবং হিন্দি এই দুই ভাষার উপর, অধিকার লাভ কর্‌বার পূর্ব্বেই অত্যাচার কর্‌তে সুরু করেন। গলায় "টাই" বাঁধ্‌লেই যে সকলকেই ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট গললগ্নীকৃতবাস হ'তে হবে, এ কথা আমি মানিনে। যে মনে দাস, সে উত্তরীয়কেও গলবস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। তবে "টাই" যে মনকে সাহেবিয়ানার অনুকূল করে নিয়ে আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মোহ কাটাতে হলে ইউরোপীয় বসন "বয়কট" করাই শ্রেয়। ইউরোপবাসীর বেশে এবং এসিয়াবাসীর বেশে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। ইউরোপের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে বাঁধা, আমাদের উদ্দেশ্য দেহকে ঢাকা। আমাদের চেষ্টা দেহকে লুকানো, ওদের চেষ্টা

দেহকে ফলানো। আমাদের অভিপ্রায় লজ্জা নিবারণ করা, ওদের অভিপ্রায় শীত নিবারণ করা; তাই আমরা যেখানে ঢিলে দিই, ওরা সেখানে কসে। ইংরাজরা মধ্যে মধ্যে রমণীর বেশকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরাজরমণীর বেশের ভিতর একটা ছন্দ আছে, তার গতি বিলাসিনীদের দেহভঙ্গী অনুসরণ করে; সে ছন্দের ঝোঁক উন্নত অবনত অংশের উপরই পড়ে। লজ্জা আমাদের দেশে নারীর হৃদয় অবলম্বন করে থাকে, ওদের দেশে চরণে শরণ গ্রহণ করে। আমাদের মহা সৌভাগ্য এই যে, ভারত-রমণী স্বদেশী লজ্জা পরিহার করে বিদেশী সজ্জা গ্রহণ করেন নি। স্ত্রী-জাতি সর্ব্বত্রই স্থিতিশীল, আমরা পুরুষরা গতিশীল বলেই দুর্গতি বিশেষরূপে আমাদেরই হয়েছে। যদি ইংরাজি বেশ উপযোগিতা, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্বদেশী বেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'ত, তাহ'লেও বিদেশী বেশ অবলম্বন অনুমোদন করা যেত না। ইংরাজি বেশের আর একটি বিশেষ দোষ এই যে, ও পদার্থে দেহ মণ্ডিত কর্‌বামাত্রই, অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকেও বেশের পক্ষ সমর্থন কর্‌তে গিয়ে অতিশয় নির্ব্বোধের মত তর্ক করেন। এ বিষয়ে যে-সকল যুক্তি সচরাচর শোনা যায়, সে-সকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে বিচারযোগ্য নয়। যাঁরা বেশ পরিবর্ত্তন করেন, তাঁরা তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা নিজেরাই সাফাই হ'তে চান,—অপরকে ভজাতে চান না। তাঁদের অভিপ্রায়, ফাঁকি দিয়ে নিজেরা সভ্য হওয়া, স্বজাতিকে সভ্য করা নয়। তাঁদের বিশ্বাস, এ সমাজের, এ জাতির কিছু হ'বার নয়,—সুতরাং সমাজ ছাড়াই তাঁদের মতে একমাত্র মুক্তির উপায়। এ মনোভাব যে স্বদেশীয়তার কত-

দূর অনুকূল, তা সকলেই বুঝতে পারেন। কেবলমাত্র সমাজ-ত্যাগে কি করে মুক্তিলাভ হতে পারে? এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর হচ্ছে, এঁরা যে "চিরকালই স্বদেশী সমাজের অন্তস্থ বর্ণ হয়ে থাক্‌বেন" এরূপ এঁদের অভিপ্রায় নয়; এঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, ইংরাজি সমাজে লীন হয়ে যাওয়া। এঁদের আশা ছিল যে, ক্রমে গঙ্গাযমুনার মত সাদায়-কালোয় একদিন মিশে যাবে। কিন্তু আজ বোধহয় এঁদের সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, সে আশা মিছে। আমরা সকলেই এ সত্যটি আবিষ্কার করেছি যে, প্রয়াগ পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমাদের কাশিপ্রাপ্তি হবে।

(৬)

আহার সম্বন্ধে বেশি কিছু বল্‌বার দরকার নেই। অপরের বেশ যত সহজে অবলম্বন করা যায়, অপরের খাদ্য তত শীঘ্র জীর্ণ করা যায় না। বিদেশীয় সভ্যতা আমাদের পিঠে যত সয়, পেটে তত সয় না। আমাদের 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' দেশে আহার্য্য দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি কর্‌বার কোনই দরকার নেই। তবে যদি কেহ এমন থাকেন যে, বিদেশী মাছ-তরকারি না খেলে তাঁর প্রাণ বাঁচে না, তাহ'লে তাঁর প্রাণ বাঁচাবার কোন দরকার নেই; আর যদি বেঁচে থাকাটা নিতান্ত দরকার মনে করেন, তাহলে স্বদেশ ত্যাগ করে বিদেশে বাস করাটাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়।

আহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ-সম্বলিত পঞ্জিকাশাস্ত্রকে গঞ্জিকা-শাস্ত্র বলে' গণ্য করে' অমান্য কর্‌লেই যে তৎপরিবর্ত্তে কেল্‌নারের

ক্যাটালগের চর্চ্চা কর্‌তে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদে-শীয়তা প্রধানত আহারের পদ্ধতিতেই আমরা অবলম্বন করেছি। বিলাতি বসন পরে, স্বদেশী আসনে বসা এবং স্বদেশী বাসনে খাওয়া চলে না।

ঐ পোষাকের টানেই চেয়ার আসে, সেই সঙ্গে টেবিল আসে, এবং সেই সঙ্গে চীনের কিম্বা টিনের বাসন নিয়ে আসে। এর পর আর হাতে খাওয়া চলে না; কারণ হাতে খেলে হাত মুখ দুই-ই প্রক্ষালন কর্‌তে হয়, কিন্তু ছুরিকাঁটা ব্যবহার কর্‌লে শুধু আঙ্গুলের ডগা ধুলেও চলে, না ধুলেও চলে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, খানায় পোষাকে "অঙ্গ-অঙ্গীর" সম্বন্ধ বিরাজ করে। আহারের বিষয় উত্থাপন করে পানের বিষয় নীরব থাক্‌লে অনেকে মনে কর্‌তে পারেন যে, প্রবন্ধটি অঙ্গহীন হয়ে রইল; অতএব এ সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলা আবশ্যক। পানের বিষয় হচ্ছে হয় ধূম, নাহয় তেজ, মরুৎ এবং সলিলের সন্নিপাতে যে পদার্থের স্থষ্টি হয়, তাই। গাঁজা গুলি এবং চরসের পরিবর্ত্তে ভদ্রসমাজে যদি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ত, সে দুঃখের বিষয় নয়। সুরাপান বেদ-বিহিত এবং আয়ুর্ব্বেদ-নিষিদ্ধ। "প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এ মনুর বচন। এবং শাস্ত্রমতে যেখানে স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতে বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে শ্রুতি মান্য। রসিকতা ছেড়ে দিলেও, সুরাপানের দোষগুণ বিচার করা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়্‌বে। পানদোষ নীতির কথা, রীতির কথা নয়। সুরাপান একটি ব্যসন, ফ্যাসান্ নয়। পানাসক্ত লোক পানের প্রতিই আসক্ত, ইংরাজিয়ানার প্রতি নয়। মোহ এবং মদ দুটি স্বতন্ত্র রিপু। আমার উদ্দেশ্য ইউরোপের মোহ নষ্ট করা—তার বেশি

কিছু নয়। মানবজাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র কর্‌বার ভার সমাজ নীতি এবং ধর্ম্মপ্রচারকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

(৭)

আমার শেষ বক্তব্য এই, কেহ যেন মনে না করেন যে, কোন সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দা কর্‌বার জন্যই আমি এ সকল কথার অবতারণা করেছি। যে-সকল ইউরোপীয় হাল-চাল আমি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয় মনে করি, সে-সকল কম-বেশি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেছে। আমি নিজে উপরোক্ত সকল দোষে দোষী। আমার সকল সমালোচনাই আমার নিজের গায়ে লাগে। দৈনিক জীবনে আমরা নকলেই অভ্যস্ত, আচার-ব্যবহারের অধীন। 'ভুল করেছি', এই জ্ঞান জন্মানো মাত্র সেই ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা যায় না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ কর্‌তে পার্‌লে, ব্যবহারের অনুরূপ পরিবর্ত্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।

নভেম্বর,
১৯০৫ খৃষ্টাব্দ।

বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাঙ্গলা ওরফে সাধুভাষা।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ভারতী" পত্রিকাতে প্রকাশিত "বাল্যকথা", "ঢাকা-রিভিউ এবং সম্মিলনের" মতে অপ্রকাশিত থাকাই উচিত ছিল। লেখক যে কথা বলেছেন, এবং যে ধরণে বলেছেন, দু'য়ের কোনটিই সম্পাদক মহাশয়ের মতে "সুযোগ্য লেখক এবং সুপ্রসিদ্ধ মাসিকের উপযোগী নয়" শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কথাই আমার মুখে শোভা পায় না। তার কারণ এস্থলে উল্লেখ কর্‌বার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তা শুধু "ঘরওয়ালা ধরণের" নয়, একেবারে পুরোপুরি ঘরাও কথা। আমি যদি প্রকাশ্যে সে লেখার নিন্দা করি, তাহ'লে আমার কুটুম্ব-সমাজ সে কার্য্যের প্রশংসা কর্‌বে না; অপর পক্ষে যদি প্রশংসা করি, তাহ'লে সাহিত্য-সমাজ নিশ্চয়ই তার নিন্দা কর্‌বে। তবে "ঢাকা রিভিউ"-এর সম্পাদক মহাশয় উক্ত লেখকের ভাষা সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু কর্ত্তব্য আছে।

প্রথমত সম্পাদক ম'শায় বলেছেন যে, সে "রচনার নমুনা যে প্রকারের ঘরওয়ালা ধরণের, ভাষাও তদ্রূপ"। ভাষা যদি বক্তব্য বিষয়ের অনুরূপ হয়, তাহলে অলঙ্কার শাস্ত্রের মতে সেটা যে দোষ বলে' গণ্য, এ জ্ঞান আমার পূর্ব্বে ছিল না। আত্মজীবনী লেখবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঘরের কথা পর্‌কে বলা। ঘরাও

ভাষা-ই ঘরাও কথার বিশেষ উপযোগী মনে করে'ই লেখক, লোকে যে ভাবে গল্প বলে, সেই ভাবেই তাঁর "বাল্যকথা" বলেছেন। ৺কালি সিংহ যে "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" ভাষায় তাঁর মহাভারত লেখেন নি, এবং মহাভারতের ভাষায় যে "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" লেখেন নি, তা'তে তিনি কাণ্ডজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দেন নি। সে যাই হোক্, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পক্ষ হয়ে কোনরূপ ওকালতি করা আমার অভিপ্রায় নয়, কারণ এ বিষয়ে বাঙ্গলার সাহিত্য-আদালতে তাঁর কোনরূপ জবাবদিহি কর্‌বার দরকারই নেই। আমি এবং "ঢাকা রিভিউ"-এর সম্পাদক যে কালে, পূর্ব্ববঙ্গের নয় কিন্তু পূর্ব্ব-জন্মের ভাষায় বাক্যালাপ কর্‌তুম, সেই দূর অতীত কালেই, ঠাকুর মহাশয় "সুযোগ্য লেখক" বলে' বাঙ্গলাদেশে খ্যাতি এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।

যে ধরণের লেখা "ঢাকা রিভিউ"-এর নিতান্ত অপছন্দ, সেই ধরণের লেখারই আমি পক্ষপাতী। আমাদের বাঙ্গালী জাতির একটা বদনাম আছে, যে আমাদের কাজে ও কথায় মিল নেই। এ অপবাদ কতদূর সত্য তা আমি বল্‌তে পারি নে। তবে এ কথা নিশ্চিত যে আমাদের কথায় ও লেখায় যত অধিক অমিল হয়, তত আমরা সেটি অহঙ্কারের এবং গৌরবের বিষয় বলে' মনে করি। বাঙ্গালী লেখকদের কৃপায়, বাঙ্গলা ভাষায় চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ক্রমেই বেড়ে যাচ্চে। সেই বিবাদ ভঞ্জন কর্‌বার চেষ্টাটা আমি উচিত কার্য্য বলে মনে করি। সেই কারণেই এদেশের বিদ্যাদিগ্‌গজের "স্থূল হস্তাবলেপ" হ'তে মাতৃভাষাকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য আমরা সাহিত্যকে সেই মুক্তপথ অবলম্বন কর্‌তে বলি, যে পথের দিকে আমাদের সিদ্ধাঙ্গনারা উৎসুক

নেত্রে চেয়ে আছেন। "ঢাকা রিভিউ"-এর সমালোচনা অবলম্বন করে আমার নিজের মত সমর্থন করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অভিযোগ।

সম্পাদক মহাশয়ের কথা হচ্ছে এই—

"মুদ্রিত সাহিত্যে আমরা "করতুম" "শোনাচ্ছিলুম" "ডাকতুম" "মেশবার" ("থেনু" "গেনু"ই বা বাদ যায় কেন ?) প্রভৃতি প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। অন্য ভাষাভাষী বাঙ্গালীর অপরিজ্ঞাত ভাষা প্রয়োগে সাহিত্যিক্ সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ পায় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"

উপরোক্ত পদটি যদি সাধুভাষার নমুনা হয়, এবং ঐরূপ লেখাতে যদি "সাহিত্যিক" উদারতা প্রকাশ পায়, তাহ'লে লেখায় সাধুতা এবং উদারতা আমরা যে কেন বর্জ্জন কর্‌তে চাই, তা ভাষাজ্ঞ এবং রসজ্ঞ পাঠকেরা সহজেই উপলব্ধি কর্‌তে পারবেন। এরূপ ভাষা সাধুও নয়, শুদ্ধও নয়, শুধু 'যা-খুসি-তা' ভাষা। কোন লেখক-বিশেষের লেখা নিয়ে, তার দোষ দেখিয়ে দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার বিশ্বাস ওরূপ করাতে সাহিত্যের কোনও লাভ নেই। মশা মেরে' ম্যালেরিয়া দূর করবার চেষ্টা বৃথা, কারণ সে কাজের আর অন্ত নেই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে কতকটা আলো এবং হাওয়া এনে দেওয়াই সে স্থানকে স্বাস্থ্যকর কর্‌বার প্রকৃষ্ট উপায়। তা সত্ত্বেও, "ঢাকা রিভিউ" হ'তে সংগৃহীত উপরোক্ত পদটি, অনায়াসলব্ধ পদ নিয়ে অযত্ন-সুলভ বাক্য রচনার এমন খাঁটি নমুনা, যে তার রচনা-পদ্ধতির দোষ বাঙ্গালী পাঠকদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার লোভ আমি সম্বরণ কর্‌তে পার্‌ছিনে। শুন্‌তে পাই, কোন একটি

ভদ্রলোক তিন অক্ষরের একটি পদ বানান করতে চারটি ভুল করেছিলেন। "ঔষধ" এই পদটি তাঁর হাতে "অউসদ" এই রূপ ধারণ করেছিল। সম্পাদক মহাশয়ও একটি বাক্য রচনায় অন্তত পাঁচ ছ'টি ভুল করেছেন।

১। সাহিত্যের পূর্ব্বে "মুদ্রিত" এই বিশেষণটি জুড়ে দেবার সার্থকতা কি? অমুদ্রিত সাহিত্য জিনিষটি কি? ওর অর্থ কি সেই লেখা, যা এখন হস্তাক্ষরেই আবদ্ধ হয়ে' আছে, এবং ছাপা হয়নি? তাই যদি হয়, তাহ'লে সম্পাদক মহাশয়ের বক্তব্য কি এই যে, ছাপা হবার পূর্ব্বে লেখায় যে ভাষা চলে, ছাপা হবার পরে আর তা চলে না? আমাদের ধারণা, মুদ্রিত লেখামাত্রই এক সময়ে অমুদ্রিত অবস্থায় থাকে, এবং মুদ্রাযন্ত্রের ভিতর দিয়ে তা রূপান্তরিত হয়ে' আসে না। বরং কোনরূপ রূপান্তরিত হলেই আমরা আপত্তি করে' থাকি, এবং যে ব্যক্তির সাহায্যে তা হয়, তাকে আমরা মুদ্রাকরের সয়তান বলে' অভিহিত করি। এইরূপ বিশেষণের প্রয়োগ শুধু অযথা নয়, একেবারেই অনর্থক।

২। "ডাকতুম" "করতুম", প্রভৃতির "তুম" এই অন্তভাগ প্রাদেশিক শব্দ নয়, কিন্তু বিভক্তি। এস্থলে "শব্দ" এই বিশেষ্যটি ভুল অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ সম্পাদক মহাশয় বোধ হয় একথা বল্‌তে চান না যে, "ডাকা" "করা" "শোনা" প্রভৃতি ক্রিয়া শব্দের অর্থ কলিকাতা প্রদেশের লোক ছাড়া আর কেউ জানেন না। একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে "ডাকা" "শোনা" "করা" প্রভৃতি শব্দ, "অন্য ভাষাভাষী" বাঙ্গালীর নিকট অপরিজ্ঞাত হলেও, বঙ্গ "ভাষাভাষী" বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট বিশেষ সুপরিচিত। সম্পাদক মহাশয়ের

আপত্তি যখন ঐ বিভক্তি সম্বন্ধে, তখন "শব্দের" পরিবর্ত্তে "বিভক্তি" এই শব্দটিই ব্যবহার করা উচিত ছিল।

৩। "সাহিত্যিক্" এই বিশেষণটি বাঙ্গলা কিম্বা সংস্কৃত কোন ভাষাতেই পূর্ব্বে ছিল না, এবং আমার বিশ্বাস উক্ত দুই ভাষার কোনটির ব্যাকরণ অনুসারে "সাহিত্য" এই বিশেষ্য শব্দটি "সাহিত্যিক্" রূপ বিশেষণে পরিণত হতে পারে না। বাঙ্গলার নব্য 'সাহিত্যিক্'দের বিশ্বাস, যে বিশেষ্যের উপর অত্যাচার করলেই তা বিশেষণ হয়ে ওঠে। এইরূপ বিশেষণের সৃষ্টি আমার মতে অদ্ভুত সৃষ্টি। এই পদ্ধতিতে সাহিত্য রচিত হয় না, Literature শুধু literatural হয়ে ওঠে।

৪। "ভাষাভাষী" এই সমাসটি এতই অপূর্ব্ব, যে ওকথা শুনে হাসাহাসি করা ছাড়া আর কিছু করা চলে না।

৫। "আমরা" শব্দটি পদের পূর্ব্বভাগে না থেকে, শেষ ভাগে আসা উচিত ছিল। তা না হ'লে পদের অন্বয় ঠিক হয় না। "করতুম" এর পূর্ব্বে নয়, "ব্যবহার" এবং "পক্ষপাতী" এই দুই শব্দের মধ্যে এর যথার্থ স্থান।

অযথা এবং অনর্থক বিশেষণের প্রয়োগ, ভুল অর্থে বিশেষ্যের প্রয়োগ, অদ্ভুত বিশেষণ এবং সমাসের সৃষ্টি, উল্টো-পাল্টা রকম রচনার পদ্ধতি প্রভৃতি বর্জ্জনীয় দোষ, আজকাল-কার মুদ্রিত সাহিত্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। সাধু-ভাষার আবরণে সে সকল দোষ, শুধু অন্যমনস্ক পাঠকদের নয়, অন্যমনস্ক লেখকদেরও চোখে পড়ে না।

"মুদ্রিত" সাহিত্য বলে কোন জিনিষ না থাকলেও, মুদ্রিত ভাষা বলে যে একটা নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার করবার যো নেই। লেখার ভাষা শুধু মুখের ভাষার প্রতিনিধি

মাত্র। অনিত্য শব্দকে নিত্য কর্‌বার ইচ্ছে থেকেই অক্ষরের সৃষ্টি। অক্ষর সৃষ্টির পূর্ব্বযুগে, মানুষের মনে করে' রাখবার মত বাক্যরাশি কণ্ঠস্থ কর্‌তে কর্‌তেই প্রাণ যেত। যে অক্ষর আমরা প্রথমে হাতে লিখি, তাই পরে ছাপান হয়। সুতরাং ছাপার অক্ষরে উঠ্‌লেই যে কোন কথার মর্য্যাদা বাড়ে, তা নয়। কিন্তু দেখ্‌তে পাই অনেকের বিশ্বাস তার উল্টো। আজকাল ছাপার অক্ষরে যা' বেরোয় তাই সাহিত্য বলে' গণ্য হয়। এবং সেই একই কারণে মুদ্রিত ভাষা সাধুভাষা বলে' সম্মান লাভ করে। গ্রামোফোনের উদরস্থ হয়ে' সঙ্গীতের মাহাত্ম্য শুধু এদেশেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আসলে সে ভাষার ঠিক নাম হচ্ছে বাবু-বাঙ্গলা। যে গুণে ইংলিশ বাবু-ইংলিশ হয়ে উঠে, সেই গুণেই বঙ্গভাষা বাবু-বাঙ্গলা হয়ে উঠেছে। সে ভাষা আলাপের ভাষা নয়, শুধু প্রলাপের ভাষা। লেখার যা' সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান গুণ—প্রসাদগুণ—সে গুণে বাবু-বাঙ্গলা একেবারেই বঞ্চিত। বিদ্যের মত ভাষাও কেবলমাত্র পুঁথিগত হয়ে উঠ্‌লে তার ঊর্দ্ধগতি হয় কিনা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু সদ্‌গতি যে হয় না সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আসলে এই মুদ্রিত ভাষায় মৃত্যুর প্রায় সকল লক্ষণই স্পষ্ট। শুধু আমাদের মাতৃভাষার নাড়িজ্ঞান লুপ্ত হয়ে রয়েছে বলে' আমরা নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণ আছে কি নেই তার ঠাওর করে' উঠতে পারিনে। মুখের ভাষা যে জীবন্ত ভাষা, এ বিষয়ে দু'মত নেই। একমাত্র সেই ভাষা অবলম্বন করেই আমরা সাহিত্যকে সজীব করে তুল্‌তে পার্‌ব। যেমন একটি প্রদীপ থেকে অপর একটি প্রদীপ ধরাতে হলে পরস্পরের স্পর্শ ব্যতিরেকে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তেমনি লেখার ভাষাতেও প্রাণ সঞ্চার কর্‌তে হলে মুখের

ভাষার সম্পর্ক ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না; আমি সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারের বিরোধী নই, শুধু ন্যূন অর্থে, কিম্বা অনর্থে বাক্যপ্রয়োগের বিরোধী। আয়ুর্ব্বেদ-মতে ওরূপ বাক্য-প্রয়োগ একটা রোগবিশেষ, এবং চরক সংহিতায় ও রোগের নাম "বাক্য দোষ"। পাছে কেউ মনে করেন যে আমি এই কথাটা নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করছি, সেই কারণে একশত বৎসর পূর্ব্বে "অভিনব যুবক সাহেব জাতের শিক্ষার্থে" —মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার যে উপদেশ লিপিবদ্ধ করে গেছেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।—

"শাস্ত্রে কাব্যকে গো শব্দে যে কহিয়াছেন তাহার কারণ এই:—ভাষা যদি সম্যকরূপে প্রয়োগ করা যায়, তবে স্বয়ং কামদুঘা ধেনু হন, যদি দুষ্টরূপে প্রয়োগ করা যায়, তবে সেই দুষ্টভাষা স্বনিষ্ঠ গোত্ব ধর্ম্মকে স্বপ্রয়োগ কর্ত্তাকে অর্পণ করিয়া, স্ববক্তাকে গোরূপে পণ্ডিতের নিকটে বিখ্যাত করেন। আর বাক্য কহা বড় কঠিন, সকল হইতে কহা যায় না; কেননা, কেহ বাক্যেতে হাতি পায়, কেহ বাক্যেতে হাতির পায়। অতএব বাক্যেতে অত্যল্প দোষও কোন প্রকারে উপেক্ষনীয় নহে, কেননা, যদ্যপি অতিবড় সুন্দরও শরীর হয়, তথাপি যৎকিঞ্চিৎ এক শ্বিত্র-রোগ-দোষেতে নিন্দনীয় হয়।"—(প্রবোধ চন্দ্রিকা)

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের মতে "বাক্য কহা বড় কঠিন"। কহার চাইতে লেখা যে অনেক বেশি কঠিন, এ সত্য বোধ হয় "অভিনব যুবক" বঙ্গলেখক ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। Art এবং artlessness-এর মধ্যে আশমান জমিন্ ব্যবধান আছে, লিখিত এবং কথিত ভাষার মধ্যেও সেই ব্যবধান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে পার্থক্য ভাষাগত নয়, style গত। লিখিত ভাষার কথাগুলি শুদ্ধ, সুনির্ব্বাচিত, এবং সুবিন্যস্ত হওয়া চাই—এবং রচনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত হওয়া চাই। লেখায়

কথা ওল্টানো চলে না, বদলানো চলে না, পুনরুক্তি চলে না, এবং এলোমেলো ভাবে সাজানো চলে না। "ঢাকা রিভিউ"-এর সম্পাদক মহাশয়ের মতে যে ভাষা প্রশস্ত, সে ভাষায় মুখের ভাষার যা যা দোষ সে সব পূর্ণমাত্রায় দেখা দেয়, কেবলমাত্র আলাপের ভাষার যে সকল গুণ আছে—অর্থাৎ সরলতা, গতি ও প্রাণ—সেই গুণগুলিই তাতে নেই। কোন দরিদ্র লোকের যদি কোন ধনী লোকের সহিত দূর সম্পর্কও থাকে, তাহ'লে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, সে গরিব বেচারা সেই দূর সম্পর্ককে অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাতে পরিণত কর্‌তে চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টার ফল কিরূপ হয়ে থাকে তা'ত সকলের-ই নিকট প্রত্যক্ষ। আমরা পাঁচজনে মিলে আমাদের মাতৃভাষার বংশমর্য্যাদা বাড়াবার জন্যই সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তে উৎসুক হয়েছি। তার ফলে শুধু আমাদের ভাষার স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা হচ্ছে না। সাধুভাষার লেখকদের তাই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, পদে পদে বিপদ ঘটে' থাকে। আমার বিশ্বাস যে, আমরা যদি সংস্কৃত ভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তাহলে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে, এবং আমাদের ঘরের লোকের সঙ্গে মনোভাবের আদান প্রাদানটাও সহজ হয়ে আস্‌বে। যদি আমাদের বক্তব্য কথা কিছু থাকে, তাহ'লে নিজের ভাষাতে তা যত স্পষ্ট করে বলা যায়, কোন কৃত্রিম ভাষাতে তত স্পষ্ট করে বলা যাবে না।

বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্ব।

কেবলমাত্র পড়ে-পাওয়া-চোদ্দ-আনা-গোছ সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন কর্‌লেই যে আমাদের মোক্ষলাভ হবে, তা নয়। আমরা লেখায়

স্বদেশীভাষাকে যেরূপ বয়কট করে আস্‌ছি, সেই বয়কটও আমাদের ছাড়্‌তে হবে। বহুসংখ্যক শব্দকে ইতর বলে সাহিত্য হতে "বহিষ্করণ"-এর কোনই বৈধ কারণ নেই। মৌখিক ভাষার মধ্যেই সাধু এবং ইতর, উভয় প্রকারেরই শব্দ আছে। যে বাক্য ইতর বলে আমরা মুখে আন্‌তে সঙ্কুচিত হই, তা আমরা কলমের মুখ দিয়েও বার করতে পারি নে। কিন্তু যে সকল কথা আমরা ভদ্রসমাজে নিত্য ব্যবহার করি, যা কোন হিসেবেই ইতর বলে গণ্য নয়, সেই সকল বাক্যকে সাহিত্য থেকে বহির্ভূত করে রাখায় ক্ষতি শুধু সাহিত্যের। কেন যে, পদ-বিশেষ ইতর শ্রেণীভুক্ত হয়, সে আলোচনার স্থান এ প্রবন্ধে নেই। তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে ভদ্র এবং ইতরের প্রভেদ আমাদের সমাজে এবং সাহিত্যে যেরূপ প্রচলিত, পৃথিবীর অন্য কোনও সভ্যদেশে সেরূপ নয়। আমরা সমাজের যেমন অধিকাংশ লোককে শূদ্র করে' রেখে দিয়েছি, ভাষারাজ্যেও আমরা সাধুতার দোহাই দিয়ে তারই অনুরূপ জাতিভেদ সৃষ্টি কর্‌বার চেষ্টা করছি, এবং অসংখ্য নির্দ্দোষী বাঙ্গলা কথাকে শূদ্রশ্রেণীভুক্ত করে,' তাদের সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্‌তে দিতে আপত্তি কর্‌ছি। সমাজে এবং সাহিত্যে আমরা একই সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয় দেই। বাঙ্গলা কথা সাহিত্যে অস্পৃশ্য করে রাখাটা শুধু লেখাতে 'বাম্‌নাই' করা। আজকাল দেখ্‌তে পাই অনেকেরই চৈতন্য হয়েছে যে, আমাদেরই মত রক্তমাংসে গঠিত মানুষকে সমাজে পতিত করে রাখ্‌বার একমাত্র ফল, সমাজকে দুর্ব্বল এবং প্রাণ-হীন করা। আশা করি শীঘ্রই আমাদের সাহিত্য-ব্রাহ্মণদের এ জ্ঞান জন্মাবে, যে অসংখ্য প্রাণবন্ত বাঙ্গলা শব্দকে পতিত করে

রাখবার দরুণ, আমাদের সাহিত্য দিন দিন শক্তিহীন এবং প্রাণ-হীন হয়ে পড়ছে। একালের ম্রিয়মাণ লেখার সঙ্গে তুলনা করে দেখ্‌লেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, "আলালের ঘরের দুলাল" এবং "হুতোম প্যাঁচার নক্সার" ভাষাতে কত অধিক ওজঃ-ধাতু আছে। আমরা যে বাঙ্গলা শব্দমাত্রকেই জাতে তুলে নিতে চাচ্ছি, তাতে আমাদের "সাহিত্যিক্ সঙ্কীর্ণতা" প্রকাশ পায় না, যদি কিছু প্রকাশ পায় ত উদারতা।

আর একটি কথা। অন্যান্য জীবের মত ভাষারও একটা আকৃতি ও একটা গঠন আছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে, জীবে জীবে প্রভেদ ঐ গঠনের পার্থক্যেরই উপর নির্ভর করে, আকৃতির উপর নয়। পাখা থাকা সত্বেও আরসোলা যে পোকা, পাখী নয়, এ জ্ঞান আমাদের দেশের নিরক্ষর লোকেরও আছে। এমন কি, কবিরাও বিহঙ্গকে পতঙ্গের প্রতিবাক্য হিসেবে ব্যবহার করেন না। অন্যান্য জীবের মত ভাষার বিশেষত্বও তার গঠন আশ্রয় করে' থাকে, কিন্তু তা তার দেহাকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভাষার দেহের পরিচয় অভিধানে, এবং তার গঠনের পরিচয় ব্যাকরণে। সুতরাং বাঙ্গলায় এবং সংস্কৃতে আকৃতিগত মিল থাকলেও, জাতিগত কোনরূপ মিল নেই। প্রথমটি হচ্ছে analytic, দ্বিতীয়টি inflectional ভাষা। সুতরাং বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের অনুরূপ করে' গড়ে' তুল্‌তে চেষ্টা করে' আমরা যে বঙ্গভাষার জাতি নষ্ট করি শুধু তাই নয়, তার প্রাণবধ কর্‌বার উপক্রম করি। এই কথাটি সপ্রমাণ কর্‌তে হলে এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখতে হয়, সুতরাং এস্থলে আমি শুধু কথাটার উল্লেখ মাত্র করে' ক্ষান্ত হলুম।

বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে সহজ জ্ঞানেতেই জানা যায়, উক্ত দুই ভাষার চালের পার্থক্য ঢের। সংস্কৃতের হচ্ছে "করিরাজ বিনিন্দিত মন্দগতি", কিন্তু বাঙ্গলা, গুণী লেখকের হাতে পড়্‌লে, দুল্‌কি, কদম, ছার্‌তক, সব চালেই চলে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যৌবনকালে লিখিত এবং সদ্যপ্রকাশিত "ছিন্নপত্র" পড়লে সকলেই দেখতে পাবেন, যে সাহস করে' একবার রাশ আলগা দিতে পার্‌লে, নিপুণ এবং শক্তিমান লেখকের হাতে বাঙ্গলা গদ্য কি বিচিত্র ভঙ্গীতে ও কি বিদ্যুৎবেগে চল্‌তে পারে। আমরা "সাহিত্যিক্" ভাবে কথা কইনে বলে, আমাদের মুখের কথায় বাঙ্গলা ভাষার সেই সহজ ভঙ্গীটি রক্ষিত হয়। কিন্তু লিখতে বসলেই আমরা তার এমন একটা কৃত্রিম গড়ন দেবার চেষ্টা পাই, যাতে তার চলৎশক্তি রহিত হয়ে আসে। ভাষার এই আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে' পরিচিত। তাই বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লস্করি ভাবে চলে, এবং কুলেখকদের হাতের লেখা একটা জড়পদার্থের স্তূপ-মাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গীটি রক্ষা করা। কিন্তু যেই আমরা সে কাজ করি অমনি আমাদের বিরুদ্ধে সাধুভাষার কলের জল ঘোলা করে দেবার, এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের বাড়াভাতে "প্রাদেশিক শব্দের" ছাই ঢেলে দেবার, অভিযোগ উপস্থিত হয়।

ভাষামাত্রেরই তার আকৃতি ও গঠনের মত, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, এবং প্রকৃতিস্থ থাকার উপরই তার শক্তি এবং সৌন্দর্য্য নির্ভর করে। বঙ্গভাষার সেই প্রকৃতির বিশেষ জ্ঞানের অভাববশতই আমরা সে ভাষাকে সংস্কৃত করতে গিয়ে বিকৃত

করে ফেলি। তা ছাড়া প্রতি ভাষারই একটি স্বতন্ত্র সুর আছে। এমন অনেক সংস্কৃত শব্দ আছে যা বাঙ্গলার সুরে মেলে না—এবং শোনবামাত্র কানে খট্ করে' লাগে। যার সুরজ্ঞান নেই, তাকে কোনরূপ তর্কবিতর্ক দ্বারা সে জ্ঞান দেওয়া যায় না। "সাহিত্যিক্" এই শব্দটি ব্যাকরণসিদ্ধ হলেও যে বাঙ্গালীর কানে নিতান্ত বেসুরো লাগে—একথা যার ভাষার জ্ঞান আছে তাকে বোঝানো অনাবশ্যক, আর যার নেই তাকে বোঝানো অসম্ভব।

এই বিকৃত এবং অশ্রাব্য "সাহিত্যিক্ ভাষার" বন্ধন থেকে সাহিত্যকে মুক্ত কর্‌বার প্রস্তাব করলেই যে সকলে মার-মুখো হয়ে ওঠেন, তার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত ভাষা ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ঢিলেমি, মানসিক আলস্য, এবং পল্লব-গ্রাহিতার অনুকূল। মুক্তির নাম শোনবামাত্রই, আমাদের অভ্যস্ত মনোভাবসকল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রাজা রামমোহন রায়ের মতে, সাধুসমাজের লোকেরা যে ভাষা "কহেন এবং শুনেন" সেই ভাষাই সাধুভাষা। কিন্তু আজকালকার মতে, যে ভাষা সাধু সমাজের লোকেরা কহেনও না শুনেনও না, কিন্তু লিখেন এবং পড়েন, সেই ভাষা সাধুভাষা। সুতরাং ভাল হোক্ মন্দ হোক্, যে ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, সেই অভ্যাসবশতই সেই ভাষায় লেখাপড়া করা লোকের পক্ষে অতি সহজ। কিন্তু যা করা সোজা তাই যে করা উচিত, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। সাধু-বাঙ্গলা পরিত্যাগ করে' বাঙ্গলা ভাষায় লিখতে পরামর্শ দিয়ে, আমি পরিশ্রমকাতর লেখকদের অভ্যস্ত আরামের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, সুতরাং এ কার্য্যের জন্য আমি যে তাঁদের বিরাগভাজন হব তা বেশ জানি। "নব্য সাহিত্যিক্"দের বোল্‌তার চাকে আমি যে ঢিল মার্‌তে

সাহস করেছি তার কারণ আমি জানি তাদের আর যাই থাক্ হুল নেই। বড় জোর আমাকে শুধু লেখকদের ভন্‌ভনানি সহ্য কর্‌তে হবে।

সে যাই হোক্ "ঢাকা রিভিউ"-এর সম্পাদক যে আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তার একটা বিচার হওয়া আবশ্যক। আমি ভাষা-তত্ত্ববিদ্ নই, তবুও আমার মাতৃভাষার সঙ্গে যেটুকু পরিচয় আছে, তার থেকেই আমার এইটুকু জ্ঞান জন্মেছে যে, মুখের কথা লেখায় স্থান পেলে, সাহিত্যের ভাষা প্রাদেশিক কিম্বা গ্রাম্য হয়ে' উঠ্‌বে না। বাঙ্গলা ভাষার কাঠাম বজায় না রাখ্‌তে পার্‌লে আমাদের লেখার যে উন্নতি হবে না, একথা নিশ্চিত। কিন্তু সেই কাঠাম বজায় রাখতে গেলে, ভাষারাজ্যে বঙ্গভঙ্গ হবার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা, সে বিষয়ে একটু আলোচনা দরকার। আমি তর্কটা উত্থাপন করে দিচ্ছি, তার সিদ্ধান্তের ভার, যাঁরা বঙ্গভাষার অস্থিবিদ্যায় পারদর্শী, তাঁদের হস্তে ন্যস্ত থাক্‌ল।

ভাষায় প্রাদেশিকতা।

প্রাদেশিক ভাষা—অর্থাৎ dialect—এই নাম শুনলেই আমাদের ভীত হবার কোনও কারণ নেই। সম্ভবত এক সংস্কৃত ব্যতীত, গ্রীক ল্যাটিন প্রভৃতি মৃত ভাষাসকল এক সময়ে লোকের মুখের ভাষা ছিল। এবং সেই সেই ভাষার সাহিত্য সেই যুগের লেখকেরা "যচ্ছ্রুতং তল্লিখিতং" এই উপায়েই গড়ে তুলেছেন। গ্রীক সাহিত্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে ইহজগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য। কিন্তু এ অপূর্ব্ব সাহিত্য কোনরূপ সাধু-ভাষায় লেখা হয় নি, dialect-এই লেখা হয়েছে। গ্রীক

সাহিত্য একটি নয়, তিনটি dialect-এ লেখা! এইটেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে মুখের ভাষায় বড় সাহিত্য গড়া চলে। আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যও মৌখিক ভাষার অনুসারেই লেখা হয়ে থাকে, "মুদ্রিত সাহিত্যের" ভাষায় লেখা হয় না। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই যেখানকার উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিমের লোকেরা ঠিক সমভাবেই কথা বলে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালি প্রভৃতি দেশেও dialect-এর প্রভেদ যথেষ্ট আছে। অথচ ইংরাজি সাহিত্যের ভাষা, ইংরাজ জাতির মুখের ভাষারই অনুরূপ। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পাঁচটি dialect-এর মধ্যে কেবল একটিমাত্র সাহিত্যের সিংহাসন অধিকার করে। এবং তার কারণ হচ্ছে সেই dialect-এর সহজ শ্রেষ্ঠত্ব। ইতালির ভাষায় এর প্রমাণ অতি স্পষ্ট। ইতালির সাহিত্যের ভাষার দুটি নাম আছে। এক lingua purgata অর্থাৎ শুদ্ধ ভাষা, আর এক lingua Toscana অর্থাৎ টস্কানি প্রদেশের ভাষা। টস্কানির কথিত ভাষাই সমগ্র ইতালির অধিবাসীরা সাধুভাষা বলে গ্রাহ্য করে' নিয়েছে। আমাদের দেশে প্রচলিত নানারূপ বুলির মধ্যেও যে, একটি বিশেষ প্রদেশের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হবে তাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? ফলে হয়েছেও তাই।

চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত লেখকেরা প্রায় একই ভাষায় লিখে গেছেন। অথচ সে কালের লেখকেরা একটি সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা করে, পাঁচজনের ভোট নিয়ে, সে ভাষা রচনা করেন নি; কোন স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলী থেকেও তাঁরা সাধুভাষা শিক্ষা করেন নি—বাঙ্গলা বই পড়ে' তাঁরা বই লেখেন নি। তাঁরা যে ভাষাতে বাক্যালাপ করতেন, সেই

ভাষাতেই বই লিখ্‌তেন, এবং তাঁদের কলমের সাহায্যেই আমাদের সাহিত্যের ভাষা আপ্‌নাআপ্‌নি গড়ে উঠেছে!

আমরা উত্তর বঙ্গের লোক, যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণ-দেশী ভাষা বলে থাকি, বঙ্গভাষার সেই dialect-ই সাহিত্যের স্থান অধিকার করেছে। বাঙ্গলা দেশের মানচিত্রে দক্ষিণ দেশের নির্ভুল চৌহুদ্দি নির্ণয় করে দেওয়া আমার সাধ্য নয়। তবে মোটামুটি এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, নদিয়া শান্তিপুর প্রভৃতি স্থানে, ভাগিরথীর উভয় কূলে, এবং বর্ত্তমান বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশে যে dialect প্রচলিত ছিল, তাই কতক পরিমাণে সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে সাধু-ভাষার রূপ ধারণ করেছে! এর একমাত্র কারণ, বাঙ্গলা দেশের অপরাপর dialect অপেক্ষা উক্ত dialect-এর সহজ শ্রেষ্ঠত্ব।

উচ্চারণের কথা।

Dialect-এর পরস্পরের মধ্যে ভেদ প্রধানত উচ্চারণ নিয়েই। যে dialect-এ শব্দের উচ্চারণ পরিষ্কাররূপে হয়, সে dialect প্রথমত ঐ এক গুণেই অপর সকল dialect এর অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ, এবং সেই কারণেই শ্রেষ্ঠ। ঢাকাই কথা এবং খাস-কল্‌কাত্তাই কথা—অর্থাৎ সুতানুটির গ্রাম্য ভাষা—দুয়েরি উচ্চারণ অনেকটা বিকৃত; সুতরাং ঢাকাই কিম্বা খাস-কল্‌কাত্তাই কথা পূর্ব্বেও সাহিত্যে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করতে পারে নি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। পূর্ব্ববঙ্গের মুখের কথা প্রায়ই বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ হীন, আবার শ্রীহট্ট অঞ্চলের ভাষা প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ হীন। যাদের মুখের

"ঘোড়া" ও "গোরা" একাকার হয়ে যায়, তাদের চেয়ে যাদের মুখ হতে ঐ শব্দ নিজ নিজ আকারেই বার হয়, তাদের ভাষা যে শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হবে, এ আর কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। 'রড়য়োরভেদ', চন্দ্রবিন্দু বর্জ্জন, 'স' স্থানে 'হ'য়ের ব্যবহার, প্রভৃতি উচ্চারণের দোষে পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা পূর্ণ। স্বরবর্ণের ব্যবহারও উক্ত প্রদেশে একটু উল্টোপাল্টা রকমের হয়ে থাকে। যাঁরা 'করে'র পরিবর্ত্তে 'করিয়া' লেখবার পক্ষপাতী, তাঁরা মুখে 'কইর্যা' বলেন। সুতরাং তাঁদের মুখের কথার অনুসারে যে লেখা চলেনা তা অস্বীকার কর্‌বার যো নাই। অপর পক্ষে খাস-কল্‌কাত্তাই বুলিও ভদ্রসমাজে প্রতিপত্তি লাভ কর্‌তে পারে নি এবং পারবে না। ও ভাষার কতকটা ঠোঁটকাটা ভাব আছে। ট্যাকা, ক্যাঁঠাল, ক্যাঁওলী, নুচি, আঁব, রে, দোর, সকালা, বিকালা, পিচাশ (পিশাচ অর্থে), প্রভৃতি বিকৃত উচ্চারিত শব্দও সাহিত্যে প্রমোশন পাবার উপযুক্ত নয়। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের মুখে স্বরবর্ণ ছড়িয়ে যায়, কল্‌কাতার লোকের মুখে স্বরবর্ণ জড়িয়ে যায়। এমন কোনই প্রাদেশিক ভাষা নেই যাতে অন্তত কতকগুলি কথাতেও কিছু না কিছু উচ্চারণের দোষ নেই। কম বেশি নিয়েই আসল কথা। Tuscan dialect সাধু ইতালীয় ভাষা বলে' গ্রাহ্য হয়েছে, কিন্তু Florence-এ অদ্যাবধি 'ক'র স্থলে 'হ' উচ্চারিত হয়, 'seconda' 'sehonda' আকারে দেখা দেয়। কিন্তু বহুগুণ সন্নিপাতে একটি আধটি দোষ উপেক্ষিত হয়ে থাকে। সকল দোষগুণ বিচার করে' মোটের উপর দক্ষিণদেশী ভাষাই উচ্চারণ হিসেবে যে বঙ্গদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ dialect, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই।

প্রসিদ্ধ এবং অপ্রসিদ্ধার্থক শব্দ।

দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রতি dialect-এই এমন গুটিকতক কথা আছে, যা' অন্য প্রদেশের লোকদের নিকট অপরিচিত। যে dialect-এ এই শ্রেণীর কথা কম, এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই নিকট পরিচিত শব্দের ভাগ বেশি, সেই dialect-ই লিখিত ভাষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। আমার বিশ্বাস দক্ষিণদেশী ভাষায় ঐরূপ সর্ব্বজনবিদিত কথা গুলিই সাধারণত মুখে মুখে প্রচলিত। উত্তর বঙ্গের ভাষার তুলনায় যে দক্ষিণবঙ্গের ভাষা বেশি প্রসিদ্ধার্থক, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষ্য দিতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ আমি দুই চারটি শব্দের উল্লেখ করতে চাই। উত্তর বঙ্গে, অন্ততঃ রাজসাহী এবং পাবনা অঞ্চলে, আমরা সকলেই 'পৈতা, 'চুপকরা', 'সকাল', 'সখ্', 'কুল', 'পেয়ারা, 'তরকারি', প্রভৃতি শব্দ নিত্য ব্যবহার করি নে, কিন্তু তার অর্থ বুঝি। অপর পক্ষে 'নগুণ', 'নক্‌করা', 'বিয়ান', 'হাউস', 'বোর', 'আম-সব্‌রি', 'আনাজ' প্রভৃতি আমাদের চল্‌তি কথাগুলির অর্থ দক্ষিণদেশবাসীদের নিকট একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। এই কারণেও দক্ষিণদেশের মুখের কথা লিখিত ভাষার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। খাস কল্‌কাত্তাই ভাষাতেও অপরের নিকট দুর্ব্বোধ্য অনেক কথা আছে, এবং তা ছাড়া মুখে মুখে অনেক ইতর কথারও প্রচলন আছে, যা' লেখা চলে না। ইতর কথার উদাহরণ দেওয়াটা সুরুচিসঙ্গত নয় বলে' আমি খাস-কল্‌কাত্তাই ভাষার ইতরতার বিশেষ পরিচয় এখানে দিতে পার্‌লুম না। কল্‌কাতার লোকের আটহাত আটপৌরে ধুতির মত তাদের আটপৌরে ভাষাও বি-কচ্ছ, এবং সেই কারণেই তার সাহায্যে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। স্ত্রীর প্রতি 'ম'কারাদি

প্রয়োগ করা, যাদের জঙ্গল কেটে কল্‌কাতায় বাস সেই সকল ভদ্রলোকেরই সাজে, বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মুখে সাজে না। এই কারণেই বাঙ্গালে ভাষা কিম্বা কল্‌কাত্তাই ভাষা, এ উভয়ের কোনটিই অবিকল লেখার ভাষা হতে পারে না। আমি যে প্রাদেশিক ভাষাকে দক্ষিণদেশী ভাষা বলি, সেই ভাষাই সম্পূর্ণরূপে সাহিত্যের পক্ষে উপযোগী।

বিভক্তির কথা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে ঐ দক্ষিণদেশী ভাষাই তার আকার এবং বিভক্তি নিয়ে এখন সাধুভাষা বলে' পরিচিত। অথচ আমি তার বন্ধন থেকে সাহিত্যকে কতকটা পরিমাণে মুক্ত করে' এ যুগের মৌখিক ভাষার অনুরূপ করে' নিয়ে আস্‌বার পক্ষপাতী। এবং আমার মতে, খাস-কল্‌কাত্তাই নয়, কিন্তু কলিকাতার ভদ্রসমাজের মুখের ভাষা অনুসরণ করেই আমাদের চলা কর্ত্তব্য।

জীবনের ধর্ম্মই হচ্ছে পরিবর্ত্তন। জীবন্ত ভাষা চিরকাল এক রূপ ধারণ করে' থাকে না, কালের সঙ্গে সঙ্গেই তার রূপান্তর হয়। Chaucer-এর ভাষায় আজকাল কোন ইংরাজ লেখক কবিতা লেখেন না, Shakespeare-এর ভাষাতেও লেখেন না। কালক্রমে মুখে মুখে ভাষার যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাই গ্রাহ্য করে' নিয়ে তাঁরা সাহিত্য রচনা করেন। আমাদেরও তাই করা উচিত। ভাষার গঠনের বদলের জন্য বহু যুগ আবশ্যক, শব্দের আকৃতি ও রূপ নিত্যই বদ্‌লে আস্‌ছে। ভাষা একবার লিপিবদ্ধ হলে, অক্ষরে শব্দের রূপ অনেকটা ধরে রাখে, তার পরিবর্ত্তনের পথে বাধা দেয়, কিন্তু একেবারে বন্ধ কর্‌তে

পারে না। আর, যে সকল শব্দ লেখায় ব্যবহৃত হয় না, তাদের চেহারা মুখে মুখে চট্‌পট্‌ বদ্‌লে যায়। আজকাল আমরা নিত্য যে ভাষা ব্যবহার করি, তা আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের ভাষা হতে অনেক পৃথক। প্রথমত সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দ আজকাল বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয় যা' পূর্ব্বে হ'ত না; দ্বিতীয়ত অনেক শব্দ যা' পূর্ব্বে ব্যবহার হত তা' এখন ব্যবহার হয় না; তৃতীয়ত, যে কথার পূর্ব্বে চলন ছিল তার আকার এবং বিভক্তি অনেকটা নতুন রূপ ধারণ করেছে। আমার মতে সাহিত্যের ভাষাকে সজীব করতে হলে তাকে এখনকার ভদ্রসমাজের প্রচলিত ভাষার অনুরূপ করা চাই। (১) তার জন্য অনেক কথা যা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সংস্কৃতের অত্যাচারে যা আজকাল আমাদের সাহিত্যের বহির্ভূত হয়ে পড়েছে, তা আবার লেখায় ফিরিয়ে আন্‌তে হবে। (২) তারপর মুখে মুখে প্রচলিত শব্দের আকারের এবং বিভক্তির যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে, সেটা মেনে নিয়ে, তাদের বর্ত্তমান আকারে ব্যবহার করাই শ্রেয়। "আসিতেছি" শব্দের এই রূপটী সাধু, এবং "আস্‌ছি" এই রূপটি অসাধু বলে গণ্য। শেষোক্ত আকারে এই কথাটি ব্যবহার করতে গেলেই, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়, যে আমরা বঙ্গ সাহিত্যের মহাভারত অশুদ্ধ করে দিলুম। একটু মনোযোগ করে' দেখ্‌লেই দেখা যায় যে "আস্‌ছি" "আসি-তেছি"র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আকার। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে যে, "আসিতেছি"র ব্যবহার আছে তার কারণ, তখন লোকের মুখে কথাটি ঐ আকারেই ব্যবহৃত হ'ত। আজও উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গে মুখে মুখে ঐ আকারই প্রচলিত। সমগ্র বাঙ্গলাদেশ ভাষা সম্বন্ধে পূর্ব্বে যেখানে ছিল, উত্তর এবং পূর্ব্ববঙ্গ আজও

সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দক্ষিণ বঙ্গ অনেক এগিয়ে এসেছে। "আসিতেছি"তে "আসিতে" এবং "আছি" এই দুটি ক্রিয়া গা-ঘেঁষাঘেষি করে রয়েছে, দুয়ে মিলে একটি ক্রিয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু শব্দটির "আস্‌ছি" এই আকারে "আছি" এই ক্রিয়াটী লুপ্ত হয়ে "ছি" এই বিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং "আস্‌ছি"র অপেক্ষা "আসিতেছি" কোন হিসেবেই অধিক শুদ্ধ নয়, শুধু বেশি সেকেলে, বেশি ভারী, এবং বেশি অচল আকার। সুতরাং "আসিতেছি" পরিহার করে "আস্‌ছি" ব্যবহার কর্‌তে আমরা যে পিছ-পাও হইনে, তার কারণ এ কার্য্য করাতে ভাষাজগতে পিছনো হয় না, বরং সর্ব্বতোভাবে এগোনই হয়।

ঐ একই কারণে "করিয়া" যে "করে" অপেক্ষা বেশি শুদ্ধ, তা নয়, শুধু বেশি প্রাচীন। ও দুয়ের একটিও সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভক্তি নয়, দুই খাঁটি বাঙ্গলা বিভক্তি। প্রভেদ এই মাত্র, যে পূর্ব্বে মুখের ভাষায় "করিয়া"র চলন ছিল, এখন "করে"র চলন হয়েছে। চণ্ডীদাস তাঁর সানুনাসিক বীরভূমি সুরে মুখে বল্‌তেন "করিঞা", তাই লিখেছেনও "করিঞা"। কৃত্তিবাস ভারতচন্দ্র প্রভৃতি নদিয়া জেলার গ্রন্থকারেরা মুখে বল্‌তেন "কর্‌য়া" "ধর্‌য়া", তাই তাঁরা লেখাতেও, যে ভাবে উচ্চারণ কর্‌তেন সেই উচ্চারণ অবিকল বজায় রাখবার জন্য, "ধরিয়া" "করিয়া" আকারে লিখ্‌তেন। সম্ভবত, কৃত্তিবাসের সময়ে অক্ষরে আকার যুক্ত য-ফলা লেখবার সঙ্কেত উদ্ভাবিত হয়নি বলেই, সে যুগের লেখকেরা ঐ যুক্ত স্বরবর্ণের সন্ধি বিচ্ছেদ করে লিখেছেন। ভারতচন্দ্রের সময়ে সে সঙ্কেত উদ্ভাবিত হয়েছিল, তাই তিনি যদিচ পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের লিখন-

প্রণালী সাধারণতঃ অনুসরণ করেছিলেন, তবুও নমুনা স্বরূপ কতকগুলি কবিতাতে "বাঁধ্যা" "ছাঁদ্যা" আকারেরও ব্যবহার করেছেন। অদ্যাবধি উত্তরবঙ্গে আমরা দক্ষিণবঙ্গের সেই পূর্ব্ব প্রচলিত উচ্চারণ ভঙ্গিই মুখে মুখে রক্ষা করে আস্‌ছি। "করে"র তুলনায় "কর‍্যা" শুধু শ্রুতিকটু নয়, দৃষ্টিকটুও বটে, কেননা ঐ আকারে শব্দটি মুখ থেকে বার কর্‌তে হলে, মুখের কিঞ্চিৎ অধিক ব্যাদান করা দরকার। অথচ লিপিবদ্ধ বাক্যের এমনি একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে মুখরোচক না হলেও তা আমাদের শিরোধার্য্য হয়ে উঠে। "ইতাম" "তেম" এবং "তুম" এর মধ্যেও ঐ একই রকমের প্রভেদ আছে। তবে "উম" রূপ বিভক্তিটি অদ্যাবধি কেবলমাত্র কলিকাতা সহরে আবদ্ধ, সুতরাং সমগ্র বাঙ্গলাদেশে যে সেটি গ্রাহ্য হবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, বিশেষত যখন "হালুম" "হলুম" প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অপর এক জীবের ভাষার সাদৃশ্য আছে।

এই এক "উম" বাদ দিয়ে কলিকাতার বাদবাকি উচ্চারণের ভঙ্গিটি যে কথিত বঙ্গ ভাষার উপর আধিপত্য লাভ কর্‌বে, তার আর সন্দেহ নেই। আসলে হচ্ছেও তাই। আজকাল উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল প্রদেশেরই বাঙ্গালী ভদ্রলোকের মুখের ভাষা প্রায় একই রকম হয়ে এসেছে। প্রভেদ যা আছে সে শুধু টান্ টুনের। লিখিত ভাষার রূপ যেমন কথিত ভাষার অনুকরণ করে, তেমনি শিক্ষিত লোকদের মুখের ভাষাও লিখিত ভাষার অনুসরণ করে। এই কারণেই দক্ষিণদেশী ভাষা—যা কালক্রমে সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে—নিজ প্রভাবে শিক্ষিত সমাজেরও মুখের ভাষার ঐক্য সাধন কর্‌ছে। আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে কলিকাতার মৌখিক

ভাষাই সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠ্‌বে। তার কারণ, কলিকাতা রাজধানীতে বাঙ্গলাদেশের সকল প্রদেশের অসংখ্য শিক্ষিত ভদ্রলোক বাস করেন। ঐ একটি মাত্র সহরে সমগ্র বাঙ্গলা-দেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের কথার আদান-প্রদানে যে নব্য ভাষা গড়ে' তুলছেন, সে ভাষা সর্ব্বাঙ্গীন বঙ্গভাষা। সুতানুটি গ্রামের গ্রাম্যভাষা এখন কলিকাতার অশিক্ষিত লোক দের মুখেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আধুনিক কলিকাতার ভাষা বাঙ্গালী জাতির ভাষা, আর খাস্-কল্‌কাত্তাই বুলি শুধু সহুরে Cockney ভাষা।

পৌষ, ১৩১৯ সন।

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা।

—:০:—

সম্প্রতি "সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা" নামক, পুস্তিকাকারে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আমার হস্তগত হয়েছে। লেখক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম, এ, আমার সতীর্থ। একই যুগে, একই বিদ্যালয়ে, একই শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে পরস্পরের মনোভাবে মিল থাকা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। বোধহয় সেই কারণে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত বঙ্গভাষা সম্বন্ধীয় আমার প্রবন্ধটির সঙ্গে উক্ত প্রবন্ধের যে শুধু নামের মিল আছে তা নয়, মতামতেরও অনেকটা মিল আছে। এমন কি স্থানে স্থানে আমরা উভয়ে একই যুক্তি, প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ললিত বাবুর প্রবন্ধ হতে একটি প্যারা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি:—

"যাঁহারা সাধুভাষার অতিমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা যদি কখনো দায়ে ঠেকিয়া একটা চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন, তবে সেটা উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে লেখেন; যেন শব্দটা অপাঙক্তেয়, সাধুভাষার শব্দগুলি সংস্পর্শজনিত পাপে লিপ্ত না হয়, সেই জন্য এই সাবধানতা। ইহা কি জাতিভেদের দেশে অনাচরণীয় জাতিদিগের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের অনুবৃত্তি?"

বাংলা কথাকে সাহিত্য-সমাজে জাতিচ্যুত করবার বিষয়ে আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধে যা বলেছি, তার সঙ্গে তুলনা করলে পাঠক-মাত্রই দেখতে পাবেন যে, আমরা উভয়েই মাতৃভাষার উপর

এরূপ অত্যাচারের বিরোধী। তবে ললিত বাবুর সঙ্গে আমার প্রধান তফাৎ এই যে, তিনি সাধুভাষার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে কি বল্‌বার আছে, অথবা কি সচরাচর বলা হয়ে থাকে, সেই সকল কথা একত্র করে' গুছিয়ে, পাশাপাশি সাজিয়ে, পাঠকদের চোখের সুমুখে ধরে' দিয়েছেন; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষের মতামত বিচার করে' কোনরূপ মীমাংসা করে' দেন নি। আর আমি উত্তর পক্ষের মুখপাত্র স্বরূপে প্রমাণ কর্‌তে চেষ্টা করেছি যে, একটু পরীক্ষা কর্‌লেই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বপক্ষের তর্কযুক্তির ষোল কড়াই কাণা।

ললিত বাবু দেখাতে চান যে, সমস্যাটা কি; আমি দেখাতে চাই যে, মীমাংসাটা কি হওয়া উচিত। ললিত বাবু বলেছেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে বিষয়টির আলোচনা করা। তাই, যদিচ তাঁর মনের ঝোঁক আসলে বঙ্গভাষার দিকে, তবুও তিনি পদে পদে সে ঝোঁক সামলাতে চেষ্টা করেছেন। আমি অবশ্য সে ঝোঁকটি সামলানো মোটেই কর্ত্তব্য বলে মনে করিনে। কোন পক্ষের হয়ে ওকালতী করা দূরে থাক্, তিনি বিচারকের আসন অলঙ্কৃত কর্‌তে অস্বীকৃত হয়েছেন। এমন কি, এই উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হয়ে একটা আপোষ মীমাংসা করে' দেওয়াটাও তিনি আবশ্যক মনে করেন নি।

অপর পক্ষে, আমি বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে যা' শ্রেয় মনে করি, তার জন্য ওকালতী করাটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণনা করি। সেই কারণে আমি আমার নিজের মত কেবলমাত্র প্রচার করে'ই ক্ষান্ত থাকি নে, সেই মতের অনুসারে বাংলা ভাষা লিখতেও চেষ্টা করি। অপরকে কোন জিনিষেরই এপিঠ ওপিঠ দুপিঠ দেখিয়ে দেবার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই, যদি না

আমরা বলে' দিতে পারি যে, তার মধ্যে কোন্‌টি সোজা আর কোন্‌টি উল্টো।

সব দিক রক্ষা করে' চল্‌বার উদ্দেশ্য এবং অর্থ হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা। আমরা সামাজিক জীবনে নিত্যই সে কাজ করে' থাকি। কিন্তু কি জীবনে, কি সাহিত্যে, কোন একটা বিশেষ মত কি ভাবকে প্রাধান্য দিতে না পারলে, আমাদের যত্ন, চেষ্টা এবং পরিশ্রম, সবই নিরর্থক হয়ে যায়। মনোজগতেও যদি আমরা শুধু ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমীর দেখি, তাহলে আমাদের পক্ষে তটস্থ হয়ে থাকা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

সে যাইহোক্, যখন লেখবার একটা বিশেষ রীতি সাহিত্যে চলন করা নিয়ে কথা, তখন আমাদের একটা কোন দিক অবলম্বন কর্‌তেই হবে। কেননা একসঙ্গে দু'দিকে চলা অসম্ভব। তাছাড়া যখন দুটি পথের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক পথ, এ সমস্যা একবার উপস্থিত হয়েছে, তখন—"এ পথও জানি ও পথও জানি, কিন্তু কি কর্‌ব মরে' আছি", এ কথা বলাও আমাদের মুখে শোভা পায় না; কারণ বাজে লোকে যাই মনে করুক না কেন, সাহিত্যসেবী এবং অহিফেনসেবী একই শ্রেণীর জীব নয়।

ললিত বাবুর মতে "সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা, এই মামলার মীমাংসা করিতে হইলে, আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্ ছাড়া উপায় নাই।" এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, তরমিন ডিক্রী-লাভে বাদীর খরচা পোষায় না। ওরকম জিত প্রকারান্তরে হার। এক্ষেত্রে আমরা যে বাদী, সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমাদের নাবালক অবস্থায় সাধুভাষীদের দল

সাহিত্যক্ষেত্র দখল করে বসে আছেন। আমরা শুধু আমাদের অন্বয়াগত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছি।

প্রতিবাদীরা জানেন যে possession is nine points of the law, সুতরাং তাঁদের বিশ্বাস যে আমাদের মাতৃভাষার দাবী তামাদি হয়ে গেছে, ও সম্বন্ধে তাঁদের আর উচ্চবাচ্য কর্‌বার দরকার নেই। এ বিষয়ে বাক্যব্যয় করা তাঁরা কথার অপব্যয় মনে করেন। এ অবস্থায় কোন বিচারপতির নিকট পূরা ডিক্রী পাবার আশা আমাদের নেই, সুতরাং আমরা যদি আবার তা জবর দখল করে' নিতে পারি, তাহলেই বঙ্গসাহিত্য আমাদের আয়ত্তের ভিতর আস্‌বে,—নচেৎ নয়।

(২)

এই সমস্যার একটি চূড়ান্ত মীমাংসার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে যে, পূর্ব্বপক্ষের বক্তব্যটি যে কি, তা আমরা প্রায়ই শুন্‌তে পাই নে। যদি কোন একটি বিশেষ রীতি সমাজে কিম্বা সাহিত্যে কিছুদিন ধরে চলে যায়, তাহলে সেটি নিজের ঝোঁকের বলেই, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাকে বলে inertia, তারই বলে চলে। যা প্রচলিত তার জন্য কোনরূপ কৈফিয়ৎ দেওয়াটা কেউ আবশ্যক মনে করেন না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে, জিনিষটা চল্‌ছে, এইটেই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে তা চলা উচিত! তা ছাড়া যাঁরা মাতৃভাষাকে ইতর ভাষা বলে' গণ্য করেন, তাঁরা হয়ত বঙ্গভাষায় সাহিত্য রচনা ব্যাপারটি "নীচের উচ্চ ভাষণ" স্বরূপ মনে করেন, এবং সুবুদ্ধিবশত ওরূপ দাম্ভিকতা হেসে উড়িয়ে দেওয়াটাই সঙ্গত বিবেচনা করেন।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস এই যে, প্রচলিত আচার ব্যবহারকে মন দিয়ে যাচিয়ে নেওয়াতে বিপদ আছে, কেননা তাদের মতে শুধু স্ত্রী-বুদ্ধি নয়, বুদ্ধিমাত্রই প্রলয়ঙ্করী। সমাজ সম্বন্ধে এ মতের কতকটা সার্থকতা থাকলেও, সাহিত্য সম্বন্ধে মোটেই নেই ; কারণ যে লেখার ভিতর মানব-মনের পরিচয় পাওয়া না যায়, তা সাহিত্য নয়। সুতরাং ললিতবাবু পূর্ব্বপক্ষের মত লিপিবদ্ধ কর্‌বার চেষ্টা করে' বিষয়টি আলোচনার যোগ্য করে' তুলেছেন। একটা ধরাছোঁয়ার মত যুক্তি না পেলে, তার খণ্ডন করা অসম্ভব। কেবলমাত্র ধোঁয়ার উপর তলোয়ার চালিয়ে কোন ফল নেই। ললিতবাবু বহু অনুসন্ধান করে' সাধুভাষার স্বপক্ষে দুটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন, (১) সাধুভাষা আর্টের অনুকূল (২) চলিত ভাষার অপেক্ষা, সাধুভাষা হিন্দুস্থানী মারাঠী গুজরাটী প্রভৃতি ভিন্নজাতীয় লোকদের নিকট অধিক সহজবোধ্য।

আর্টের দোহাই দেওয়া যে কতদূর বাজে, এ প্রবন্ধে আমি সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা কর্‌তে চাইনে। এদেশে প্রায়ই দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, যুক্তি যখন কোন দাঁড়াবার স্থান পায় না, তখন আর্ট্‌ প্রভৃতি বড় বড় কথার অন্তরালে আশ্রয় গ্রহণ করে। যে বিষয়ে কারও কোন স্পষ্ট ধারণা নেই, সে বিষয়ে বক্তৃতা করা অনেকটা নিরাপদ, কেননা সে বক্তৃতা যে অন্তঃ-সারশূন্য, এ সত্যটি সহজে ধরা পড়ে না। তথাকথিত সাধুভাষা সম্বন্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে, ওরূপ কৃত্রিম ভাষায় আর্টের কোনও স্থান নেই। এ বিষয় আমার যা বক্তব্য আছে তা আমি সময়ান্তরে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বল্‌ব। এস্থলে এইটুকু বলে' রাখ্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, "রচনার যে প্রধান গুণ এবং

প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা” (বঙ্কিমচন্দ্র)—লেখায় সেই গুণটি আন্‌বার জন্য যথেষ্ট গুণপনার দরকার। আর্ট-হীন লেখক নিজের মনোভাব ব্যক্ত কর্‌তে কৃতকার্য্য হন্ না।

দ্বিতীয় যুক্তিটি এতই অকিঞ্চিৎকর যে, সে সম্বন্ধে কোনরূপ উত্তর কর্‌তেই প্রবৃত্তি হয় না। আমি আজ দশ এগারো বৎসর পূর্ব্বে, আমার লিখিত এবং “ভারতী”-পত্রিকাতে প্রকাশিত “কথার কথা” নামক প্রবন্ধে এসম্বন্ধে যে কথা বলেছিলুম, এখানে তাই উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। যুক্তিটি বিশেষ পুরণো, সুতরাং তার পুরণো উত্তরের পুনরাবৃত্তি অসঙ্গত নহে।

“এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের মত যদি ভুল না বুঝে থাকি, তাহ’লে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আন্‌লে আসাম হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষার শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠ্‌বে। দ্বিতীয়তঃ, অন্য ভাষার যা সুবিধা নেই, বাংলার তা আছে, যে-কোন সংস্কৃত কথা যেখানে হোক্ লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলা ভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্ব্বোধ করে তুল্‌তে হবে! কথাটা এতই অদ্ভুত যে, এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কিনা দেখা যাক্। আমাদের দেশের ছোট ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাংলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলেই সংস্কৃত হয়। আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথার অনুস্বর বিসর্গ ছেঁটে দিলেই বাংলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের লেজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়!”

যদি কারও এরূপ ধারণা থাকে যে, উক্ত “উপায়ে রাষ্ট্রীয় একতা সংস্থাপিত হইবার পথ প্রশস্ত হইবে, কালে ভারতের সর্ব্বত্র এক ভাষা হইবে”—তাহ’লে সে ধারণা নিতান্ত অমূলক।

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সভ্যতা যে আকারই ধারণ করুক না কেন, একাকার হয়ে যাবে না। যা পূর্ব্বে কস্মিনকালেও হয়নি, তা পরে কস্মিনকালেও হবে না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতিরা যে ভাষা, ভাব, আচার এবং আকার সম্বন্ধে নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে এক জাতি হয়ে উঠ্‌বে, এ আশা করাও যা, আর কাঁঠাল গাছ ক্রমে আমগাছ হয়ে উঠ্‌বে, এ আশা করাও তাই। পুরাকালেও এদেশের দার্শনিকেরা যে সমস্যার মীমাংসা কর্‌বার চেষ্টা করেছিলেন, এ যুগের দার্শনিক-দেরও সেই একই সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে হবে। সে সমস্যা হচ্ছে—বহুর মধ্যে এক দেখা। রাষ্ট্রীয় ঐক্যস্থাপনের একমাত্র উপায় হচ্ছে, ভারতবর্ষের নানা জাতির বিশেষত্ব রক্ষা করে’ও সকলকে এক যোগসূত্রে বন্ধন করা। রাষ্ট্রীয় ভাবনাও যখন অতি ফলাও হয়ে ওঠে, এবং দেশে বিদেশে চারিয়ে যায়, তখন সে ভাবনা দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। বঙ্গসাহিত্যের যত শ্রীবৃদ্ধি হবে, তত তার স্বাতন্ত্র্য আরও ফুটে উঠ্‌বে—লোপ পাবে না।

(৩)

ললিতবাবু পণ্ডিতী বাংলার উপর বিশেষ নারাজ। আমি অবশ্য সেরকম রচনা-পদ্ধতির পক্ষপাতী নই। তবে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত লেখকদের স্বপক্ষে এই কথা বলবার আছে যে, তাঁরা সংস্কৃত শব্দ ভুল অর্থে ব্যবহার করেন নি। তাঁদের হাতে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ মিষ্ট প্রয়োগ না হলেও, দুষ্ট প্রয়োগ নয়। “প্রবোধ চন্দ্রিকা” কিম্বা “পুরুষ পরীক্ষা” পড়্‌লে

বাংলা আমরা শিখতে না পারি, কিন্তু সংস্কৃত ভুলে যাইনে। উক্ত বই দুখানির রচয়িতা ৺মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের আমি বিশেষ পক্ষ-পাতী। কেননা তিনি সুপণ্ডিত এবং সুরসিক। একাধারে এই উভয় গুণ আজকালকার লেখকদের মধ্যে নিতান্ত দুর্লভ হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের গল্প বল্‌বার ক্ষমতা অসাধারণ। অল্প কথায় একটি গল্প কি করে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে বল্‌তে হয়, তার সন্ধান তিনি জান্‌তেন। "পুরুষ পরীক্ষা"র ভাষা ললিতবাবু যে কি কারণে "শব্দাড়ম্বরময় জড়িমা-জড়িত ভাষা" মনে করেন, তা আমি বুঝতে পার্‌লুম না,—কারণ সে ভাষা নদীর জলের ন্যায় স্বচ্ছ এবং স্রোতস্বতী। "প্রবোধ চন্দ্রিকার" পূর্ব্বভাগের ভাষা কঠিন হলেও শুষ্ক নয়। যিনি তা'তে দাঁত বসাতে পার্‌বেন, তিনিই তার রসাস্বাদ করতে পার্‌বেন। আমাদের নব্য লেখকেরা যদি মনোযোগ দিয়ে "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" পাঠ করেন, তাহ'লে রচনা সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ লাভ কর্‌তে পারবেন। যথা,—'ঘট'কে "কম্বুগ্রীব বৃকোদর" বলে' বর্ণনা করলে, তা আর্ট হয় না, এবং নর ও বিষাণ এই দুটি বাক্যকে একত্র কর্‌লে "নরবিষাণ"রূপ পদ রচিত হলেও, তার অনুরূপ মানুষের মাথায় শিং বেরোয় না; যদি কারও মাথায় বেরোয় ত সে পদকর্ত্তার!

রাজা রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের লেখার দোষধরা সহজ, কিন্তু আমরা যেন এ কথা ভুলে না যাই যে, এঁরাই হচ্ছেন বাংলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম গদ্যলেখক। বাঙ্গলা-গদ্যের রচনা-পদ্ধতি এঁদেরই উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। তাঁদের মুস্কিল হয়েছিল শব্দ নিয়ে নয়, অন্বয় নিয়ে। রাজা রামমোহন রায়, তাঁর রচনা পড়্‌তে হলে পাঠককে কি উপায়ে তার অন্বয়

করতে হবে, তার হিসেব বলে' দিয়েছেন]। রাজা রামমোহনের গদ্য যে আমাদের কাছে একটু অদ্ভুত লাগে, তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, তাঁর বিচারপদ্ধতি ও তর্কের রীতি সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত-শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের অনুরূপ। সে পদ্ধতিতে আমরা গদ্য লিখিনে, আমরা ইংরাজি গদ্যের সহজ এবং স্বচ্ছন্দ গতিই অনুকরণ করতে চেষ্টা করি। রামমোহন রায়ের গদ্যে বাগাড়ম্বর নেই, সমাসের নামগন্ধও নেই, এবং সে ভাষা সংস্কৃত-বহুলও নয়।

তারপর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য যে আমরা standard prose হিসাবে দেখি, তার কারণ, তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রাঞ্জল গদ্য রচনা করেন। সে ভাষার মর্য্যাদা—তার সংস্কৃতবহুলতার উপর নয়, তার syntax-এর উপর নির্ভর করে। রাজা রামমোহন রায়ের ভাষার সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা তুলনা করে' দেখলে, পাঠকমাত্রেই বুঝ্‌তে পারবেন যে, অন্বয়ের গুণেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে।

এই সব কারণেই পণ্ডিতী বাংলার সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা বঙ্গভাষার কোনও ক্ষতি করেন নি, বরং অনেক উপকার করেছেন। বিশেষত সে ভাষা যখন কোন নব্যলেখক অনুকরণ করেন না, তখন তার বিরুদ্ধে আমাদের খড়্গহস্ত হয়ে ওঠ্‌বার দরকার নেই। আসল সর্ব্বনেশে ভাষা হচ্ছে -"চন্দ্রাহত সাহিত্যিক"রা ইংরাজি কাব্য এবং পদকে যেমন তেমন করে অনুবাদ করে' যে খিচুড়ি ভাষার সৃষ্টি করছেন—সেই ভাষা। সে ভাষার হাত থেকে উদ্ধার না পেলে, বঙ্গ-সাহিত্য আঁতুড়েই মারা যাবে। এবং সেই কৃত্রিম ভাষার হাত এড়াতে হ'লে মৌখিক ভাষার আশ্রয়

নেওয়া ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং "আলালী" ভাষাকে আমাদের শোধন করে' নিতে হবে। বাবু বাংলার কোনরূপ সংস্কার করা অসম্ভব, কারণ সে ভাষা হচ্ছে পণ্ডিতী বাংলার বিকারমাত্র। দুধ একবার ছিঁড়ে গেলে, তা আর কোন কাজে লাগে না। ললিতবাবুর মতে পণ্ডিতি বাংলার "কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন সমিতির বায়ুশূন্য টিনের কৌটায় রক্ষিত।" আমি বলি তা নয়। স্কুলপাঠ্য-পুস্তকরূপ টিনের কৌটায় যা রক্ষিত হয়ে থাকে, তা শুধু সাধু-ভাষারূপ নটানো গরুর দুধ। সুতরাং সেই টিনের গরুর দুধ খেয়ে যারা বড় হয়, মাতৃদুগ্ধ যে তাদের মুখরোচক হয় না, তা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

(৪)

আমাদের রচনায় কতদূর পর্য্যন্ত আরবী, পারসী, ইংরাজী প্রভৃতি বিদেশী শব্দের ব্যবহার সঙ্গত, সে বিষয়ে ললিতবাবু এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, "এক সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় আরবী পারসী শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে, এবং আজকাল ইংরাজী শব্দের প্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সকল ভাষাতেই যাহা ঘটিয়াছে বাঙ্গলা ভাষাতেও তাহাই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।" এক কথায় প্রাকৃতিক নিয়মের বিপক্ষতাচরণ করায় কোন লাভ নেই। যে সকল বিদেশী শব্দ বেমালুম বঙ্গভাষার অন্তর্ভূত হয়ে গেছে, সে সকল শব্দ অবশ্য কথার মত লেখাতেও নিত্য ব্যব-হার্য্য হওয়া উচিত।

কোন শব্দের উৎপত্তি বিচার করে', যে লেখক সেটিকে জোর করে সাহিত্য হতে বহিষ্কৃত করে দেবেন, তিনিই ঠক্‌বেন,

কারণ ও উপায়ে শুধু অকারণে ভাষাকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা হয়। আমি এ বিষয়ে ললিতবাবুর মতের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। কিন্তু একটি কথা আমাদের মনে রাখা কর্ত্তব্য—বঙ্গভাষা বাঙ্গালী হিন্দুর ভাষা; এদেশে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের বহুপূর্ব্বে গৌড়ীয় ভাষা প্রায় বর্ত্তমান আকারে গঠিত হয়ে উঠেছিল।

মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের মতে "অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তম,—সর্ব্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্য-হেতুক।"—গৌড়ীয় প্রাকৃত অপর সকল প্রাকৃত অপেক্ষা উত্তম কি অধম, সে বিচার আমি করতে চাই নে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার সম্বন্ধ যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মতে ভাষাশব্দ ত্রিবিধ, "তজ্জ-তৎসম-দেশ্য"। বঙ্গভাষায় তজ্জ এবং তৎসম শব্দের সংখ্যা অসংখ্য, দেশ্য শব্দের সংখ্যা অল্প, এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা অতি সামান্য।

এ বিষয়ে ফরাসী ভাষার সহিত বঙ্গভাষা একজাতীয় ভাষা। একজন ইংরাজী লেখক ফরাসী ভাষা সম্বন্ধে যা বলেছেন, সেই কথাগুলি আমি নীচে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। তার থেকে পাঠক-মাত্রই দেখতে পাবেন যে, ল্যাটিন ভাষার সহিত ফরাসী ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ, সংস্কৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষারও ঠিক সেই একই-রূপ সম্বন্ধ:—

With a very few exceptions, every word in the French vocabulary comes straight from Latin. The influence of pre-Roman Celts, is almost imperceptible; while the number of words

introduced by the Frankish conquerors amounts to no more than a few hundreds.

উদ্ধৃত পদটিতে French-এর স্থানে বঙ্গভাষা, pre-Roman-এর স্থানে বাঙ্গলার আদিম অনার্য্য জাতি, Latin-এর স্থলে সংস্কৃত,—এবং Frankish-এর স্থলে মুসলমান, এই কথা ক'টি বদ্‌লে নিলে, উক্ত বাক্য ক'টি বঙ্গভাষার সঠিক বর্ণনা হয়ে ওঠে।

ঐরূপ হওয়াতে, ফরাসী সাহিত্যের যা বিশেষ গুণ, বঙ্গ-সাহিত্যেরও সেই গুণ থাকা সম্ভব এবং উচিত। সে গুণ পূর্ব্বোক্ত লেখকের মতে হচ্ছে এই—

French literature is absolutely homogeneous. The genius of the French language, descended from its single stock has triumphed most—in simplicity, in unity, in clarity, and in restraint.

সুতরাং জোর করে' যদি আমরা বাঙ্গলা ভাষায় এমন সব আরবী কিম্বা পারসী শব্দ ঢোকাতে চেষ্টা করি, যা' ইতিপূর্ব্বে আমাদের ভাষার অঙ্গীভূত হয়ে যায় নি, তাহলে ঐরূপ উপায়ে আমরা বঙ্গভাষাকে শুধু বিকৃত করে ফেলব।

সম্প্রতি বাঙ্গলা ভাষার উপর ঐরূপ জবরদস্তি করবার প্রস্তাব হয়েছে বলে, এ বিষয়ে আমি বাঙ্গালীমাত্রকেই সতর্ক থাক্‌তে অনুরোধ করি। আগন্তুক ঢাকা-ইউনিভার্সিটির রিপোর্টে দেখ্‌তে পাই, একটু ঢাকা-চাপা দিয়ে ঐ প্রস্তাবই করা হয়েছে। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর আর্য্য আক্রমণের বিষয়ে আমি অনেক-রূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করেছি; কিন্তু ঐ স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাবলীর উপর এই মুসলমান আক্রমণের প্রস্তাবটি আরও ভয়ঙ্কর, কেননা,

বাঙ্গলা ভাষার "তদ্ভব" শব্দকে রূপান্তরিত করে' "তৎসম" করলেও বাঙ্গলা ভাষার ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, কিন্তু অপরিচিত এবং অগ্রাহ্য বিদেশী শব্দকে আমাদের সাহিত্যে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়াতে তার বিশেষত্ব নষ্ট করে' তাকে কদর্য্য এবং বিকৃত করে ফেলা হয়। এই উভয় সঙ্কট হতে উদ্ধার পাবার একটি খুব সহজ উপায় আছে। বাংলা ভাষা হ'তে বাংলা শব্দসকল বহিষ্কৃত করে' দিয়ে, অর্দ্ধেক সংস্কৃত এবং অর্দ্ধেক আরবী-পারসী শব্দ দিয়ে ইস্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করলে, দুকূল রক্ষে হয়!

চৈত্র, ১৩১৯ সন।

বাংলা ব্যাকরণ।

(A Practical Bengali Grammar by W. S. Milne I. C. S.)

বাংলা ব্যাকরণ বাঙ্গালীতে লেখেন না, লেখেন শুধু ইংরাজে। কথাটা হঠাৎ শুন্‌তে একটু খট্‌কা লাগলেও মিছে নয়। বাংলার নবপ্রকাশিত মাসিকপত্র "ভারতবর্ষে" প্রকাশ যে "ব্রেসি হালহেডের প্রথম বাংলা ব্যাকরণ, বাংলাদেশে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন।" ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক হুগলীতে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি W. S. Milne আর একখানি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ইতিমধ্যে বাঙ্গালীর হাত থেকে অবশ্য অসংখ্য শিশুবোধ ব্যাকরণ বেরিয়েছে, কিন্তু যতদূর আমার জানা আছে তার একখানিও বঙ্গভাষার ব্যাকরণ নয়। সে সকল বইয়ের উদ্দেশ্য আমাদের ভাষাকে যতদূর সম্ভব সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মাধীন করা। কারণ এই শ্রেণীর বঙ্গ-বৈয়াকরণিকদিগের বিশ্বাস যে "যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে বঙ্গভাষা শুদ্ধ করিয়া লিখিতে এবং কহিতে পারা যায় তাহার নাম ব্যাকরণ।" বাঙ্গালী ছেলের পক্ষে যে বাংলাভাষায় কথা কইবার জন্য কোনরূপ "শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ" করতে হয় না—এ সহজ সত্যটি আমরা সহজে স্বীকার করতে চাই নে। কাযেই ব্যাকরণ-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য যে পদ এবং বাক্যের গঠনের নিয়ম, "বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি নির্দ্ধারণ" করা, এ ধারণা আমাদের জন্মায় না।

আমাদের পক্ষে চলাফেরা করবার জন্য যেমন নিজ নিজ দেহযন্ত্রটির গঠন জানবার কোনরূপ আবশ্যকতা নেই, তেমনি মাতৃভাষা লেখবার এবং বলবার জন্য সেই ভাষাযন্ত্রটির গঠন জানা আবশ্যক নয়। ঐ যন্ত্রটি বিগ্‌ড়ে গেলে তার মেরামত করবার জন্য ব্যাকরণশাস্ত্র কাজে লাগে। আমরা যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষাই বিশুদ্ধ বাংলাভাষা। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে, সংস্কৃত শব্দের সাহায্যে পণ্ডিতদের হাতে-গড়া কোনও ভাষা তার চেয়ে বেশি শুদ্ধ হতে পারে, সাধু হতে পারে, কিন্তু সে ভাষা বঙ্গভাষা নয়। লিখিত ভাষা সম্বন্ধে এই কৃত্রিম শুদ্ধাচারের প্রতি অতিভক্তিবশত দেশাচার লোকাচার এবং কুলাচারের জ্ঞান আমরা হারাতে বসেছি। বাংলা যে প্রায়-সংস্কৃত ভাষা নয়, কিন্তু একটি বিশেষ স্বতন্ত্র ভাষা, এ জ্ঞান না থাক্‌লে বাংলা ব্যাকরণ লেখবার প্রবৃত্তিও হয় না, লেখাও যায় না। এই কারণে আমরা বাংলা ব্যাকরণ লিখিও নে, পড়িও নে।

কিন্তু বিদেশীর পক্ষে আমাদের ভাষা আয়ত্ত করতে হলে, তার মূল প্রকৃতি এবং গঠনের নিয়ম জানা দরকার। ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত বিদেশীর পক্ষে ভাষাজ্ঞান বিষয়ে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব।

হালহেড সাহেব যে ঐ কারণে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন, তা তাঁর "ভারতবর্ষ"-ধৃত বচন থেকেই জানা যায়। সে বচন এই :—

"বোধপ্রকাশং শব্দশাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপকারার্থং ক্রিয়তে হালহেদংগ্রেজি।"

তারপর অবশ্য স্কুলপাঠ্য বহুতর বাংলা ব্যাকরণ রচিত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত সেই সকল বই থেকে লিখিত ভাষার জ্ঞান কতকটা জন্মালেও, খাঁটি বাংলা-ভাষা শিক্ষার পক্ষে কোনরূপ সাহায্যই পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই Milne সাহেব এই নূতন ব্যাকরণ রচনা করেছেন। তিনি ভূমিকায় বলেছেন যে—"When studying Bengali I found myself greatly hampered by the want of a Grammar dealing with the colloquial idioms of the modern language. In this book an effort has been made to present to the English student those peculiarities of idiom which are likely to cause difficulties."

যদিচ মুখ্যত ইংরাজের জন্যই এই ব্যাকরণ লেখা হয়েছে, তবুও প্রত্যেক বাঙ্গালীর এই বইখানি পড়া উচিত। বাংলা ভাষার বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে বাংলা ব্যাকরণ যে রচনা করা উচিত, এ ধারণা আজকাল বহুলোকের মনে জন্মেছে। কেউ কেউ আংশিক ভাবে বাংলা ভাষার গঠনের নিয়ম আবিষ্কার করবার চেষ্টাও করেছেন, কিন্তু মিলন্ সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে একখানি পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেছেন। ইতি-পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় ব্যতীত, অপর কোনও বঙ্গলেখক এরূপ ব্যাকরণ লেখবার চেষ্টামাত্রও করেছেন বলে আমার জানা নেই।

রামমোহন রায়ের "গৌড়ীয় ভাষা-ব্যাকরণ" স্কুলবুক সোসা-ইটির অনুরোধে লিখিত হয়। "পরন্তু তাঁহার ইংলণ্ড গমন সময়ের নৈকট্য হাওয়াতে ব্যস্ততা ও সময়ের অল্পতা প্রযুক্ত

কেবল পাণ্ডুলিপি মাত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পুনর্দৃষ্টির সাবকাশ পান নাই।” ফলে “গৌড়ীয় ভাষা ব্যাকরণে” যদিচ রচয়িতার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পত্রে পত্রে পাওয়া যায়, তবুও সাধারণ শিক্ষার্থীদের তা বিশেষ কাজে লাগে না। কারণ তা প্রথমত উপক্রমণিকা মাত্র, দ্বিতীয়ত তাঁর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দসকল, একালের বাঙ্গালীদের নিকট অপরিচিত। রাম-মোহন রায় কেবলমাত্র সত্তরখানি পাতায় বাংলা ব্যাকরণের মূল সূত্রগুলি ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন,—মিল্‌ন্ সাহেব প্রায় ছয়শ’ পাতায় বাংলা ব্যাকরণের নিয়মগুলি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। সম্ভবত রামমোহন রায়ের ব্যাকরণ মিল্‌ন্ সাহেবের হাতে কখন পড়ে নি, অথচ অনেক বিষয়ে উভয়ের সম্পূর্ণ মিল আছে।

সন্ধি এবং সমাস যে বাংলা ভাষার প্রকৃতিগত নয়—এ কথাটা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এমন কি, সংস্কৃতের অনু-করণে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নানারূপ শব্দের মধ্যে যে অবৈধ সন্ধি স্থাপন করেছিলেন, পরবর্ত্তী লেখকদের হাতে আবার তার বিচ্ছেদ ঘটেছে। রামমোহন রায় তাঁর ব্যাকরণে সন্ধির বিষয় যে কেন কিছু লেখেন নি, তার কারণ দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে “এ সকল জানিবার রীতি সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণে আছে এবং ভাষায় সেই রীতিক্রমে ওই শব্দসকল ব্যবহার্য্য হইয়াছে; অতএব সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিতি করিলে, তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরং আক্ষেপের কারণ হয়।”—তাঁহার পরবর্ত্তী বঙ্গ-বৈয়াকরণিকগণ এই কথাটি মনে রাখ্‌লে, স্কুলের ছাত্রদের কষ্টের অনেক লাঘব হত। “অনেক পদের এক পদের ন্যায় রূপ হওয়ার নাম সমাস।” ঐরূপ কথার জড়া-

পটুকি বেধে যাওয়াটা বাংলার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বাংলা ভাষায় দুটি মাত্র পদ ঐরূপ সমাসবন্ধনে আবদ্ধ হয়। গাছপাকা, কর্ণচোরা ইত্যাদি পদ, খাঁটি বাংলা সমাসের নমুনা। (এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, সংস্কৃত ভাষায় পদ মানে word, এবং বাক্য মানে sentence,—আমরা আজকাল ঐ দুটি শব্দ ঠিক উল্‌টো উল্‌টো অর্থে ব্যবহার করি। এ প্রবন্ধে আমি পদ এবং বাক্য সংস্কৃত অর্থেই ব্যবহার কর্‌ব।)

তারপর রামমোহন রায় বলেন যে "সংস্কৃত ভাষাতে স্ত্রীত্ব বোধের যে নিয়মসকল, তাহা বাংলা ভাষা ব্যাকরণে উপস্থিত করায় কেবল চিত্তের বিক্ষেপ করা হয়, অথচ সংস্কৃত না জানিলে তাহার দ্বারা বিশেষ উপকার জন্মে না। গৌড়ীয় ভাষাতে কি ক্রিয়াপদে, কি প্রতিসংজ্ঞায় (সর্ব্বনাম), কি বিশেষণ পদে, লিঙ্গ জ্ঞাপনের কোন চিহ্ন নাই।" মিল্‌ন্‌ সাহেবের মতও তাই। এই সত্যটি মনে রাখ্‌লে বাংলা ব্যাকরণ আমাদের কাছে বিভীষিকা হয়ে ওঠে না।

Milne সাহেবের বইয়েতে, কারক এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে প্রকরণ দুটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এই দুটি বিষয়ের আলোচনাতে বাংলাভাষা সম্বন্ধে অপূর্ব্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন। আমি বাঙ্গালী পাঠকমাত্রকেই মনোযোগ সহকারে এই দুটি প্রকরণ পড়্‌তে অনুরোধ করি। রামমোহন রায়ের সঙ্গে মিল্‌ন্‌ সাহেবের কারক এবং ক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ লক্ষিত হয়। মিল্‌ন্‌ সাহেব সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাংলা ভাষাতেও সাতটি কারকের অস্তিত্ব মানেন। কিন্তু রামমোহন রায় কেবলমাত্র কর্ত্তা, কর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ, এই চারিটি কারকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। অন্য তিনটিতে শব্দের কোনও রূপান্তর হয় না

বলে' তিনি সেগুলিকে কারকশ্রেণীভুক্ত করেন নি। বাংলায় সম্প্রদান, কর্ম্মের রূপ ধারণ করে বলে', তিনি তাকে গৌণ কর্ম্ম স্বরূপ মনে করেন। করণ এবং অপাদান,—"দ্বারা", "দিয়া", "কর্ত্তৃক", এবং "হইতে", "থেকে", প্রভৃতি অপর একটি শব্দের সাহায্যে সিদ্ধ হয় বলে', তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সে-গুলিকে বিভিন্ন কারক হিসেবে দেখেন না। আমার বিবেচনায় রামমোহন রায়ের মত অনুসারে, পদগঠনের বিভিন্নতার দরুণ কর্ম্ম, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ যে এক শ্রেণীর কারক, ও করণ, সম্প্রদান এবং অপাদান যে আর এক শ্রেণীর কারক, এ বিষয়ে বৈয়াকরণিকদের লক্ষ্য থাকা দরকার।

মিল্‌ন্ সাহেবের মতে—

Bengalee verbs may be divided into three classes, according to their infinitive endings.

		Infinitive	Radical
।	আ	করা	কর
॥	আন	দাঁড়ান	দাঁড়া
	ওয়া	যাওয়া	যা

কিন্তু রামমোহন রায়ের মত স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—

"ক্রিয়াবাচক শব্দ, যাহার সহিত প্রত্যয়ের সংযোগ দ্বারা নানাবিধ পদ সিদ্ধ হয়, তাহাকে তিন প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে :—অর্থাৎ "অন" যাহার অন্তে থাকে, যথা "মারণ"। "ওন" যাহার অন্তে থাকে সে দ্বিতীয় প্রকার হয়, যথা—"যাওন"। আর "আন" অন্তে যাহার হয় সে তৃতীয় প্রকার, যেমন—"বেড়ান"।

আমি রামমোহন রায়ের কৃত শ্রেণী বিভাগের পক্ষপাতী। কারণ যদিচ এই দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তথাপি একটি বিশেষ কারণে রামমোহন রায়ের মতই সমীচীন বলে' মনে হয়। ক্রিয়াকে ণিজন্ত করবার নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই দেখতে পাওয়া যায় যে, রামমোহন রায় কৃত শ্রেণীবিভাগই সঙ্গত।

মিল্‌ন্ সাহেব বলেন যে—

"Causal verbs are formed by adding ন after the final আ of the first and third classes, e.g. করান to cause to do, বসান to cause to sit, খাওয়ান to cause to eat.

Causal verbs of the second class are formed by adding another verb.

দাঁড়ান to stand ; দাঁড় করান to cause to stand. There is also a double causal form with the verb দেওয়া to give, খাইয়ে দেওয়া &c.

রামমোহন রায়ের মতে—

ক্রিয়াকে ণিজন্ত অর্থাৎ প্রেরণার্থে প্রয়োগ করিবার প্রকার এই যে,—প্রথম প্রকার ক্রিয়ার নকারের পূর্ব্বে "আ" দিতে হয়, যেমন "দেখন" হইতে "দেখান", করণ হইতে "করান" ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার ক্রিয়াতে নকারের পূর্ব্বে "য়া" দিতে হয়— যেমন "খাওয়ান।"

আর তৃতীয় প্রকার ক্রিয়া ণিজন্ত হয় না। ক্রিয়ার ণিজন্ত করতে অপর একটি ব্যঞ্জনবর্ণ বাইরে থেকে টেনে আনবার

কোনও আবশ্যক নেই—স্বরবর্ণের গুণবৃদ্ধির দ্বারাই তা সিদ্ধ হয়। এই কারণে রামমোহন রায়ের মতই গ্রাহ্য।

একটি ছোট প্রবন্ধে মিল্‌ন্ সাহেবের ব্যাকরণের আদ্যোপান্ত সমালোচনা করা সম্ভব নয়, এবং আমার মত অশাস্ত্রীয় লোকের পক্ষে সেরূপ চেষ্টা করাটাও অনধিকার চর্চ্চা। তবে একথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, এই ব্যাকরণ বাঙ্গলা ভাষার একমাত্র পূর্ণাবয়ব ব্যাকরণ। এ বইয়ের প্রতি অধ্যায়ে লেখকের অসাধারণ পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও বিদেশী লোকের দ্বারা যে বাংলা ভাষার এরূপ ব্যাকরণ লেখা হতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। মিল্‌ন্ সাহেবের বইয়ের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এক হিসাবে এখানিকে বাংলা ভাষার Dictionary of Idioms বলা যেতে পারে। বাঙ্গালী মাত্রেরই এ জ্ঞানটুকু আছে যে, যতক্ষণ আমরা ইংরাজি ভাষার idiom না আয়ত্ত কর্‌তে পারি, ততক্ষণ ইংরাজি বল্‌তে শিখি নে; এবং যতক্ষণ আমরা idiomatic ইংরাজি লিখ্‌তে না পারি, ততক্ষণ ইংরাজি লিখ্‌তে শিখিনে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের আর একটি বিশ্বাস আছে যে, যতক্ষণ আমরা বাঙ্গলা ভাষার idiom না ভুলে যাই, ততক্ষণ বঙ্গভাষা আমাদের আয়ত্ত হয় না, এবং idiomatic বাংলা লিখ্‌তে না ভুলে গেলে আমরা লেখক বলে অহঙ্কার কর্‌বার অধিকারী হই নে। কিন্তু যে দুচার জন লোক আজও idiomatic বাংলাকেই বাংলাভাষা বলে জানেন, তাঁদের কাছে মিল্‌ন্ সাহেবের এই বইটি অতি উপাদেয় গ্রন্থ।

ব্যাকরণ লেখা শক্ত হলেও, তা পড়া আরও শক্ত। ব্যাকরণের নাম শুন্‌লে যে লোকে আঁৎকে ওঠে—তার কারণ

সচরাচর যেরূপ ফর্দ্দওয়ারি ভাবে এ শাস্ত্র লেখা হয়ে থাকে, তার চাইতে নীরস লেখা সাহিত্যে পাওয়া দুষ্কর। মিল্‌ন্‌ সাহেবের বইয়ের এই একটি প্রধান গুণ যে, বইখানি আগাগোড়া সরস। উদাহরণ সংগ্রহের চাতুরির গুণে, এই ছয়শ' পাতার বইও এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়।

লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বিনয় করে বলেছেন যে, বিদেশী ভাষার ব্যাকরণ লিখ্‌তে গিয়ে তিনি নিশ্চয়ই অনেক ভুলভ্রান্তি করেছেন। দুটি চারটি ভুলভ্রান্তি যে এখানে ওখানে দেখা যায় না, এমন নয়; কিন্তু সে সব ভুল এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। তবে গ্রন্থকার একটি মহাভুল করেছেন—সে হচ্ছে গ্রন্থের মূল্য সম্বন্ধে। একে ব্যাকরণ, তা আবার যদি দশ টাকা দাম দিয়ে কিন্‌তে হয়, তাহলে এ বই সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ভোগে কখনও আস্‌বে না। মিল্‌ন্‌ সাহেব বাংলাভাষা যেরূপ জানেন, বাংলা ভাষার বাজার দর যদি তার সিকির সিকিও জান্‌তেন, তাহ'লে ঐ দামের অঙ্কের শেষ শূন্যটা মুছে দিতেন।

শ্রাবণ, ১৩২০ সন।

সনেট কেন চতুর্দ্দশপদী ?

—ঃ০ঃ—

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন গত মাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় "সনেট-পঞ্চাশৎ" নামক পুস্তিকার সমালোচনাসূত্রে, সনেটের আকৃতি এবং প্রকৃতির বিশেষ পরিচয় দিয়ে এই মত প্রকাশ করেছেন যে—"খুব সম্ভব, কলাপ্রবীণ ইতালীয় ও অপরদেশীয় কবিরা পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, পূর্ণরসাভিব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দশপদই সমীচীন, এবং তাহাই সাহিত্য-সংসারে চলিয়া আসিয়াছে।"

নানা যুগে নানা দেশে নানা কবির হাতে ফিরেও সনেট যে নিজের আকৃতি ও রূপ বজায় রাখ্‌তে পেরেছে, তার থেকে এই মাত্র প্রমাণ হয় যে, সনেটের ছাঁচে নানারূপ ভাবের মূর্ত্তি ঢালাই করা চলে, এবং সে ছাঁচ এতই টেঁকসই যে, বড় বড় কবিদেরও ভাবের জোরে সেটি ভেঙ্গেচুরে যায় নি। কিন্তু সনেট যে কেন চতুর্দ্দশপদ গ্রহণ করে' জন্মলাভ করলে, সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। অথচ অস্বীকার করা যায় না যে, বারো কিম্বা ষোলো না হয়ে, সনেটের পদসংখ্যা যে কেন চৌদ্দ হ'ল, তা জানবার ইচ্ছে মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কি কারণে সনেট চতুর্দ্দশপদী হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমার একটি মত আছে, এবং সে মত কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ; তার স্বপক্ষে কোনরূপ অকাট্য প্রমাণ দিতে আমি অপারগ। স্বদেশী কিম্বা বিদেশী কোনরূপ ছন্দশাস্ত্রের সঙ্গে

আমার পরিচয় নেই,—পিঙ্গল কিম্বা গৌর কোন আচার্য্যের পদসেবা আমি কখনও করিনি! সুতরাং আমার আবিষ্কৃত সনেটের "চতুর্দ্দশীতত্ত্ব" শাস্ত্রীয় কিম্বা অশাস্ত্রীয়, তা শুধু বিশেষজ্ঞেরাই বল্‌তে পার্‌বেন।

চৌদ্দ কেন?—এ প্রশ্ন সনেটের মত বাংলা পয়ার সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। এর একটি সমস্যার মীমাংসা কর্‌তে পারলে অপরটির মীমাংসার পথে আমরা অনেকটা অগ্রসর হতে পার্‌ব।

আমার বিশ্বাস, বাংলা পয়ারের প্রতি চরণে অক্ষরের সংখ্যা চতুর্দ্দশ হবার একমাত্র কারণ এই যে, বাংলা ভাষায় প্রচলিত অধিকাংশ শব্দ হয় তিন অক্ষরের নয় চার অক্ষরের। পাঁচ ছয় অক্ষরের শব্দ প্রায়ই হয় সংস্কৃত, নয় বিদেশী। সুতরাং সাত অক্ষরের কমে সকল সময়ে দুটি শব্দের একত্র সমাবেশের সুবিধে হয় না। সেই সাতকে দ্বিগুণ করে' নিলেই শ্লোকের প্রতি চরণ যথেষ্ট প্রশস্ত হয়, এবং অধিকাংশ প্রচলিত শব্দই ঐ চৌদ্দ অক্ষরের মধ্যেই খাপ্ খেয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের ভাষায় দু' অক্ষরের শব্দের সংখ্যাও কিছু কম নয়। কিন্তু সে সকল শব্দকে চার অক্ষরের শব্দের সামিল ধরে নেওয়া যেতে পারে—যেহেতু দুই স্বভাবতই চারের অন্তর্ভূত।

এই চৌদ্দ অক্ষর থাক্‌বার দরুণই বাংলা ভাষায় কবিতা লেখবার পক্ষে পয়ারই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। একটানা লম্বা কিছু লিখ্‌তে হলে, অর্থাৎ যাতে অনেক কথা বল্‌তে হবে এমন কোন রচনা কর্‌তে গেলে, বাঙ্গালী কবিদের পয়ারের আশ্রয় অবলম্বন ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কৃত্তিবাস থেকে আরম্ভ করে' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত, বাংলার কাব্যনাটক-রচয়িতা

মাত্রই, পূর্ব্বোক্ত কারণে, অসংখ্য পয়ার লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছেন, এবং চিরদিনের জন্য বাঙ্গালীর প্রতিভা ঐ পয়ারের চরণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

পয়ারে চতুর্দ্দশ অক্ষরের মত, সনেটে চতুর্দ্দশ পদের একত্র সঙ্ঘটন, আমার বিশ্বাস, অনেকটা একই রকমের যোগাযোগে সিদ্ধ হয়েছে।

বোধহয় সকলেই অবগত আছেন যে, জীবজগৎ এবং কাব্য-জগতের ক্রমোন্নতির নিয়ম পরস্পরবিরুদ্ধ। জীব উন্নতির সোপানে ওঠ্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই তার ক্রমিক পদলোপ হয়, কিন্তু কবিতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদবৃদ্ধি হয়। পদ্য দুটি চরণ নিয়েই জন্মগ্রহণ করে; দ্বিপদীই হচ্চে সকল দেশে সকল ভাষার আদিচ্ছন্দ। কলিযুগের ধর্ম্মের মত, অর্থাৎ বকের মত, কবিতা একপায়ে দাঁড়াতে পারে না।

এই দ্বিপদী হতেই কাব্যজগতের উন্নতির দ্বিতীয় স্তরে ত্রিপদীর আবির্ভাব হয়, এবং ত্রিপদী কালক্রমে চতুষ্পদীতে পরিণত হয়। কবিতার পদবৃদ্ধির এই শেষ সীমা। কেন?— সে কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। আমরা যখন মিল-প্রধান সনেটের গঠন-রহস্য উদ্‌ঘাটন কর্‌তে বসেছি, তখন মিত্রাক্ষরযুক্ত দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর আকৃতির আলোচনা করাটাই আমাদের পক্ষে সঙ্গত হবে। অমিত্রাক্ষর কবিতা কামচারী, চরণের সংখ্যা-বিশেষের উপর তার কোন নির্ভর নেই, তাই কোনরূপ অঙ্কের ভিতর তাকে আবদ্ধ রাখ্‌বার যো নেই।

দ্বিপদীর চরণ দুটি পাশাপাশি মিলে যায়। ত্রিপদীর প্রথম দুটি চরণ দ্বিপদীর মত পাশাপাশি মেলে, তৃতীয় চরণটি অপর একটি চরণের অভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, এবং অপর একটি

ত্রিপদীর সান্নিধ্যলাভ করলে তার তৃতীয় চরণের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরাজী এবং ফরাসী ভাষার ত্রিপদীর আকৃতি ও প্রকৃতি এইরূপ; কিন্তু ইতালীয় ত্রিপদীর (Tezza Rima) গঠন স্বতন্ত্র।

ইতালীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণেব সহিত তৃতীয় চরণের মিল হয়, এবং দ্বিতীয় চরণ মিলের জন্য পরবর্ত্তী ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে। ইতালীর ত্রিপদী তিন চরণেই সম্পূর্ণ। ভাব এবং অর্থ বিষয়ে একটির সহিত অপরটি পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বাপরযোগ কেবল মিল-সূত্রে রক্ষিত হয়। একটি কবিতার ভিতর, তা যতই বড় হোক্ না কেন, সে যোগের কোথাও বিচ্ছেদ নেই। প্রথম হতে শেষ পর্য্যন্ত, একটি কবিতার অন্তর্ভূত ত্রিপদীগুলি এই মিলন-সূত্রে গ্রথিত, এবং ইস্ক্রুর (Screw) পাকের ন্যায় পরস্পরযুক্ত। নিম্নে Robert Browning-রচিত, "The Statue and the Bust" নামক কবিতা হতে, ইতালীয় ত্রিপদীর নমুনাস্বরূপ ছয়টি চরণ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।* পাঠক দেখতে পাবেন যে, প্রথম ত্রিপদীর মধ্যম চরণটি মিলের জন্য দ্বিতীয় ত্রিপদীর প্রথম চরণের অপেক্ষা রাখে।

অর্থাৎ ত্রিপদীর বিশেষত্ব হচ্ছে, দুটি চরণ পাশাপাশি না মিলে, মধ্যস্থ একটি কিম্বা দুটি চরণ ডিঙ্গিয়ে মেলে। ত্রিপদীর

---

* There's a palace in Florence, the world knows well,
And a statue watches it from the square,
And this story of both do our townsmen tell.

Ages ago, a lady there,
At the farthest window facing the East,
Asked, "Who rides by with the royal air?"

এই মিলের ক্ষণিক বিচ্ছেদ রক্ষা করে', চারটি চরণের মধ্যে দু'জোড়া মিলকে স্থান দেবার ইচ্ছে থেকেই চতুষ্পদীর জন্ম। দুটি দ্বিপদী পাশাপাশি বসিয়ে দিলে চতুষ্পদী হয় না। চতুষ্পদীতে প্রথম চরণ হয় তৃতীয় চরণের সঙ্গে, নয় চতুর্থ চরণের সঙ্গে মেলে, আর দ্বিতীয় চরণ হয় তৃতীয়, নয় চতুর্থের সঙ্গে মেলে। এক কথায় চতুষ্পদীর আকৃতি দ্বিপদীর এবং প্রকৃতি ত্রিপদীর।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদীই পদ্যের মূল উপাদান। বাদবাকী যত প্রকার পদ্যের আকার দেখতে পাওয়া যায়, সে সবই দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদীকে হয় ভাঙ্গচুর করে', নয় যোড়াতাড়া দিয়ে গড়া ;—এ সত্য প্রমাণ করবার জন্য বোধহয় উদাহরণ দেবার আবশ্যক নেই।

কবিতার পূর্ব্ববর্ণিত ত্রিমূর্ত্তির সমন্বয়ে একমূর্ত্তি গড়বার ইচ্ছে থেকেই সনেটের সৃষ্টি—সেই কারণেই সনেট আকৃতিতে "সমগ্রতা, একাগ্রতা" এবং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ত্রিপদীর সঙ্গে চতুষ্পদীর যোগ করলে সপ্তপদ পাওয়া যায়, এবং সেই সপ্তপদকে দ্বিগুণিত করে নেওয়াতেই সনেট চতুর্দ্দশপদ লাভ করেছে। এই চতুর্দ্দশ পদের ভিতর দ্বিপদী ত্রিপদী এবং চতুষ্পদী তিনটিরই স্থান আছে, এবং তিনটিই সমান খাপ খেয়ে যায়।

পেত্রার্কার সনেটের অষ্টক পরস্পর মিলিত এবং একাঙ্গীভূত দুটি যমজ চতুষ্পদীর সমষ্টি; এবং প্রতি চতুষ্পদীর অভ্যন্তরে একটি করে' আস্ত দ্বিপদী বিদ্যমান। ষষ্ঠকও ঐরূপ দুটি ত্রিপদীর সমষ্টি। ফরাসী সনেটও ঐ একই নিয়মে গঠিত, উভয়ের ভিতর পার্থক্য শুধু ষষ্ঠকের মিলের বিশিষ্টতায়।

ফরাসী ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্র-ব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিলন সাধন করা স্বাভাবিক নয়; সেই জন্য ফরাসী সনেটে ষষ্ঠকের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।

সনেট ত্রিপদী ও চতুষ্পদীর যোগে ও গুণে নিষ্পন্ন হয়েছে বলে' চতুর্দ্দশপদী হতে বাধ্য।

ভাদ্র, ১৩২০ সন।

ব্রাহ্মণ মহাসভা।

—:o:—

কালীঘাটে সম্প্রতি বাংলার মহাব্রাহ্মণমণ্ডলী যে মহাগর্জ্জন করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। কেননা সে গর্জ্জনের অনুরূপ বর্ষণ হবে না; কিন্তু লজ্জিত হবার কারণ আছে, কেননা শাস্ত্রে বলে—বহু আরম্ভে লঘু ক্রিয়া, অজা-যুদ্ধেই শোভা পায়। মানুষে ওরূপ ব্যবহার করলে, মানুষের তাতে হাসিও পায়—কান্নাও পায়।

আমি বিলেত ফেরৎ, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সমাজের নাম-কাটা সেপাই; কিন্তু নাম-কাটা হলেও সেপাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কালীঘাটে যে প্রহসনের অভিনয় করেছেন, তার জন্য লজ্জিত হবার আমার অধিকার আছে। শুধু তাই নয়, আমি ইংরাজি-শিক্ষিত এবং বাঙ্গালী, এবং এই দুই কারণেই এই বিনা-মেঘে গর্জ্জনরূপ ব্যাপারটিতে আমি ভীত না হই, স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

(২)

আমার একটি বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান কায়স্থ বন্ধু আমার প্রতি কটাক্ষ করে এই কথা বলেন যে, ব্রাহ্মণ যথেষ্ট ইংরাজি শিক্ষা লাভ করলেও, বিলেত গেলেও, তার ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার এবং তজ্জনিত মানসিক সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করতে পারে না।

আমার অপরাধ এই যে, ব্রহ্মবিদ্যা যে ক্ষত্রিয়ের আবিষ্কার এবং কায়স্থ যে ক্ষত্রিয়, এ সত্য স্বীকার করতে আমি ইতস্ততঃ করি। আমার বিশ্বাস—সে আমি ব্রাহ্মণ বলে নয়, আইন ব্যবসায়ী বলে। কিসে কি প্রমাণ হয়, আর না হয়, সে বিষয়ে আমার কতকটা জ্ঞান আছে। সে যাই হোক, পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ যে কতক পরিমাণে সত্য, এ কথা কোনও ব্রাহ্মণ-সন্তান পৈতা-ছুঁয়ে অস্বীকার করতে পারবেন না। জাত্যভিমান আমাদের মনের কোণে, অন্ধকারে লুকিয়ে থাকে এবং সময়ে অসময়ে বের হয়ে পড়ে। কুলের গৌরব করাটা এদেশে যদি কারও পক্ষে মার্জ্জনীয় হয় ত সে ব্রাহ্মণের পক্ষে। আমি জানি যে, আমরা যে মুনিঋষিদের বংশধর এ কথা আজকাল নির্ভয়ে বলা চলে না। কেননা তাঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন কিম্বা ক্ষত্রিয় ছিলেন তাই নিয়ে এমন একটি তর্ক উত্থাপিত করা হয়েছে, যার মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। কিন্তু আমাদের জাতীয়গৌরব প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে এ মামলার একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করবার দরকার নেই। উপনিষদ, ক্ষত্রিয়ের পৈতৃক সম্পত্তি হলেও, ব্রাহ্মণে তা এতকাল ধরে ভোগদখল করে আসছেন যে সে দখলী সত্ত্ব নষ্ট করবার জন্য কোনো পুরাণো দলিল দস্তাবেজ আর সমাজের আদালতে গ্রাহ্য হবে না। বহুকাল ধরে যে যোগসূত্র হিন্দুর অতীতকে তার বর্ত্তমানের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে—সে হচ্ছে যজ্ঞসূত্র। দূর অতীতের কথাও ছেড়ে দিলে, এ সত্য কারও অস্বীকার করবার যো নেই যে, ভারতবর্ষের সাতশ বৎসর ব্যাপী ঘোর অমানিশার মধ্যে যে জাতি বিদ্যার ঘীয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, অশেষ দুঃখ দৈন্য নৈরাশ্যের মধ্যে যে জাতি সাগ্নিকের অগ্নির মত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য সযত্নে রক্ষা করে এসেছেন, সে

জাতির নিকট ভারতবর্ষ চিরঋণী হয়ে থাকবে। হিন্দুজাতির মন নামক পদার্থটি যে এতদিন রক্ষিত হয়েছে, সে হচ্ছে ব্রাহ্মণের, বিশেষত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের গুণে। সুতরাং হিন্দু-মাত্রেরই নিকট ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা প্রামাণ্য না হলেও মান্য। সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যে আজ অনাবশ্যকে নব্যশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট নিজেদের উপহাসাস্পদ করেছেন, এতে আমার জাত্যভিমানে আঘাত লাগে। শিষ্টের পালন ও দুষ্কৃতের শাসনের জন্য কালীঘাটে সভা আকারে অবতীর্ণ হয়ে নানারূপ লীলাখেলা কর্‌বার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের এটি স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হলে, ভগবান আর যে রূপ ধারণ করেই অবতীর্ণ হোন না কেন, ইতিপূর্ব্বে কখনও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ হন নি। এ ভুল তাঁরা কখনও কর্‌তেন না, যদি না এ ব্যাপারে জনকয়েক ইংরাজি-শিক্ষিত বিষয়ী ব্রাহ্মণের প্ররোচনা এবং পৃষ্ঠপোষকতা থাকত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অবশ্য জানেন যে তাঁরা সমাজের শাসক নন, শাস্ত্রী;—তাঁরা ধর্ম্মের রক্ষক নন, ধর্ম্ম-শাস্ত্রের রক্ষক। এক কথায় তাঁরা শুধু সমাজের Books of Reference, বড় জোর Guide-Book। ধর্ম্মের উচ্চ আদালত গড়ে' তাতে ফুলবেঞ্চ বসানো এঁদের পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র; কারণ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা যা খুসি তাই ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু সে ডিক্রী সমাজের উপর জারি করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। উদাহরণস্বরূপে দেখান যেতে পারে যে, সমুদ্রযাত্রারূপ অপরাধের জন্য, আমার জ্ঞাতিকুটুম্বেরা যখন আমাকে সমাজচ্যুত করেন, তখন যদি আমি কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় করে, নবদ্বীপ হতে, সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নয়, এই মর্ম্মে একটি পাঁতি নিয়ে গিয়ে তাঁদের সুমুখে উপস্থিত

হতুম, তা হলে তাঁরা সে বিধান সম্পূর্ণ উপেক্ষা কর্‌তেন। বিষয়ী ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের জীবনযাত্রা, বিষয়ী ব্রাহ্মণের দক্ষিণার উপরে নির্ভর করে; কারণ পণ্ডিতেরা গৃহস্থ; অথচ বিষয়ী নন্‌। আমি ইংরাজি-শিক্ষিত বলে, এ ব্যাপারে লজ্জিত, কেননা আমাদের একদলের প্রলোভনে পড়েই পণ্ডিত-সম্প্রদায় এই সব অযথা তর্জ্জন গর্জ্জন করেছেন।

ইংরাজি-শিক্ষিত ধর্ম্ম-রক্ষকেরা নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, চরিত্র এবং অবস্থা অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কিন্তু মোটামুটি ধরতে গেলে এঁদেরও চার বর্ণে বিভক্ত করা যায়।

যাঁরা হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন তাঁরা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ। শুন্‌তে পাই হার্বার্ট স্পেন্‌সর এঁদের গুরু। এঁরা প্রচার করেন যে, মনোজগৎ জড়জগতের অধীন, জড়জগৎ মনোজগতের নয়; অতএব যে সমাজ যত জড় সে সমাজ তত আধ্যাত্মিক। সুতরাং জড় বস্তুর নিয়মে এঁরা সমাজকে বাঁধতে চান, মানুষকে জড়ে পরিণত কর্‌তে চান। সাহিত্যে এই ব্রাহ্মণ-পাচকের দল, সংস্কৃত শাস্ত্র এবং ইংরাজি-বিজ্ঞান একত্র ঘেঁটে নিত্য খিচুড়ি পাকান, তাতে না আছে নুন, না আছে ঘী, না আছে মশলা। সে খিচুড়ি গলাধঃকরণ করা, আর না করা, আমাদের স্বেচ্ছাধীন। এঁদের পাণ্ডিত্যের উপদ্রব, বাঙ্গালীর মনের উপর, সমাজের উপর নয়। এঁরা যে কথা নিজে বিশ্বাস করেন না তাই অপরকে বিশ্বাস করাতে চান—অবশ্য লোকহিতের জন্য!

আর একদল আছেন, হিঁদুয়ানি করা যাদের ব্যবসা। এঁরা হচ্ছেন বৈশ্য। এ শ্রেণীর লোক সমাজে চিরকাল ছিল এবং

থাক্‌বে। এঁরা সকলের নিকটেই সুপরিচিত, সুতরাং এঁদের বিষয় বেশি কিছু বলবার নেই। তবে কালের গুণে এঁদের ব্যবসা নতুন আকার ধারণ করেছে। এঁরা হিঁদুয়ানির লিমিটেড কোম্পানী করে বাজারে ধর্ম্মের সেয়ার বেচেন—অবশ্য গো ব্রাহ্মণের হিতের জন্য!

আর একদল আছেন, যাঁদের পক্ষে সমাজের বিধি-নিষিধের দাসত্ব করা স্বাভাবিক—এঁরা শূদ্র। এঁরা একটা কিছু না মেনে চল্‌লে, চল্‌তে পারেন না; এঁরা ভালবাসেন পরের দ্বারা যন্ত্রের মত চালিত হওয়া। এঁরা তর্কযুক্তিকে ভয় পান। এঁরা আদেশের বশবর্ত্তী বলে কারও উপদেশ কানে তোলেন না। এঁরা হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করেন, নির্ব্বিচারে তার নিয়ম পালন করে'। এঁরা নিজে শাসিত হতে চান্‌, পরকে শাসন করতে চান না।

আর একদল হচ্ছে নব্য-ক্ষত্রিয়; এঁরাই হচ্ছেন সকল নাটের গুরু। এঁরা শূদ্রের ন্যায় স্বর্গে যাবার সস্তা টিকিট স্বরূপে টিকি শিরোধার্য্য করেন না—করেন ধর্ম্মের ধ্বজা স্বরূপে, এবং তারই আস্ফালন করেন্‌ বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য। এঁদের বিশ্বাস, এঁদের মস্তকের শিখা চাণক্যের শিখা—যাতে গিঁট বাঁধলেই আমাদের মত প্রকাশ্য অনাচারীদের বংশ সবংশে উৎসন্ন হয়ে, অনাচারীদের গুপ্ত বংশ সমাজের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হবে। সে যাই হোক্‌, এঁদের ধর্ম্ম হচ্ছে, শুধু ভ্রাতৃ-বিরোধের সৃষ্টি করা। ধর্ম্মক্ষেত্রে একটা কুরুক্ষেত্তর না বাধিয়ে এঁরা স্থির থাক্‌তে পারেন না। অথচ এঁদের নব্য-তান্ত্রিকদের শাসন করবার ইচ্ছা যদ্রূপ, ক্ষমতা তদ্রূপ নেই। যাঁরা জুতো পায়ে দিয়ে জল খান, সেই মহাপাতকীদের সমুচিত শাস্তি দেবার

জন্য বাঙ্গালী-সমাজের এই ধনুর্দ্ধরেরা সুমুখে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-রূপ শিখণ্ডি খাড়া করে তার পশ্চাৎ থেকে যে বাণ নিক্ষেপ করেছেন তাতে সে সম্প্রদায় যে আজ জুতো পায়ে দিয়ে শরশয্যায় শয়ান হয়ে, "জল" "জল" বলে চীৎকার কর্‌ছেন তার ত কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রমাণ শুধু এরই পাওয়া যায় যে, এদেশে আজও এমন এক শ্রেণীর ভদ্র সন্তান আছেন, যাঁরা রীতিকে যতই নিরর্থক হোক নীতির অপেক্ষা, মিথ্যাকে যতই স্পষ্ট হোক সত্যের অপেক্ষা, আচারকে যতই কদর্য্য হোক সততার অপেক্ষা উচ্চ আসন দিতে লজ্জা বোধ করেন না। এঁরা সভা করে' এই মতের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে চান যে, সামাজিক কপটতাই হচ্ছে সামাজিক ধর্ম্ম, অতএব আচরনীয়। অবশ্য লোকে বলে যে "ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না" কিন্তু ও কাজ কর্‌লে শিবের বাবা টের না পেতে পারেন্ কিন্তু শিব যে পান না, এ কথা কোন শাস্ত্রেই বলে না! যে যুগে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের সকল চিন্তা, সকল যত্ন হচ্ছে জাতি গঠনের দিকে, সেই যুগের সেই সমাজের জন কয়েকের চেষ্টা যে শুধু জাত মারবার দিকে, এর চাইতে ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে! অবশ্য এঁদের ছোঁড়া সংস্কৃত অক্ষরাঙ্কিত কাগজের গুলির ঘায়ে, কেউ আর বাসায় গিয়ে মরে থাক্‌বেন না! কিন্তু সেই কারণেই ব্যাপারটি নিতান্ত হাস্যকর। তাঁদের হাতেই হিন্দু-সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র হিন্দু-সমাজকে একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার করে তোলা। আর যাঁরা ছোঁয়ানাড়ার বিচার নিয়েই আছেন, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে চুলো পৃথক করে নেওয়া, তাঁদের হাতে পড়্‌লে সমাজ চুলোয়ই যাবে।

(৩)

ব্রাহ্মণ মহাসভার এই উচ্চবাচ্যের দরুণ আমি বিশেষ লজ্জিত, কারণ আমি বাঙ্গালী। এই সব ছেলেখেলা আর যারই পক্ষে শোভা পাক না কেন, বাঙ্গালীর পক্ষে শোভা পায় না। কারণ এ কথা সর্ব্ববাদী-সম্মত যে, বাঙ্গালী ভারতবর্ষে নূতন প্রাণ এনেছে, সমগ্র ভারতবাসীকে নতুন সুর ধরিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের কাব্য, ইউরোপের দর্শন, ইউরোপের বিজ্ঞান, বাঙ্গালীর মনে অইলক্লথের উপর জলের মত গড়িয়ে যায় নি; অল্প বিস্তর সে মনকে আর্দ্র ও সরস করে তুলেছে। অপরদিকে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন সম্পূর্ণ অভিভূতও হয়ে পড়ে নি। ইংরাজি সভ্যতার দুর্ব্বার শক্তি আমরা কতক পরিমাণে আয়ত্ব কর্‌তে পেরেছি। আমরা কতক বাধ্য হয়ে, কতক স্বচ্ছন্দ চিত্তে আমাদের মনকে এই নবাগত সভ্যতার অধীন করেছি। এর কারণ, এই নব সভ্যতার শিক্ষা গ্রহণ কর্‌বার জন্য আমাদের মন প্রস্তুত ছিল।

বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটি মনোভাবের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সে হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এ তিনেরই বীজমন্ত্র চৈতন্য বাঙ্গলীর কানে দিয়ে গেছেন। তিনি আপামর চণ্ডালকে কোল দিয়ে সাম্যের প্রতি, প্রেম ভক্তির উদ্বোধন করে মৈত্রীর প্রতি, এবং লোকাচারের অধীনতা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে স্বাধীনতার প্রতি বাঙ্গালীর মনকে অনুকুল করে গেছেন। তিনি যে ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন করেন নি তার প্রমাণ, বাঙ্গলার অধিকাংশ লোক আজ চৈতন্য-পন্থী বৈষ্ণব এবং এই নতুন পন্থার প্রদর্শক তাঁদের কাছে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলে গ্রাহ্য। যে স্বল্প সংখ্যক লোকের মতে তিনি

"ন চ পূর্ণ নচাংশ চ" তাঁদেরও যে চৈতন্য চেতন করে তোলেন নি—এ কথাও বলা চলে না। চৈতন্য কখনও ধর্ম্ম-শাস্ত্রের দোহাই দেনও নি, মানেনও নি। এর জন্য অবশ্য তাঁর সমসাময়িক শাস্ত্রব্যবসায়ীরা তাঁকে বিধিমত জ্বালাতন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এমন কি ভগবদ্ভক্তিতে মৃগী বলে, তাঁরা শচীমাতাকে, ওঝা ডাকিয়ে মহাপ্রভুকে ঝাড়াফুকো করবার, ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য যে ভাবের বন্যা এনেছিলেন তাতে সমগ্র দেশ ভেসে গেছে ;—শাস্ত্রের বাঁধ তাকে আট্‌কে রাখ্‌তে পারে নি। ভারতবর্ষে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে 'যুগধর্ম্ম' বলে যে একটি জিনিষ আছে সে কথা স্বজাতিকে বুঝিয়ে দেন। এই "যুগধর্ম্ম" অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। শাস্ত্রের ধর্ম্ম হচ্ছে অতীতের "যুগধর্ম্ম" ; সুতরাং বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হতে পারে না। আমরা বাংলা দেশের নব্য-তান্ত্রিকেরা বর্ত্তমানের "যুগধর্ম্ম" অনুসারেই জীবন গঠন করবার চেষ্টা করছি। সে জীবন শাস্ত্রের দ্বারা কেউ সম্পূর্ণ শাসিত করতে পারবে না।

যদি কেউ বলেন যে, স্বয়ং চৈতন্যও যখন এ সমাজ ভেঙ্গে নতুন সমাজ গড়্‌তে পারেন নি, তখন তোমরা কি ভরসায় হিন্দু সমাজকে ভেঙ্গে গড়্‌তে চাও ? ও চেষ্টার ফলে বড় জোর তোমরা একটি নূতন ভেকধারীর দল গড়্‌বে। এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, কেবল মাত্র মনের জোরে সমাজের সম্পূর্ণ বদল করা যায় না,—যদি না সামাজিক অবস্থা সেই মনের সহায় হয়। চৈতন্যের সময় এমন কোনও বাহ্য ঘটনা ঘটে নি, যাতে করে সমাজকে পরিবর্ত্তিত হতে বাধ্য করতে পারত। তখনকার সমাজের গায়ে কর্ম্ম-জীবনের প্রবল ধাক্কা লাগে নি।

কিন্তু আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। একদিকে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের মনের বদল করেছে, অপর দিকে ইংরাজী শাসন আমাদের কর্ম্মজীবনে অভূতপূর্ব্ব নূতনত্ব দিচ্ছে।

আমাদের কর্ম্মজীবনের সঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কোনই যোগ নেই। ওকালতি, জজিয়তি, ডাক্তারি, মাষ্টারি, ইঞ্জিনিয়ারি, কেরণিগিরিতে বর্ণভেদ নেই, আশ্রমভেদ নেই। বিদ্যালয়ে ও কর্ম্মক্ষেত্রে সকলে সমান,—সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ ব্যক্তিগত—জাতিগত নয়। সে প্রভেদ কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে—জন্মের উপরে নয়। সুতরাং জাতিভেদ এখন সমাজে নেই—আছে শুধু ঘরে। তারপর তুমি চাও, আর না চাও, কর্ম্মজীবনের বাধাস্বরূপ অশনবসনের সামাজিক নিয়ম, নিষ্কর্ম্মা ছাড়া অপর সকলেই লঙ্ঘন কর্‌তে বাধ্য। সেই কারণে বাংলা দেশের যত নিষ্কর্ম্মার দলই, অর্থাৎ, জমিদার ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দলই খাদ্যাখাদ্যের বিচাররূপ অকিঞ্চিৎকর বিষয় নিয়ে বৃথা কালক্ষেপ করতে পারেন। সুতরাং শুধু জ্ঞানে নয়, কর্ম্মেও—এই নবযুগ আমাদের সমাজ-শাসনের বহির্ভূত করে স্বাধীন করে দিচ্ছে। যে জ্ঞানের ও যে কর্ম্মের স্রোত আমাদের সমাজের ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে—তার গতি কেউ ফেরাতে পারবেন না। ও যমুনা উজান বহাতে স্বয়ং ভগবানের বাঁশীর আবশ্যক। কিন্তু আশা করি, ব্রাহ্মণের বংশধরেরা নিজেদের বংশীধারী বলে মনে করেন না। তা ছাড়া, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও যদি ধরাধামে পুনরাগমন করে' বাঁশী বাজান, তাহ'লে, এ যমুনা যতক্ষণ সেই বাঁশী বাজ্‌বে ততক্ষণই উজান বইবে। সে বাঁশী যেই থামা, অমনি আবার স্রোত সুমুখের দিকে ছুটবে—সম্ভবত দ্বিগুণ বেগে। এ স্রোতের

বলে সমাজে যে ফাট্ ধরেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ;—কিন্তু তা বলে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। যে ফাট দেখা দিয়েছে তা ভাঙনে পরিণত হবে,—কিন্তু রাতারাতি নয়। তারপর পূর্ব্ব-কূলে যা শিকস্তি হবে পশ্চিম-কূলে আবার তাই পয়স্তি হবে। এই নূতন জীবনের স্রোত সামাজিক মনের ও চরিত্রের ক্ষুদ্রত্ব ভেঙ্গে, কি মহত্ব গড়ে তুল্‌ছে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দামোদরের বন্যার সময় পাওয়া গেছে। আমাদের যুবক সম্প্রদায়, ভাইকে অস্পৃশ্য করে তুল্‌তে চায় না—ছত্রিশ জাতকে ভাই করে নিতে চায়। যে সাম্য, যে মৈত্রী ও যে স্বাধীনতার ভাব চৈতন্য প্রথমে এদেশে প্রচার করেন—সেই ভাবের উপরই বাঙ্গালীর নবজীবন গঠিত হয়ে উঠ্‌ছে। ইউ-রোপীয় সভ্যতার উত্তর-সাধকতায়, নব্য-তান্ত্রিকেরা যে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, সমাজ কোন ছায়াময়ী বিভীষিকা দেখিয়ে তাদের সে সাধনা থেকে বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।

(৪)

ব্রাহ্মণ-মহাসভা যে নিজেদের হাস্যাস্পদ করেছেন, তার বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষে নিজের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতিরিক্ত কাজ কর্‌তে গেলে নিজে কাঁদ্‌তে পারে ; কিন্তু অপরকে হাসায়।

প্রথমত হিন্দু-সমাজ শাস্ত্রশাসিত নয়—লোকাচার-চালিত। সমাজ আবহমানকাল যে এই ভাবে চলে আস্‌ছে তার প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রেই পাওয়া যায়। মনু এ কথা স্বীকার করেছেন ; শুধু তাই নয়, তাঁর মতে লোকাচার এত প্রবল যে তার উপর

হস্তক্ষেপ কর্‌বার ক্ষমতা রাজারও নেই। মনু প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রের পাতা একবার উল্টে দেখ্‌লেই দেখা যায় যে, বর্ত্তমান বাঙ্গালী-হিন্দুসমাজ মনুর শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ শতকরা পাঁচটিও পালন করেন না। শাস্ত্রে বলে লোক সমাজ—লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারের বশবর্ত্তী। বাঙ্গালী হিন্দু-সমাজ এই তিনটির উপর আর একটিরও বিশেষ অধীন—সেটি হচ্ছে স্ত্রী আচার। সুতরাং হিন্দু-সমাজের বিধি-নিষেধ পুঁথিতে নেই, আছে পাঁজিতে। এ অবস্থায় শাস্ত্রের সাহায্যে সমাজকে কি করে শাসন করা যেতে পারে,—তা আমার বুদ্ধির অগম্য। লোকাচার রক্ষা কর্‌বার জন্য শাস্ত্রের আবশ্যক নেই; লোকাচার নষ্ট কর্‌বার জন্য শাস্ত্র অনেক সময় আমাদের হাতে অস্ত্র। শাস্ত্রকে এই অস্ত্র হিসেবেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং দয়ানন্দ স্বামী ব্যবহার করেছেন। ব্রাহ্মণ মহাসভার প্রথম ভুল এই যে, তাঁরা শাস্ত্রের সাহায্যে লোকাচারের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চান।

এঁদের দ্বিতীয় ভুল এই যে, এঁরা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা সমগ্র হিন্দু-সমাজকে শাসন কর্‌তে চান। হিন্দু-সমাজ বলে' কোনও একটা সমগ্র সমাজ নেই। আমাদের হাজারো-এক জাতির এবং তাদের শাখা উপশাখার সমাজ সব স্বতন্ত্র সমাজ। এই অসংখ্য খণ্ড সমাজ সকল সব স্বস্ব প্রধান, কোনও বিশেষ জাতির কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের শাসনাধীন নয়। অবশ্য এ সকল সমাজেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব আছে। কিন্তু সে হচ্ছে ধর্ম্মযাজক হিসেবে—সমাজের শাসনকর্ত্তা হিসেবে নয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের নিকট ব্রাহ্মণের মত, ক্রিয়া-সম্বন্ধে গ্রাহ্য —কর্ম্ম সম্বন্ধে নয়। বাংলার কায়স্থ-সমাজ বিলেত ফেরতকে

সমাজভুক্ত করে নিয়েছেন এবং যদৃচ্ছা উপবীত ধারণ কর্‌ছেন। ব্রাহ্মণ-সমাজের এমন কোনো ক্ষমতা নেই যাতে করে এর জন্য কায়স্থ-সমাজকে হিন্দু-সমাজ হ'তে বহিষ্কৃত করে দিতে পারেন; কিম্বা কায়স্থদের আবার শূদ্রত্ব স্বীকার করাতে পারেন।

তারপর ব্রাহ্মণ-সমাজ বলেও ভারতবর্ষে কোন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র সমাজ নেই। আমরা শত শত খণ্ড-সমাজে বিভক্ত এবং তার একখণ্ডের সঙ্গে আর একখণ্ড সম্পূর্ণ সম্পর্করহিত। হিন্দুদের জাতমারা-বিদ্যে কত দিন থেকে হয়েছে তা আমি জানি নে; কিন্তু সে বিদ্যেয় আমরা এমনি পারদর্শী হয়েছি যে, ব্রাহ্মণের মধ্যেও অধিকাংশ লোককে আমরা জাতিভ্রষ্ট করে রেখেছি। আমরা যে-শূদ্রের হাতে জল খাই সেই শূদ্র-যাজক-ব্রাহ্মণের হাতে জল খাই নে। শুধু তাই নয়, বর্ণ-ব্রাহ্মণেরা যে দেবতার পূজা করেন সে দেবতারও আমরা জাত মারি। শূদ্রের ঠাকুরের সুমুখে আমরা মাথা নীচু করি নে; তার ভোগ আমরা স্পর্শ করিনে। যদি ব্রাহ্মণমাত্রকে একত্র করে আমরা একটি সমগ্র ব্রাহ্মণ-সমাজ গড়ে তুলতে পারতুম, তা হলেও নয় হিন্দু-সমাজকে শাসন কর্‌বার কথা বলা চল্‌ত। কিন্তু আমরা আমাদের জাত-মারা-বিদ্যের গুণে পারি শুধু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেল্‌তে। আমাদের গুণীপনার পরিচয় গুণে নয়, ভাগে। ব্রাহ্মণ-সভা কালীঘাটে শুধু সেই বিদ্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। বিলেত ফেরত প্রভৃতি অনাচারীদের জাত মেরে তাঁরা আর একটি খণ্ড-সমাজ গড়ে তুল্‌তে চান। তাতে আর যার ক্ষতি হোক, আর না হোক, এই নূতন খণ্ডের কোনও ক্ষতি হবে না। হিন্দু-সমাজ পুরুভুজের ন্যায় জীব। তার খণ্ডিত অঙ্গগুলি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায়। সত্যকথা বল্‌তে গেলে,

আমরা বিলেত যাওয়ার দরুণ সমাজ হতে যে মুক্তি লাভ করেছি তার জন্য হিন্দু-সমাজের এই বহিষ্করণী শক্তির নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

আমার শেষ কথা এই যে,—ইউরোপের সমাজের সকল আচার পদ্ধতি যে নির্ব্বিচারে গ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কিম্বা মঙ্গলকর তা অবশ্য নয়। জীবনের ধর্ম্মই হচ্ছে যে, তা মানুষকে ভালর দিকেও এগিয়ে দিতে পারে মন্দের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। জীবন্ত পদার্থের স্বেচ্ছা বলে একটা জিনিস আছে—জড়পদার্থই কেবল ষোল আনা জড়জগতের নিয়মাধীন। কিন্তু স্বজাতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য কি ভাল, আর কি মন্দ, সে বিচার কর্‌বার শক্তি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের নেই। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বিচার—সে ত পুঁথিগত-বিদ্যার মল্লযুদ্ধ—তার উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয় করা নয়, বিপক্ষকে চিৎ করা। পণ্ডিতেরা শিক্ষা করেন শুধু ন্যায়ের প্যাঁচ ও কাটান্। এ মল্লযুদ্ধ দেখতে আমোদ আছে কিন্তু করে কোনও ফল নেই। কুস্তিগির পালোয়ানেরা যেমন আখ্‌ড়ার বাইরে অকর্ম্মণ্য, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও তেমনি শাস্ত্রের গণ্ডির বাইরে অকর্ম্মণ্য। যে জ্ঞানের দ্বারা, যে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা—আমাদের নবজীবনকে জাতীয় মঙ্গলের পথে চালিত করা যায়—সে জ্ঞান, সে বুদ্ধি টোলে কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। সে বিচার নব্য-তান্ত্রিকদেরই কর্‌তে হবে, যখন তা করা আবশ্যক হবে। এখন হচ্ছে আমাদের বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় করবার যুগ;—ঘরে বসে ভয়ে ভাবনায় শক্তি অপব্যয় করবার নয়। আমরা যে হালখাতা খুলেছি তাতে বকেয়া টানা শুধু পণ্ডশ্রম। যদি প্রথম ঝোঁকে ভুল পথে যাই তবে ঠেকে শিখে সে পথ ছাড়্‌ব। উচ্ছৃঙ্খলতার

অপবাদের ভয়ে ভীত হয়ে নব্য-তান্ত্রিকেরা যে সামাজিক শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করেছেন, সাধ করে আর তা পায়ে পরবেন না। বিদ্যাপতি বলে গেছেন "পানী পিয়ে পিছু জাতি বিচারি।" জ্ঞানের অভাবে, কর্ম্মের অভাবে আমরা শত শত বৎসর ধরে শুকিয়েছিলুম। সুতরাং যে জ্ঞানের ও কর্ম্মের স্রোত আমাদের দুয়োর দিয়ে বয়ে যাচ্চে আমরা অঞ্জলিভরে তার জীবন পান করব। জাতি বিচার হবে এখন নয়, তখন—যখন জাতির বিচারবুদ্ধি পরিপক্ক হবে।

আমি বিলেত ফেরত সুতরাং স্বজাতির কাছ থেকে আমার ভয় নেই কিন্তু তার উপর আমার ভরসা আছে। শাস্ত্র আজও ব্রাহ্মণের হাতের অস্ত্র। সেই অস্ত্র দিয়ে যদি আত্মহত্যা কর্‌তে চেষ্টা না করে' ব্রাহ্মণেরা প্রচলিত হিন্দু-সমাজের লোকাচারের নাগপাশ ছিন্ন করেন তাহলেই তাঁরা তাঁদের বর্ণোচিত কাজ কর্‌বেন।

শাস্ত্রের ভাষায় বল্‌তে গেলে, হিন্দু-সমাজে মানবজাতির "সামান্য ধর্ম্মের" পুনঃপ্রতিষ্ঠা কর্‌তে হলে, ছত্রিশ জাতির ছত্রিশ রকমের "বিশেষ ধর্ম্ম" নষ্ট করতে হবে। ব্রাহ্মণ-সমাজে আজও যে এমন অনেক যথার্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও নির্ভিক পণ্ডিত আছেন, যাঁদের সাহায্যে পূর্ব্বোক্তরূপ সমাজ-সংস্কার সাধিত হতে পারে, তার প্রমাণ এই ব্রাহ্মণ-মহাসভাতেই পাওয়া গেছে। কিন্তু এই আর একটি মহা লজ্জার কথা যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা উক্ত সভায় ধর্ম্মধ্বজী "বৈড়াল-ব্রতিক" এবং "বক-ব্রতিক" ব্রাহ্মণদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হয়েছেন।

বৈশাখ, ১৩২১ সন।

"সবুজ পত্রে"র মুখপত্র।

ওঁ প্রাণায় স্বাহা।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালী জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—"একটা নতুন কিছু করো।" সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বল্‌লে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এ পৃথিবীটি যথেষ্ট পুরোনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এ দেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন কিছু করে' তোলা যায়, তা হয় জলবায়ুর গুণে দুদিনেই পুরোনো হয়ে যায়, নয় ত পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে' ফেলে। এই সব দেখে শুনে, এদেশে কথায় কিম্বা কাজে নতুন কিছু কর্‌বার জন্য যে পরিমাণ ভরসা ও সাহস চাই—তা যে আমাদের আছে তা বল্‌তে পারিনে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে তবে কি উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ কর্‌বার জন্য, এত কাগজ থাক্‌তে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি—তাহ'লেও আমাদের নিরুত্তর থাক্‌তে হবে; কেন না কথা দিয়ে কথা না রাখ্‌তে পারাটা সাহিত্য-সমাজেও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। নিজেকে প্রকাশ কর্‌বার পুর্ব্বে নিজের পরিচয় দেওয়াটা,—শুধু পরিচয় দেওয়া নয়, নিজের গুণগ্রাম বর্ণনা করাটা,—যদিও মাসিক পত্রের পক্ষে একটা সর্ব্বলোকমান্য "সাহিত্যিক" নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও সে নিয়ম ভঙ্গ করতে আমরা বাধ্য। যে কথা

বারো মাসে বারো কিস্তিতে রাখ্‌তে হবে, তার যে মাঝে মাঝে খেলাপ হবার সম্ভাবনা নেই—এ জাঁক কর্‌বার মত দুঃসাহস আমাদের নেই। তা ছাড়া স্বদেশের কিম্বা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্ম্মও নয়; সে হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্রের কথা। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সঙ্কীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্ফূর্ত্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়। কাজ হচ্ছে দশে মিলে কর্‌বার জিনিস। দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়্‌তে পারি নে, গড়্‌তে পারি শুধু সাহিত্য-সম্মিলন। কারণ দশের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে কোনও কাজ উদ্ধার করতে হলে, নিজের স্বাতন্ত্র্যটি অনেকটা চেপে দিতে হয়। যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দ-আনা মিল থাকে, তাহলে প্রতিজনে বাকি দু-আনা বাদ দিয়ে, একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাঞ্ছিত কোনও ফললাভের জন্য চেষ্টা কর্‌তে পারি। এক দেশের, এক যুগের, এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দ-আনা মিল থাক্‌লেই সামাজিক কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে, ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দু-আনার মূল্য ঢের বেশি। কেননা ঐ দু-আনা হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকি চৌদ্দ-আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোল-আনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে। এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

এ কথা শুনে অনেকে হয়ত বল্‌বেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব, সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাবও পূরণ না কর্‌তে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়,—সখ। ও ত কল্পনার আকাশে রঙীণ কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো, এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে' নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ততই ভাল। অবশ্য ঘুড়ি ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্ততঃ উপরের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে শেখায়। তবুও একথা সত্য যে মানব-জীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্‌-ছল। জীবন অবলম্বন করে'ই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি-লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে দিতে পারে না। কোনও কথায় চিড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনও কোনও কথায় মন ভেজে, এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুন্‌গুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়—অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়,—আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ়-তত্ত্ব আমরা না জান্‌লেও, তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট যে, তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রত ভাব। অপর দিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়—তাই আমরা কথায় মরি কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ কর্‌তে পারে কি না জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষ মাত্রেরই মন কতক সুপ্ত

আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে ভুল করি,—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানিনে, কেননা জানিনে। সাহিত্য মানব-জীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে' তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র-মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তাহ'লে আমরা বাঙ্গালীজাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব তা কতকটা দূর কর্‌তে পার্‌ব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক্ উপলব্ধি কর্‌তে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে', জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে', আলস্যকে ঔদাস্য বলে', শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে', উপবাসকে উৎসব বলে', নিষ্কর্ম্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে' প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্ব্বলের বল। যে দুর্ব্বল সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য, জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে দিতে পারে না—কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা কর্‌তে পারে।

আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুল্‌তে পার্‌ব, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আমি বল্‌তে পারিনে, কেননা, যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়্‌বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ

নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করে' পাবার জিনিষ নয়। তবে বাংলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে—সে ক্ষমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষে। এবং আমাদের প্রবৃত্তির সহজ গতিটি যে ঐ নিজেকে এবং অপরকে সজাগ করে' তোল্‌বার দিকে তাও অস্বীকার কর্‌বার যো নেই, কারণ ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে তা'তে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্, আর হলাহলই হোক্, তার ধর্ম্মই হচ্চে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাক্‌তে দেওয়া নয়। এই ইংরাজি-শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজি-সভ্যতার সংস্পর্শে, আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে দিকে হোক্ কোনও একটা দিকে চল্‌বার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু কর্‌ছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান্, কেউ পূর্ব্বের দিকে পিছু হট্‌তে চান্, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান কর্‌ছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্ত্তির অনুসন্ধান কর্‌ছেন। এক কথার আমরা উন্নতিশীলই হই, আর অবনতিশীলই হই, আমরা সকলেই গতিশীল,—কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক্, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকলপ্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে—সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব-সাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরামালিনীর ভাঙ্গা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটেছিল, ইউ-

রোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে' উঠেছে। তার ফল কি হবে সে কথা না বল্‌তে পার্‌লেও, এই ফুলফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয় এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ কর্‌বার জন্য উৎসাহ দেব।

ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেছি, সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আননা কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ কর্‌তে হবে। চিনের টবে তোলা মাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই, ভারতবর্ষের অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চ্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে। ইংরাজি শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধার-কল্পে ব্রতী হয়েছি। তাই আমাদের মন একলম্ফে শুধু বঙ্গ বিহার নয়, সেই সঙ্গে হাজার দেড়েক বৎসর ডিঙ্গিয়ে একেবারে আর্য্যাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমাদের পূর্ব্ব কবি হচ্ছে কালিদাস, কাশিদাস নয়,—দার্শনিক শঙ্কর, গদাধর নয়,—শাস্ত্রকার মনু, রঘুনন্দন নয়,—আলঙ্কারিক দণ্ডী, বিশ্বনাথ নয়। নব্যন্যায়, নব্যদর্শন, নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতি পুরাতন, আর যা কালের হিসাবে অতি পুরাতন, তাই আবার বর্ত্তমানে নতুনরূপ ধারণ করে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে, ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাক্‌লেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল,—উভয়ই প্রাণবন্ত। গাছের গোলাপের সঙ্গে কাগজের গোলাপের সাদৃশ্য থাকলেও, জীবিত ও মৃতের ভিতর যে পার্থক্য—উভয়ের মধ্যে সেই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু

স্থলের গোলাপ ও জলের পদ্ম উভয়ে এক জাতীয়, কেননা উভয়েই জীবন্ত। সুতরাং আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক ও বিদেশের দিক, দুই দিক্ থেকেই আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয় সেই লেখাই কেবল সাহিত্য,—বাদবাকি লেখা কাজের নয়, বাজে।

এই সাহিত্যের বহির্ভূত লেখা আমাদের কাগজ থেকে বহির্ভূত করবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলে', আমরা এই নতুন পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি। একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ কর্‌বার জন্য।

এই নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্য যে কেন পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে, তার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়। কিঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই, সে কারণের দুই পিঠই সহজে মানুষের চোখে পড়ে।

সাহিত্য এদেশে অদ্যাবধি ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি; তার জন্য দোষী লেখক কি পাঠক, বলা কঠিন। ফলে, আমরা হচ্ছি সব সাহিত্য-সমাজের সখের কবির দল। অ-ব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোন কাজই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, এ কথা সর্ব্বলোক-স্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে, কাজও নয় খেলাও নয়, শুধু অকাজ; কারণ খেলার ভিতর যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, সে লেখায় তা নেই,—অপর দিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তা'তে নেই। আমাদের রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়; কেননা যে অবসর আমাদের নেই, সেই অবসরে আমরা সাহিত্য রচনা করি। আমরা অবলীলা-

ক্রমে সাহিত্য গড়্‌তে চাই বলে’, আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। অথচ এ কথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে লেখেন, সরস্বতী চাই কি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ নাও কর্‌তে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গসাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে, পল্লবিত হয়ে উঠছে। ফুলের চাষ কর্‌তে হয়, জঙ্গল আপনি হয়। অতিকায় মাসিক পত্রগুলি সংখ্যাপূরণের জন্য এই আগাছার অঙ্গীকার কর্‌তে বাধ্য, এবং সেই কারণে আগাছার বৃদ্ধির প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। এই সব দেখে শুনে, ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে, আমাদের কাগজ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। এই আকারের তারতম্যে, প্রকারেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হওয়া অবশ্যাম্ভাবী। আমাদের স্বল্পায়তন পত্রে, অনেক লেখা আমরা অগ্রাহ্য কর্‌তে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য, শিশুপাঠ্য, স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল, অনাহূত কিম্বা রবাহূত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌তে বল্‌তে পার্‌ব; কারণ, আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ কর্‌তে হবে না। এর লাভ যে কি, তিনিই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, যিনি জানেন যে, যে কথা একশ’ বার বলা হয়েছে তারি পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।

তারপর, যে জীবনীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয় নি;—তা হয় দূরদেশ হতে, নয় দূরকাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনও আমাদের সমাজে ও

মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন কর্‌তে না পার্‌লে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিম্বা জীবনে ফল পাব না। এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত কর্‌তে হলে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ কর্‌তে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে' নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত কর্‌বার পক্ষে লেখকদের সাহায্য কর্‌বে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্চে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া। আমাদের কাগজে আমরা তাই সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট করে' দেবার চেষ্টা কর্‌ব।

আমার শেষ কথা এই যে, যে শিক্ষার গুণে দেশে নূতন প্রাণ এসেছে, মনে সাহিত্য গড়বার প্রবৃত্তি জন্মিয়ে দিয়েছে, সেই শিক্ষার দোষেই সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার অনুরূপ ক্ষমতা আমরা পাই নি। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ ও অতীত ভারতবর্ষ, এ উভয়ের দোটানায় পড়ে', বাংলা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা শিখি ইংরাজি, লিখি বাংলা, মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান। ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও, তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে আন্‌ছে, তা দেশের মাটিতে

শিকড় গাড়তে পার্ছে না বলে', হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই "মেঘনাদবধ" কাব্য পরগাছার ফুল। "অর্কিড"-এর মত তার আকারের অপূর্ব্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাক্‌লেও, তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশী বলে' "অন্নদামঙ্গল" স্বল্পপ্রাণ হলেও কাব্য; এবং কোন দেশেরই নয় বলে' "বৃত্র-সংহার" মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়। ভারতচন্দ্র, ভাষার ও ভাবের একতার গুণে, সংযমের গুণে, তাঁর মনের কথা ফুলের মত সাকার করে' তুলেছেন, এবং সে ফুলে, যতই ক্ষীন হোক্ না কেন, প্রাণও আছে, গন্ধও আছে। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে। আশা করি বাংলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ কর্‌লেই তা'তে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠ্‌বে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা আশা করি এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা কর্‌বে। বড়কে ছোটর ভিতর ধরে' রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। ওস্তাদরা বলে' থাকেন যে "গৌড়-সারঙ্গ" রাগিণী ছোট, কিন্তু গাওয়া মুস্কিল; "ছোটিসে দরওয়াজাকে অন্দর হাতী নিকাল্‌না যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল, দরিয়াকো পাকড়কে কুঁজামে ডাল্‌না যৈসা মুস্কিল ঐসা মুস্কিল।" অবস্থা গুণে যতই মুস্কিল হোক্ না কেন, বাঙ্গালীজাতিকে এই গৌড়-সারঙ্গই গাইতে চেষ্টা কর্‌তে হবে। আমাদের বাংলাঘরের খিড়কি-দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা কর্‌তে হবে, আমাদের গৌড়-ভাষার মৃৎ-কুম্ভের মধ্যে সাত

সমুদ্রকে পাত্রস্থ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনও সহজ সাধন-পদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

বৈশাখ, ১৩২১ সন।

সাহিত্য-সম্মিলন।

—:-*-:—

গত সাহিত্য-সম্মিলনে একটি নূতন সুরের পরিচয় পাওয়া গেছে,—সে হচ্ছে সত্যের সুর। এ সুর যে বঙ্গ-সাহিত্যে পূর্ব্বে কখনও শোনা যায়নি, তা নয়; তবে নূতনত্বের মধ্যে এইটুকু যে, আর পাঁচটি বিবাদী সম্বাদী ও অনুবাদী সুরের মধ্যে এবারকার পালায় এইটিই ছিল স্থায়ী সুর। এবং সে সুর যে অতি সুস্পষ্ট হয়ে' উঠেছিল, তার কারণ, তা কোমল নয়—তীব্র।

এবারকার ব্যাপারের কর্ম্মকর্ত্তারা নিমন্ত্রিত অভ্যাগত সাহিত্যিকদের, প্রচলিত প্রথা মত—"আসুন বসুন" বলে' সম্ভাষণ করেন নি; "উঠুন চলুন" বলে' অভিভাষণ করেছেন! এঁরা সকলেই গলার আওয়াজ আধসুর চড়িয়ে' মুক্তকণ্ঠে এক-বাক্যে বলেছেন যে—"এ দেশের সেকাল সত্যযুগ হতে পারে, কিন্তু একাল হচ্ছে মিথ্যার যুগ"। এই দেশব্যাপী মিথ্যার হাত হ'তে কি করে' উদ্ধার পাওয়া যায়, তারি সন্ধান বলে' দেওয়াটাই ছিল সাহিত্যাচার্য্যদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মিথ্যার চর্চ্চা লোকে দু'ভাবে করে,—এক জেনে', আর এক না জেনে'। সত্য যে কি, তা জেনে'ও কেউ কেউ কথায় ও কাজে তা নিত্য উপেক্ষা করেন। এ রোগের ঔষধ কি, বলা কঠিন,—অন্তত ওর কোন টোট্‌কা আমার জানা নেই। অপর পক্ষে, অনেকে কেবলমাত্র মানসিক জড়তাবশত, ও-বস্তু যে কি, তার সন্ধান জানেনও না, নেনও না। তাই সম্মিলনের মুখ-

পাত্রেরা, যাদের মনের সর্ব্বাঙ্গে আলস্য ধরেছে, সেই শ্রেণীর লোকদের উপদেশ দিয়েছেন—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"।

এঁরা আমাদের জাগিয়ে তুলতে চান—সত্যের জ্ঞানে; আমাদের উঠে চলতে বলেন—সত্যের অনুসন্ধানে। কারণ, যে সত্য চোখের সুমুখে রয়েছে সেটিকে দেখাও আমাদের পক্ষে যেমন কর্ত্তব্য, যে সত্য লুকিয়ে আছে তাকে খুঁজে বার করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য। কোনও জিনিষ দেখতে হ'লে, জাগা অর্থাৎ চোখ-খোলা দরকার, আর কোন জিনিষ খুঁজতে হ'লে ওঠা এবং চলা দরকার। তাই এঁরা আমাদের "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চান। তবে আমরা এ মন্ত্রে দীক্ষিত হ'তে রাজি হব কিনা জানিনে; কেননা এ মন্ত্রের সাধনায় আমরা অভ্যস্ত নই।

লোক-প্রবাদ যে, পুরুতে যখন মন্তর পড়ে পাঁঠা তাতে কর্ণপাত করে না। পাঁঠা যে ও-সব কথা কানে তোলে না, তার কারণ, উৎসর্গের মন্ত্র পড়া হয় ছাগকে বলি দেবার জন্য। কিন্তু এই সাহিত্য-যজ্ঞের পুরোহিতেরা যে মন্ত্র পড়েছেন তা বলির মন্ত্র নয়, বোধনের মন্ত্র; সুতরাং তাতে কর্ণপাত করায় আমাদের বিশেষ আপত্তি হওয়া উচিত নয়। আমরা মানি আর না মানি, এঁরা যে-কথা বলেছেন তা যে মন দিয়ে শোনবার মত কথা, এই বিশ্বাসে আমি সাহিত্য-সম্মিলনের অভিভাষণ-চতুষ্টয়ের আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

(১)

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁর অভি-ভাষণের উপসংহারে বলেছেন যে—

"বিজ্ঞান যদি বৃদ্ধ ভারত-মন্ত্রীর কথা শোনেন, তবে ভারতে ফিরিয়া আসুন।"

এ কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর মতে ভারতবর্ষই হচ্ছে বিজ্ঞানের জন্মভূমি; কিন্তু পুরাকালে বালক অবস্থাতেই বিজ্ঞান সমাজের প্রতি অভিমান করে' দেশত্যাগী হ'য়ে ইউরোপে চলে যান। এবং সেখানে তদ্দেশবাসীর যত্নে লালিত পালিত হয়ে এখন যথেষ্টর চাইতেও বেশি হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠেছেন। এমন কি, ইউরোপবাসীরা এখন আর তাঁকে সামলে উঠতে পারছে না। এই কারণেই, যিনি স্থলপথে বিলেত চলে গেছ্‌লেন, তাঁকে আবার জলপথে দেশে ফিরে আসতে অনুরোধ করা হয়েছে। ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরে এলে দেশের যে কোনও অকল্যাণ হবে, এ আশঙ্কা ঠাকুরমহাশয় করেন না। বরং তিনি এতে মঙ্গলের আশা করেন। কেন?—তা তিনি স্পষ্ট করে' ব্যাখ্যা করেন নি। তবে তিনি বিজ্ঞানের রূপ-গুণের যে শাস্ত্রসঙ্গত বর্ণনা করেছেন, তার থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, কি কারণে বিজ্ঞানের আবার দেশে ফেরাটা দরকার।

ঠাকুরমহাশয় বলেছেন যে,—

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন, সত্য তিন প্রকার ঃ—

(১) পরমার্থিক সত্য = তত্ত্বজ্ঞান = পরাবিদ্যা।

(২) ব্যাবহারিক সত্য = বিজ্ঞান = অপরাবিদ্যা।

(৩) প্রাতিভাসিক সত্য = ভ্রমজ্ঞান = অবিদ্যা

বিজ্ঞান বলতে একালে আমরা যা বুঝি, সে বিষয়ে বেদান্তের পরিভাষায় সম্যক আলোচনা করা কঠিন; কারণ জ্ঞানের এই ত্রিবিধ জাতিভেদ আধুনিক দার্শনিকেরা স্বীকার করেন না।

নব্যমতে জ্ঞান এক,—শুধু ভ্রমই বহুবিধ। তবুও আমার বিশ্বাস যে বেদান্তের পরিভাষা অবলম্বন করে'ও জ্ঞানের রাজ্যে বিজ্ঞানের স্থান কোথায় এবং কতখানি তা দেখান যেতে পারে। সুতরাং আমি এ প্রবন্ধে উক্ত পরিভাষাই ব্যবহার করব।

ঠাকুরমহাশয় পূর্ব্বোক্ত তিন সত্যের নিম্নলিখিত রূপে ব্যাখ্যা করেছেন—

"বিজ্ঞান ব্যষ্টিজ্ঞান বা শাখাজ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান সমষ্টিজ্ঞান বা মোট জ্ঞান পারমার্থিক সত্য মোট জ্ঞানের মোট সত্য; ব্যাবহারিক সত্য বিভিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন সত্য।"

অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা এক অখণ্ড-সত্য লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞান,—আর যার দ্বারা বহু খণ্ড-সত্যের জ্ঞান লাভ করা যায়, সেই হচ্ছে বিজ্ঞান। এক কথায়, তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরুষকে জানা; বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে চেনা। বিজ্ঞানের নামে অনেকে ভয় পান, এই মনে করে' যে, তা তত্ত্ব-জ্ঞানের বিরোধী; এবং তত্ত্বজ্ঞান যেহেতু ভারতবর্ষের প্রাণ, অতএব সেটিকে নিরাপদে রাখবার জন্য এঁদের মতে বিজ্ঞানকে পরিহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ কথা অবশ্য বেদবেদান্তে নেই; বরং উপনিষৎ-কারেরা বলেছেন যে, অপরাবিদ্যা আয়ত্ত করতে না পারলে, পরাবিদ্যায় কারও অধিকার জন্মায় না। উপরোক্ত মতটি যে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না, বিজ্ঞানের চর্চ্চা ত্যাগ করলে বহু সম্বন্ধে আমাদের ভ্রম-জ্ঞান হওয়া অবশ্যম্ভাবী, কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে পরীক্ষিত জ্ঞান;—বৈজ্ঞানিকেরা সত্যের টাকা না বাজিয়ে নেন না। বহু খণ্ড-সত্যের উপর যদি এক মোট-সত্যের প্রতিষ্ঠা না করা যায়;

তাহ'লে বহু খণ্ড-মিথ্যার উপর সে সত্যের যে প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, এরূপ মিছা আশা শুধু পাগলে করতে পারে।

আসল কথা এই যে, দর্শনে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টি এই দুইটি ভাবকে পৃথক করে নিলেও, এ বিশ্ব ব্যস্তসমস্ত। তাই সমষ্টির জ্ঞানের ভিতর ব্যষ্টির জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে, এবং ব্যষ্টির জ্ঞান সমষ্টির জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে; কেন না বস্তুত ও-দুই একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞানে ও বিজ্ঞানে প্রভেদ এই যে, সমষ্টিজ্ঞান পরাবিদ্যায় এক ভাবে পাওয়া যায়, আর অপরাবিদ্যায় আর-একভাবে পাওয়া যায়। পরাবিদ্যার সমষ্টিজ্ঞান হচ্ছে মূলত একত্বের জ্ঞান। অপরপক্ষে বহুকে যোগ দিয়ে যে সমষ্টি পাওয়া যায়, তারি জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞানানুমোদিত সমষ্টিজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানী এক জেনে সব জানতে চান, আর বৈজ্ঞানিক সবকে একত্র করে জানতে চান। এ দুয়ের ভিতর পার্থক্য আছে, কিন্তু বিরোধ নেই। সুতরাং বিজ্ঞানের চর্চ্চায় পারমার্থিক সত্যের নাশের ভয় নেই; ভয় আছে শুধু মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদের। যাঁরা মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চান, তাঁরাই শুধু বিজ্ঞানকে ডরান।

পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, প্রাতিভাসিক সত্য হচ্ছে ভ্রমজ্ঞান। এ কথা শুনে লোকের এই ধোঁকা লাগতে পারে যে, কি করে' একই জ্ঞান যুগপৎ সত্য ও ভ্রম হতে পারে। প্রাতিভাসিক সত্য যে এক হিসাবে সত্য, আর এক হিসাবে মিথ্যা,—এর স্পষ্ট প্রমাণ আছে। সম্মিলনের সভাপতি মহাশয় যে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, তারি সাহায্যে প্রাতিভাসিক সত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করব।

সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী যে সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে, এটি হচ্ছে

বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা, এটি হচ্ছে প্রাতিভাসিক সত্য; আর পৃথিবী গোলাকার, এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য। পৃথিবী চেপ্টা ও সূর্য্যের যে উদয়াস্ত হয়, এ দুটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য; অর্থাৎ আমাদের চোখের পক্ষে ও আমাদের চলাফেরার পক্ষে সম্পূর্ণ সত্য। যতখানি জমি বাঙলা দেশে চোখে দেখা যায়, তা যে সমতল, এর চাইতে খাঁটি সত্য আর নেই। সুতরাং পৃথিবীর যে খণ্ডদেশ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ, তা চেপ্টা—গোলাকার নয়। সমগ্র পৃথিবীটি গোলাকার, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীটি প্রত্যক্ষ নয়। আমরা যখন প্রত্যক্ষের সীমা লঙ্ঘন করে' অপ্রত্যক্ষের বিষয় প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সাহায্যে জানতে চাই, তখনই আমরা ভ্রমে পড়ি। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হচ্ছে সমষ্টির জ্ঞান,—অসংখ্য খণ্ড খণ্ড প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের যোগাযোগ করে' সে জ্ঞান পাওয়া যায়। অসংখ্য চেপ্টা-খণ্ডকে ঠিক দিলে তা গোল হয়ে ওঠে। এক মুহূর্ত্তে একদেশদর্শিতাই হচ্ছে প্রত্যক্ষজ্ঞানের ধর্ম্ম, সুতরাং কোনও একটি বিশেষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের উপর নির্ভয়ে বৈজ্ঞানিক সত্যকে দাঁড় করান যায় না।

ইন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুর যে পরিচয় দেয়, সাধারণত মানুষে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে; কারণ তাতেই তার কাজ চলে যায়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক, ব্রহ্মাণ্ডকে একটি প্রকাণ্ড সমষ্টি হিসেবে দেখতে চায়; বিশ্বে একটা নিয়ম আছে এই বিশ্বাসে, সে সেই নিয়মের সন্ধানে ফেরে। বস্তু সকলকে পৃথকভাবে না দেখে, যুক্তভাবে দেখতে গিয়ে, বিজ্ঞান দেখতে পায় যে, প্রাতিভাসিক সত্য সমগ্র সত্য নয়। পৃথিবী যে চেপ্টা, ও সূর্য্য যে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে, প্রত্যক্ষজ্ঞানের হিসেবে এ দু'টি হচ্ছে সম্পূর্ণ পৃথক এবং সম্পর্করহিত সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে এ দু'টি হচ্ছে এক

সত্যের দুইটি বিভিন্ন রূপ। পৃথিবী নামক মৃৎ পিণ্ডটি যে কারণে সূর্য্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে, সেই কারণেই সেটি তাল পাকিয়ে গেছে। ত্রিকোণ, বা চতুষ্কোণ কিম্বা চেপ্টা হ'লে, ও-ভাবে ঘোরা তার পক্ষে অসাধ্য হ'ত। সুতরাং প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নেই; কারণ এ উভয়ের অধিকার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা জানতে চাই বস্তু-জগতের সামান্য গুণ, আর প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দেখতে চাই বস্তুর বিশেষ রূপ। অতএব, বিজ্ঞানের চর্চ্চা করলে আমাদের তত্ত্বজ্ঞান মারা যাবে না, অর্থাৎ আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হবে না; এবং আমাদের বাহ্যজ্ঞানও নষ্ট হবে না, অর্থাৎ কাব্য শিল্পও মারা যাবে না। যা' তত্ত্বজ্ঞানও নয়, বিজ্ঞানও নয়, প্রত্যক্ষজ্ঞানও নয়,—তাই হচ্ছে যথার্থ মিথ্যা; এবং তারি চর্চ্চা করে' আমরা ধর্ম্ম, সমাজ, কাব্য, শিল্প,—এক কথায় সমগ্র মানবজীবন সমূলে ধ্বংস করতে বসেছি।

(২)

বিজ্ঞান শুধু একপ্রকার বিশেষ জ্ঞানের নাম নয়;—একটি বিশেষ প্রণালী অবলম্বন করে' যে জ্ঞান লাভ করা যায়, আসলে তারি নাম হচ্ছে বিজ্ঞান। আমরা বিজ্ঞানকে যতই কেন সাধা-সাধি করিনে, সে কখনই এদেশে ফিরে আসবে না, যদি না আমরা তার সাধনা করি। সুতরাং সেই সাধনপদ্ধতিটি আমাদের জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটি যে কি, সে সম্বন্ধে আমি দুই একটি কথা বলতে চাই। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য থেকেই তার উপায়েরও পরিচয় পাওয়া যাবে। তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয়

হচ্ছে—“এক সত্য”,—অথচ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের বহুর অস্তিত্ব তত্ত্ব-জ্ঞানীরাও অস্বীকার করতে পারেন না। তাই বৈদান্তিকেরা বলেন --যা পূর্ব্বে এক ছিল, তাই এখন বহুতে পরিণত হয়েছে। সাংখ্যের মতে সৃষ্টি একটি বিকার মাত্র, কেননা ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতির সুস্থ অবস্থা। সৃষ্টিকে বিকার হিসেবে দেখা আশ্চর্য্য নয়, কেননা আপাতসুলভ জ্ঞানে এ বিশ্ব একটি ভাঙাচোরা, ছাড়ানো ও ছড়ানো ব্যাপার। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই অসংখ্য পৃথক পৃথক বস্তুর পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা,—জড়-জগতের ভগ্নাংশগুলিকে যোগ দিয়ে, একটি মন দিয়ে ধরবার-ছোঁবার মত সমষ্টি গড়ে' তোলা। এই ভগ্নাংশ-গুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যোগ করতে হলে আঁকযোখ চাই। সুতরাং দুইয়ে দুইয়ে চার করার নামই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ আর-যে-দেশেই হোক, বিজ্ঞানের রাজ্যে হয় না। বিজ্ঞানের কারবার শুধু বস্তুর সংখ্যা নিয়ে নয়—পরিমাণ নিয়েও। সুতরাং বিজ্ঞানে মাপযোখও করা চাই। বিনা মাপে, বিনা আঁকে যে সত্য পাওয়া যায়, তা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। বিজ্ঞানের যা-কিছু মর্য্যাদা, গৌরব ও মূল্য,—তা সবই এই পদ্ধতির দরুণ। আমাদের কাছে কোনও বৈজ্ঞানিক সত্যের বিশেষ কিছু মূল্য নেই, যদি আমরা কি উপায়ে সেটি পাওয়া গেছে, তা না জানি। পৃথিবী কমলালেবুর মত,—এটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সত্য ; কিন্তু কি মাপযোখের, কি যুক্তির সাহায্যে এই সত্য নির্ণীত হয়েছে, সেটি না জানলে, ও-সত্য আমাদের মনের হাতে কমলালেবু নয়, ছেলের হাতে মোয়া,—অর্থাৎ তা আমাদের এতই কম করায়ত্ত যে, যে-খুসি-সেই কেড়ে নিতে পারে। বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসকলের ক্রমান্বয়ে ভুল বেরচ্ছে,

আবার তা সংশোধন করা হচ্ছে। কিন্তু সে ভুলের আবিষ্কার ও সংশোধন ঐ একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে সাধিত হচ্ছে।

ঐতিহাসিক শাখার নেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়, ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় করবার পদ্ধতিটি যে কি, তারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন; কারণ ইতিহাস ঠিক বিজ্ঞান না হলেও, একটি উপ-বিজ্ঞানের মধ্যে গণ্য। এক্ষেত্রে মৈত্রমহাশয়ের মতে ঐতিহাসিকদের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে অনুসন্ধান করে' অতীতের দলিল সংগ্রহ করা। সে দলিল, নানা দেশে নানা স্থানে ছড়ানো আছে। সুতরাং সেই সব হারামণির অন্বেষণের জন্য ঐতি-হাসিকদের দেশদেশান্তরে ঘুরতে হবে। শুধু তাই নয়। ঐতিহাসিক তত্ত্ব সকল সময়ে মাটির উপর পড়ে'-পাওয়া যায় না। ও হচ্ছে বেশির ভাগ কষ্ট করে' উদ্ধার করবার জিনিষ; কারণ অতীত প্রত্যক্ষ নয়,—বর্ত্তমানে তা ঢাকা পড়ে' থাকে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করবার অর্থ হচ্ছে অ-দৃষ্টকে দৃষ্ট করা, তার জন্য চাই পুরুষকার। তাই মৈত্রমহাশয়, কেবলমাত্র ভক্তিভরে অতীতের নাম কীর্ত্তন না করে', তার সাক্ষাৎকার লাভ করবার পরামর্শ আমাদের দিয়েছেন। তাঁর পরামর্শমত কাজ করতে হ'লে, আমাদের করতাল ভেঙে কোদাল গড়াতে হবে। ভূগর্ভে ও কালগর্ভে যে সকল ঐতিহাসিক রত্ন নিহিত আছে, আগে তা খুঁড়ে বার করতে হবে, পরে তার কাটাই-ছাঁটাই করে' সাহিত্য-সমাজে প্রচলন করতে হবে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আগে আসে খনিকার, তার পরে মণিকার। মৈত্র মহাশয় তাই ঐতিহাসিকদের কলম ছাড়িয়ে খন্তা ধরাতে চান। তাঁর বিশ্বাস যে, ঐতিহাসিকদের হাতের খন্তা নিয়ত

ব্যবহারে ক্ষয়ে গিয়ে ক্রমশ কলমের আকার ধারণ করবে, এবং সেই কলমে ইতিহাস লিখিতে হবে। ইতিহাসের আবিষ্কর্ত্তা ও রচয়িতার মধ্যে যে অধিকারভেদ আছে—মৈত্র মহাশয় বোধ হয় সেটি মানেন না। অথচ এ কথা সত্য যে, একজনের পক্ষে কলম ছেড়ে খন্তা ধরা যত কঠিন, আর একজনের পক্ষে খন্তা ছেড়ে কলম ধরা তার চাইতে কিছু কম কঠিন নয়।

সে যাই হোক, মৈত্র মহাশয় আমাদের আর একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সে হচ্ছে এই যে, ত্যাগ স্বীকার না করতে পারলে, কোনোরূপ সাধনা করা যায় না। কেননা ত্যাগের অভ্যাস থেকেই সংযমের শিক্ষা লাভ করা যায়। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক সাধনা করতে হলে, আমাদের অসংখ্য মানসিক আলস্য-প্রসূত বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে। আমাদের পুরাণের মায়া, কিম্বদন্তীর মোহ কাটাতে হবে।

শুধু রূপকথা নয়, সেই সঙ্গে কথার মোহও আমাদের ত্যাগ করতে হবে, অর্থাৎ যথার্থ ইতিহাস রচনা করতে হ'লে সে রচনায়, "শব্দের লালিত্য, বর্ণনার মাধুর্য্য, ভাষার চাতুর্য্য" পরিহার করতে হবে। এক কথায় শ্রীহর্ষচরিত আর কাদম্বরীর ভাষায় লেখা চলবে না। এ কথা অবশ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কিন্তু কি কারণে অক্ষয়বাবু অপরকে যে উপদেশ দিয়েছেন নিজে সে উপদেশ অনুসরণ করেন নি, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না। কারণ তাঁর অভিভাষণের ভাষা যে "অক্ষর-ডম্বর", এ কথা টাউনহলে সশরীরে উপস্থিত থাকলে স্বয়ং বাণভট্টও স্বীকার করতেন। সম্ভবত অক্ষয়বাবুর মতে ইতিহাসের আখ্যান হচ্ছে বিজ্ঞান, আর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাখ্যান হচ্ছে কাব্য।

(৩)

যে লোভ অক্ষয়বাবু সংবরণ করতে পারেন নি, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় আগাগোড়া অশাস্ত্রীয় ভাষা ব্যবহার করায়, তাঁর অভি-ভাষণ এতই জলের মত সহজ হয়েছে যে, তা এক-নিশ্বাসে নিঃশেষ করা যায়। এ শ্রেণীর লেখা যে বহতা নদীর জলের মতই স্বচ্ছ ও ঠাণ্ডা হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। জলের মত ভাষার বিশেষ গুণ এই যে, তা জ্ঞান-পিপাসুদের তৃষ্ণা সহজেই নিবারণ করে। বর্ণগন্ধ চাই শুধু কাব্যের ভাষায়,—কেননা তা হয় অমৃত, নয় সুরা।

আমি বহুকাল হ'তে এই কথা বলে আসছি যে, বাঙলা সাহিত্য বাঙলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত। কিন্তু এই সহজ কথাটি অনেকের কাছে এতই দুর্ব্বোধ ঠেকে যে, তাঁরা এরূপ আজগুবি কথা শুনে বিরক্ত হন। এঁদের মতে, বাঙলা হচ্ছে আমাদের আটপৌরে ভাষা, তাতে সাহিত্যের ভদ্রতা রক্ষা হয় না; সুতরাং সাহিত্যের জন্য সাধুভাষা নামক একটি পোষাকী ভাষা তৈরি করা চাই। পোষাক যখন চাই-ই, তখন তা যত ভারি আর যত জমকালো হয়, ততই ভাল। তাই সাহিত্যিকরা সংস্কৃত ভাষার চোরা-জরিতে কিংখাব বুনতে এতই ব্যগ্র ও এতই ব্যস্ত যে, সে জরি সাচ্চা কি ঝুঁটা, তা দিয়ে তাঁরা কিংখাব দূরে থাক দোসুতিও বুনতে পারেন কি না,—পারলেও সে বুনানিতে ঐ জরি খাপ খায় কি না,—এ সব বিচার করবার তাঁদের সময় নেই। সুতরাং বাঙলা লিখতে বললে তাঁরা মনে করেন যে, আমরা তাঁদের কাব্যের বস্ত্রহরণ করতে উদ্যত হয়েছি। কিন্তু আমরা যে ওরূপ কোনও গর্হিত আচরণ করতে

চাইনে তার প্রমাণ,—ভাষা ভাবের লজ্জা নিবারণ করবার জিনিষ নয়। ভাষা বস্ত্র নয়, ভাবের দেহ,—আলঙ্কারিকদের ভাষায় যাকে বলে "কাব্যশরীর"। বাঙালীর ভাষা বাঙালী চৈতন্যের অধিষ্ঠান। বাঙালীর আত্মাকে সংস্কৃত ভাষার দেহে কেহ প্রবেশ করিয়ে দিলে, ব্যাড়ীর আত্মা নন্দ ভূপতির দেহে প্রবেশ করে' যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছিল,—সেইরূপ হবারই সম্ভাবনা। দরিদ্র ব্রাহ্মণের আত্মা রাজার দেহে প্রবেশ করায় তার যে কি পর্য্যন্ত দুর্গতি হয়েছিল, তার বিস্তৃত ইতিহাস 'কথাসরিৎসাগর'-এ দেখতে পাবেন। বাঙালীর স্কুলে-পড়ানো আত্মা কেন যে নিজের দেহপিঞ্জর হতে নিষ্ক্রমণ করে' পরের পঞ্জরে প্রবেশ লাভ করবার জন্য ছটফট করছে, তার কারণ শাস্ত্রী মহাশয়ই নির্দ্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

"আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি। বিষ্ণু যখন রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোনও ঋষির শাপে তিনি আত্ম-বিস্মৃত ছিলেন।"

আমরাও তেমনি বাঙালী জাতির অজ্ঞান অবতার,—সম্ভবত গুরু-পুরোহিতের শাপে। মুক্তির জন্য আমাদের এই শাপমুক্ত হ'তে হবে, অর্থাৎ জাতিস্মর হতে হবে ;—কেননা সত্য লাভের জন্য যেমন বাহ্যজ্ঞান চাই, তেমনি আত্মজ্ঞানও চাই। এই জাতিস্মরতা লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইতিহাস। একমাত্র ইতিহাস জাতির পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাতীয় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞান হারিয়েই আমরা নিজের ভাষার, মনের ও চরিত্রের জ্ঞান হারিয়েছি।

শাস্ত্রীমহাশয়ের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, এক "আর্য্য"

শব্দের উপর জীবন প্রতিষ্ঠা করতে গেলে, বাঙ্গালীর ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হবে; কেন না আমরা মোক্ষমূলারের আবিষ্কৃত খাঁটি আর্য্য নই। আমরা একটি মিশ্র জাতি। প্রথমত দ্রাবিড় ও মংগলের মিশ্রণে বাঙালী জাতি গঠিত হয়। তারপর সেই জাতির দেহে মনে ও সমাজে কতক পরিমাণ আর্য্যত্ব আরোপিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে' আমরা একেবারে আর্য্যমিশ্র হয়ে উঠিনি। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আর্য্য-সভ্যতা, আবর্ত্তে আবর্ত্তে বাঙলায় এসে পৌঁছেছে। তিনি বলেন—

"এই সকল আবর্ত্ত ঘুরিতে ঘুরিতে যখন বাঙ্গলায় আসিয়া উপনীত হয়, তখন দেখা যায় আর্য্যের মাত্রা বড়ই কম, দেশীর মাত্রা অনেক বেশী।"

এ সত্য আমি নিরাপত্তিতে স্বীকার করি, যদিচ সম্ভবত আমি এই ক্রমাগত আর্য্য আবর্ত্তের একটি ক্ষুদ্র বুদ্বুদ;—কেননা আমি ব্রাহ্মণ।

বাঙলা ভাষা, আর্য্য ভাষা নয়,—উক্ত ভাষার একটি স্বতন্ত্র শাখা,—এক কথায় একটি নবশাখ ভাষা। বাঙালী জাতিও আর্য্যজাতি নয়,—একটি নবশাখ জাতি। আজকাল শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের প্রধান চেষ্টা হয়েছে আমাদের মন ও ভাষার মধ্যে থেকে তার দেশী-খাদটুকু বাদ দিয়ে তার আর্য্য-সোনাটুকু বার করে নেওয়া। প্রথমত ও-রূপ খাদ বাদ দেওয়া সম্ভব নয়; দ্বিতীয়ত সম্ভব হলেও, বড় বেশি যে সোনা মিলবে তাও নয়। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে, দেশী অংশটুকু বাদ দেবার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? ও ত খাদ নয়,—ওই ত হচ্ছে বাঙালীজাতির মূল ধাতু! এবং সে ধাতু যে অবজ্ঞা কিম্বা উপেক্ষা করবার জিনিষ নয়, তা যিনিই বাঙালীর প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান রাখেন, তিনিই মানেন। কাঁঠাল আম নয় বলে' দুঃখ করবারও

কারণ নেই, এবং কাঁঠালের ডালে আমের কলম বসাবার চেষ্টা করবারও দরকার নেই। আমরা এই বাঙলার গায়ে হয় ইংরাজি, নয় সংস্কৃতের কলম বসিয়ে, সাহিত্যে ও জীবনে শুধু কাঁঠালের আমসত্ত্ব তৈরি করবার বৃথা চেষ্টা করছি।

শাস্ত্রীমহাশয় বলেছেন যে, বাঙালী জাতির প্রাচীন সিদ্ধাচার্য্যেরা সব সহজিয়া মতের প্রবর্ত্তক ও প্রচারক ছিলেন। আমরা আত্মজ্ঞানশূন্য বলে' যা আমাদের কাছে সহজ তাই বর্জ্জন করি। আমরা সাধুভাষায় সাহিত্য লিখি, আর জীবনে হয় সাহেবিয়ানা নয় আর্য্যামী করি। জাতীয় আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারলে, আমরা আবার সহজ অর্থাৎ natural হ'তে পারব। মনের এই সহজ-সাধন অতি কঠিন ব্যাপার; কেননা আমাদের সকল শিক্ষা দীক্ষা হচ্ছে কৃত্রিমতার সহায় ও সম্পদ।

(৪)

সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্নমহাশয়ও আমাদের বলেছেন যে—

"আলস্যের প্রশ্রয় দিলে হইবে না। নিদ্রিত সমাজকে জাগাইতে হইবে। শয্যাশয়ান সমাজের সুখসুপ্তি ভাঙ্গাইতে হইবে।"

এ যে শুধু কথার কথা নয়, তার প্রমাণ, কি করে সাহিত্যের সাহায্যে সমাজকে জাগিয়ে তুলতে পারা যায়, তার পন্থা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর মোট কথা এই যে, দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা না করলে সাহিত্য শক্তিহীন ও শ্রীহীন হয়ে পড়ে। তর্করত্নমহাশয়ের মতে "সাহিত্য" শব্দের অর্থ সাহচর্য্য। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন কিসের সাহচর্য্য? তার উত্তর—সকল

প্রকার জ্ঞানের সাহচর্য্য; কারণ অতি প্রবৃদ্ধ অজ্ঞতার গর্ভে যে সাহিত্য জন্মগ্রহণ করে তা সুকুমার সাহিত্য নয়, তা শুধু কুমার-সাহিত্য, অর্থাৎ ছেলেমানুষি লেখা। তিনি দেখিয়েছেন যে কালিদাস প্রভৃতি বড় বড় সংস্কৃত কবিরা সে যুগের সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রমাণ শকুন্তলা—অভিজ্ঞান, অবিজ্ঞান নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের নানা যুক্ত শাস্ত্রের জ্ঞানের অভাব-বশত আমরা সংস্কৃত কাব্য আধ বুঝি, সংস্কৃত দর্শন ভুল বুঝি, পুরাণকে ইতিহাস বলে' গণ্য করি, আর ধর্ম্মশাস্ত্রকে বেদবাক্য বলে মান্য করি।

সে যাই হোক, পাণ্ডিত্য কস্মিন্‌কালেও সাহিত্যের বিরোধী নয়। তার প্রমাণ কালিদাস, দান্তে, মিল্টন, গেটে প্রভৃতি। তবে পণ্ডিত অর্থে যদি বিদ্যার চিনির বলদ বোঝায়, তাহ'লে সে স্বতন্ত্র কথা। জ্ঞানই হচ্ছে কাব্যের ভিত্তি; কারণ সত্যের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত। তর্করত্নমহাশয়ের বক্তব্য এই যে, ইংরাজি ভাষায় যাকে বলে Synthetic Culture, তাই হচ্ছে সাহিত্যের পরম সহায়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। ইউরোপের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতির সঙ্গে কতকটা পরিচয় না থাকলে, কোনো বড় ইংরাজ কবি কিম্বা নভেলিষ্টের লেখা সম্পূর্ণ বোঝাও যায় না, তার রসও আস্বাদন করা যায় না। সাহিত্য হচ্ছে প্রবুদ্ধ চৈতন্যের বিকাশ; এবং চৈতন্যকে জাগিয়ে তুলতে হলে তার উপর আর পাঁচজনের মনের আর পাঁচ রকমের জ্ঞানের ধাক্কা চাই। যাঁর মন সত্যের স্পর্শে সাড়া দেয় না—সে সত্য আধ্যাত্মিকই হোক্ আর আধিভৌতিকই হোক্—তিনি কবি নন। সুতরাং দর্শন বিজ্ঞানকে অস্পৃশ্য করে' তোলায় কাব্যের পবিত্রতা রক্ষা হয় না। এই

কারণেই তর্করত্নমহাশয় আমাদের দেশী বিলাতি সকল প্রকার দর্শন বিজ্ঞান অনুবাদ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর মতে আলস্যপ্রিয় বাঙালীমনের পক্ষে বিজ্ঞানচর্চ্চারূপ মানসিক ব্যায়াম হচ্ছে অত্যাবশ্যক। আমাদের অলস মনের আরাম-জনক বিশ্বাস-সকল বিজ্ঞানের অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ না হলে সত্যের খাঁটি সোনাতে তা পরিণত হবে না,—আর যা খাঁটি সোনা নয়, তার অলঙ্কার ধারণ করলে কাব্যের দেহও কলঙ্কিত হয়।

(৫)

এবারকার সাহিত্য-সম্মিলনের ফলে যদি বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের মিলন হয়,—তা হলে বঙ্গসাহিত্যের দেহ ও কান্তি দুই-ই পুষ্ট হবে। সে মিলন যে কবে হবে তা জানিনে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে আমাদের ভাবের ও ভাষার বিচ্ছেদটি যে বহু লোকের নিকট অসহ্য হয়ে উঠেছে,—এইটি হচ্ছে মহা আশার কথা। মিথ্যার প্রতি আগে বিরাগ না জন্মালে কেউ সত্যের উদ্দেশে তীর্থযাত্রা করেন না; কারণ, সে পথে কষ্ট আছে। বিজ্ঞানের মন্দিরে, অর্থাৎ সত্যের মান-মন্দিরে পৌঁছতে হলে আগাগোড়া সিঁড়ি ভাঙ্গা চাই।

আমি বৈজ্ঞানিক নই,—কাজেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানই আমার মনের প্রধান সম্বল। সেই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্যেরা কেউ দু'টি ভাল কথা বলেননি। তাই আমি তার স্বপক্ষে কিছু বলতে বাধ্য হচ্ছি।

বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অতিরিক্ত হলেও ঐ মূল জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বাহ্য বস্তুকে ইন্দ্রিয়গোচর করতে হ'লে,

ইন্দ্রিয়েরও একটা শিক্ষা চাই। অনেকে চোখ থাকতেও কাণা, কান থাকতেও কালা,—অথচ মুখ না থাকলেও মূক নন। এই শ্রেণীর লোকের বাচালতার গুণেই আজ বাঙলা-সাহিত্যের কোন মর্য্যাদা নেই। কাব্যকে আবার সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার *করতে হলে, ইন্দ্রিয়কে আবার সজাগ করে' তোলা চাই। চোখও বাহ্যবস্তুসম্বন্ধে আমাদের ঠকাতে পারে, যদি সে চোখ ঘুমে ঢোলে।* অপরপক্ষে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে' চেয়ে থাকলেও, যা স্পষ্ট তাও আমাদের কাছে ঝাপ্‌সা হয়ে যায়। চোখে আর মনে এক না করতে পারলে, কোনও পদার্থ লক্ষ্য করা যায় না। ইন্দ্রিয় ও মনের এই একীকরণ, সাধনা বিনা সিদ্ধ হয় না। যাঁরা কাব্য রচনা করবেন, তাঁদের পক্ষে বাহিরের ভিতরের সকল সত্যকে প্রত্যক্ষ করবার ক্ষমতা অর্জ্জন করতে হবে। কারণ কাব্যে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অপর কোনও সত্যের স্থান নেই। সুতরাং প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের উপর অবিশ্বাস এবং তার প্রতি অমনোযোগ হচ্ছে কাব্যে সকল সর্ব্বনাশের মূল। প্রত্যক্ষ-জ্ঞান অবশ্য নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা বিজ্ঞানে পরিণত হয়। বিজ্ঞানও তেমনি নিজের সীমা লঙ্ঘন করলে মিথ্যা তত্ত্বজ্ঞানে পরিণত হয়। তার কারণ, বিজ্ঞান কোনও পদার্থকে এক-হিসেবে দেখতে পারে না। বিজ্ঞান যে সমষ্টি খোঁজে, সে হচ্ছে সংখ্যার সমষ্টি। বিজ্ঞান চারকে এক করতে পারে না। বিজ্ঞান চারকে পাওয়ামাত্র,—হয় তাকে দুই দিয়ে ভাগ করে, নয় তার থেকে দুই বিয়োগ করে; পরে আবার হয় দুই দ্বিগুণে, নয় দুয়ে দুয়ে চার করে। অর্থাৎ বিজ্ঞান যার উপর হস্তক্ষেপ করে, তাকে আগে ভাঙ্গে, পরে আবার যোড়াতাড়া দিয়ে গড়ে। উদাহরণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, বিজ্ঞানের হাতে জল

হয় বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, নয় বরফ হয়ে জমে থাকে,—আর না হয়ত একভাগ অক্সিজেন আর দুভাগ হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারপর বিজ্ঞান আবার সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করে', সেই বরফকে তাতিয়ে জল করে দেয়, এবং অক্সিজেনে হাইড্রোজেনে *পুনর্ম্মিলন* করে দেয়।

কিন্তু আমরা এক-নজরে যা দেখতে পাই, তাই হচ্ছে প্রত্যক্ষ জ্ঞান;—এ জ্ঞানও একের জ্ঞান,—এতএব প্রত্যক্ষজ্ঞান হচ্ছে তত্ত্বজ্ঞানের সবর্ণ। "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ"—এ কথা তাঁরি কাছে সত্য, যাঁর কাছে এটি প্রত্যক্ষ সত্য। কেননা, কোনরূপ আঁকের সাহায্যে কিম্বা মাপের সাহায্যে ও-সত্য পাওয়া যায় না। একত্বের জ্ঞান কেবলমাত্র অনুভূতিসাপেক্ষ।

আমি পূর্ব্বে বলেছি প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রামে মনঃসংযোগ করা চাই,—সেই মনঃসংযোগের জন্য আন্তরিক ইচ্ছা চাই,—এবং সেই ইচ্ছার মূলে আন্তরিক অনুরাগ চাই। এবং এ অনুরাগ অহৈতুকী প্রীতি হওয়া চাই। কোনরূপ স্বার্থসাধনের জন্য যে সত্য আমরা খুঁজি, তা কখনও সুন্দর হয়ে দেখা দেয় না। যে প্রীতির মূলে আমার সহজ প্রবৃত্তি নেই, তা কখনও অহৈতুকী হ'তে পারে না। সুতরাং সত্য যে সুন্দর, এই জ্ঞানলাভের উপায় হচ্ছে সহজ সাধন, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন সাধন;—কারণ আত্মার উপর বিশ্বাস আমরা হারিয়েছি।

সে যাই হোক, বিজ্ঞানের অবিরোধে যে প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের চর্চ্চা করা যায়, এ বিশ্বাস হারালে আমরা কাব্য-শিল্প সৃষ্টি করতে পারি নে। বিজ্ঞান হচ্ছে পূর্ব্ব-সৃষ্ট পদার্থের জ্ঞান। নূতন সৃষ্টির হিসাব, বিজ্ঞানের পাকাখাতায় পাওয়া যায় না।

সৃষ্টির মূলে যে চির-রহস্য আছে, তা কোনরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রে ধরা পড়ে না। এই কারণে দেশের লোককে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করবার পরামর্শ দেওয়াটা সৎপরামর্শ, কেননা যা স্পষ্ট তাতে সর্ব্বসাধারণের সমান অধিকার আছে। অপরপক্ষে কাব্যে শিল্পে অধিকারীভেদ আছে। সত্যের মূর্ত্তিদর্শন সকলের ভাগ্যে ঘটে না।

, ১৩২১ সন।

ভারতবর্ষের ঐক্য।

—:০:—

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত নামে পুস্তিকা-আকারে ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দিবারাত্র জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন তাঁদের পক্ষে, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই পক্ষে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্বদেশ কিম্বা স্বজাতির নাম উল্লেখ করবামাত্রই, একদলের লোক আমাদের মুখ-ছোপ দিয়ে বলেন—ও সব কথা উচ্চারণ করবার তোমাদের অধিকার নেই, কেননা ভারতবর্ষ বলে' কোন একটা বিশেষ দেশ নেই, এবং ভারতবাসী বলে' কোন-একটা বিশেষ জাতি নেই। ভারতবর্ষের অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর-অসংযুক্ত নানা খণ্ড দেশ, এবং ভারতবাসীর অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-সম্পর্কহীন নানা ভিন্ন জাতি।

ভারতবর্ষ যে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্য পায়ে হেটে তীর্থ-পর্য্যটন করবার দরকার নেই। একবার এ দেশের মানচিত্রখানির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের শ্রান্তি বোধ হয়, এবং শরীর না হোক, মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে অগণ্য, আর এই কোটি কোটি লোক যে জাতি ধর্ম্ম ও ভাষায় শত শত ভাগে বিভক্ত, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্যও সেন্সস্ রিপোর্ট পড়বার আবশ্যক নেই; চোখ কান খোলা থাকলেই তা আমাদের কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের যে ঐক্য নেই, এ কথাও যেমন সত্য—আমাদের মনে যে ঐক্যের আশা আছে, সে কথাও তেমনি সত্য। এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ-যুগের শিক্ষিত লোকের Utopia, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্ব্বপুরী। সে পুরী আকাশে ঝোলে এবং সকলের নিকট তা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যিনি একবার সে পুরীর মর্ম্মর প্রাচীর, মণিময় তোরণ, রজত সৌধ ও কনকচূড়ার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন—তিনি আকাশরাজ্য হ'তে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। অনেকের মতে দিবাস্বপ্ন দেখাটা নিন্দনীয়, কেননা ও-ব্যাপারে শুধু অলীকের সাধনা করা হয়। মানুষে কিন্তু, বাস্তবজগতের অজ্ঞতাবশত নয়, তার প্রতি অসন্তোষবশতই, চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখে; সে স্বপ্নের মূল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত। এবং ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আজকের কল্পনা-রাজ্য কখন কখন কালকের বাস্তবজগতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দিবাস্বপ্ন কখন কখন ফলে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন জাতীয়-জীবনের লক্ষ্য করে তোলা—অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং সকলের পক্ষেই আবশ্যক। সমগ্র সমাজের বিশেষ-একটা-কোন লক্ষ্য না থাকায়, দিন দিন আমাদের সামাজিক জীবন নির্জ্জীব, এবং ব্যক্তিগত জীবন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে। পূর্ব্বে যে ঐক্যের কথা বলা গেল, তা অবশ্য ideal unity, এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে এক-ভারতবর্ষ একটি বিরাট ideal-রূপেই বিরাজ করছে। আমাদের বাঞ্ছিত Utopia ভবিষ্যতের অঙ্কস্থ রয়েছে।

কিন্তু এই ideal-কে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক থেকে নিত্যই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এক দিকে ইংরাজি সংবাদ-

পত্র, অপর দিকে বাঙলা সংবাদপত্র, এই ideal-টিকে নিতান্ত উপহাসের পদার্থ মনে করেন। উভয়েই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করেন। ইংরাজি কাগজওয়ালাদের মতে এই মনোভাবটি বিদেশীশিক্ষালব্ধ, এবং সেই জন্যই স্বদেশী-ভিত্তি-হীন—কেননা ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। ইংরাজি সংবাদপত্রের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল এক নয়—বহু; এবং যা গোড়া হতেই পৃথক, তার আর কোনরূপ মিলন সম্ভব নয়। কুকুর আর বেড়াল নিয়ে এক-সমাজ গড়ে তোলা যায় না; ও দুই শ্রেণীর জীব শুধু গৃহস্বামীর চাবুকের ভয়ে একসঙ্গে ঘর করতে পারে। অপরপক্ষে বাঙলা সংবাদ-পত্রের মতে হিন্দুসমাজের বিশেষত্বই এই যে, তা বিভক্ত। এ সমাজ সতরঞ্চের ঘরের মত ছক-কাটা। এবং কার কোন্ ছক, তাও অতি সুনির্দ্দিষ্ট। এই সমাজের ঘরে, কে সিধে চলবে, কে কোণাকুণি চলবে, কে এক-পা চলবে, আর কে আড়াই-পা চলবে, তারও বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এর নাম হচ্ছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। নিজের নিজের গণ্ডির ভিতর অবস্থিতি করে নিজের নিজের চাল রক্ষা করাই হচ্ছে ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং যাঁরা সেই দাবার ঘরের রেখাগুলি মুছে দিয়ে সমগ্র সমাজকে একঘরে করতে চান, তাঁরা দেশের শত্রু। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে ঐক্য চান, তা ভারতবর্ষের ধাতে নেই—সুতরাং জাতির উন্নতির যে ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান, তাতে শুধু সামাজিক অরাজকতার সৃষ্টি করা হবে। সমাজের সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডিগুলি তুলে দিলে সমাজ-তরী কোণাকুণি চলে' তীরে আট্‌কে যাবে, এবং সমাজের ঘোড়া আড়াই-পা'র পরিবর্ত্তে চার পা, তুলে ছুটবে। এ অবশ্য মহা বিপদের কথা। সুতরাং ভারতবর্ষের

অতীতে এই ঐক্যের ideal-এর ভিত্তি আছে কিনা, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এই কারণেই সম্ভবত রাধাকুমুদবাবু দু'হাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁড়ে, সেই ভিত বার করবার চেষ্টা করেছেন, যার উপরে সেই কাম্যবস্তুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এ যে অতি সাধু উদ্দেশ্য সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

(২)

রাধাকুমুদবাবু জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল যে প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য তিনি আমার নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনেকে, দেখতে পাই, এই ঐক্যের সন্ধান, ঐতিহাসিক সত্যে নয়, দার্শনিক তথ্যে লাভ করেন। এ শ্রেণীর লোকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত; কেননা অদ্বৈতবাদে সকল অনৈক্য তিরস্কৃত হয়। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের বিব্রত করে তুলেছি, তার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে করা হয়নি; বরং ঐ দর্শন থেকেই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাচীন যুগে জাতীয় জীবনে কোনও ঐক্য ছিল না। মানব-জীবনের সঙ্গে মানব-মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাব্যের মত দর্শনও জীবন-বৃক্ষের ফুল; তবে এ ফুল এত সূক্ষ্ম বৃন্তে ভর করে' এত উচ্চে ফুটে ওঠে যে, হঠাৎ দেখতে তা আকাশ-কুসুম বলে ভ্রম হয়। আমার বিশ্বাস একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বর-বাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে, বিশ্বকে একটি দেশ হিসেবে, এবং ভগবানকে তার অদ্বিতীয় শাসন ও পালনকর্ত্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ। অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানারাজ্যে বিভক্ত,

এবং বহু রাজা উপ-রাজার শাসনাধীন, সে দেশের লোকের পক্ষে আকাশ-দেশে বহু দেবতা এবং উপ-দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণত মানুষে, মর্ত্ত্যের ভিত্তির উপরেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে। যে দেশের পূর্ব্বপক্ষ একেশ্বরবাদী, সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক,--এবং যে দেশের পূর্ব্ব-পক্ষ বহু-দেবতাবাদী, সে দেশের উত্তর পক্ষ অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বহুর ভিতর এক দেখেন না; কিন্তু বহুকে মায়া বলে' তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং উত্তর-মীমাংসার সার-কথা "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এই অর্দ্ধ শ্লোকে যে বলা হয়েছে, তার আর সন্দেহ নেই। এই কারণেই বেদান্তদর্শন সাংখ্যদর্শনের প্রধান বিরোধী। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু শূন্য। সুতরাং মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ, এবং শঙ্কর যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ—এই প্রাচীন অভিযোগের মূলে কতকটা সত্য আছে। যে একাত্মজ্ঞান কর্ম্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মার যতটা চর্চ্চা করা হয়, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চর্চ্চা ততটা করা হয় না। আরণ্যক ধর্ম্ম যে সামাজিক, এ কথা শুধু ইংরাজি-শিক্ষিত নাগরিকেরাই বলতে পারেন। সমাজ-ত্যাগ করাই যে সন্ন্যাসের প্রথম সাধনা, এ কথা বিস্মৃত হবার ভিতর যথেষ্ট আরাম আছে।

সোহং হচ্ছে Individualism-এর চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্তমত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে দিয়েছে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ করে ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি,—প্রতিহত হয়েছে। বেদান্ত-

দর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়,— প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সঙ্কীর্ণ কর্ম্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ, বিষয়-জ্ঞানের বিরুদ্ধে আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবাদ ;—এক কথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে, জীবের এই স্বরাট-জ্ঞান শুধু বিরাট অহঙ্কার মাত্র। সুতরাং যে সূত্রে এ কালের লোকেরা জাতিকে একতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান তা ব্রহ্মসূত্র নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা ঢের স্থূল জীবন-সূত্র।

কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে, বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি না করতে পারায় এ কালের অদ্বৈতবাদীরা চোগা-চাপকান পরে আপিসে যান। উভয়ের ভিতর মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী, আর একজন শুধু উদাসীন,—পরের সম্বন্ধে।

রাধাকুমুদবাবুর প্রবন্ধের প্রধান মর্য্যাদা এই যে, তিনি ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবন-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছেন সেইটেই বিচার্য্য। ভবিষ্যতের শূন্যদেশে যা-খুসি-তাই স্থাপনা করবার যে স্বাধীনতা মানুষের আছে, অতীত সম্বন্ধে তা নেই। ভবিষ্যতে সবই সম্ভব হতে পারে, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে তার আর একচুলও বদল হতে পারে না। কল্পনার প্রকৃত লীলাভূমি ভূত নয়, ভবিষ্যৎ। আকাশে আশার গোলাপ ফুল অথবা নৈরাশ্যের সরষের ফুল দেখবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে ; কিন্তু অতীত ফুলের নয়, মূলের দেশ। যে মূল আমরা খুঁজে বার করতে চাই তা সেখানে পাই ত ভালই ; না পাই ত, না পাই।

(৩)

জীবের অহং-জ্ঞান যেমন একটি দেহ আশ্রয় করে থাকে জাতির অহং-জ্ঞানও তেমনি একটি দেশ আশ্রয় করে থাকে। মানুষের যেমন দেহাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল, জাতির পক্ষেও তেমনি দেশাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল ভারতবাসীর মনে এই দেশাত্ম-জ্ঞান যে অতি প্রাচীনকালে জন্ম-লাভ করেছিল, রাধাকুমুদবাবু নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগের বলে তাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ মহাদেশ হ'লেও যে একদেশ, এবং ভারতবাসীদের যে সেটি স্বদেশ, এ সত্যটি অন্তত দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হ'য়েছিল।

উত্তরে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের প্রাকার, এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের পরিখা যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য সকল ভূভাগ হতে বিশেষরূপে পৃথক ও স্বতন্ত্র করে রেখেছে, এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য। তারপর, এদেশ অসংখ্য যোজন বিস্তৃত হলেও সমতল; এত সমতল যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক-ক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিন্ধ্যাচল সম্ভবত এ মহাদেশকে দুটি চির-বিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত, যদি অগস্ত্যের আদেশে সে চিরদিনের জন্য নতশির হ'য়ে থাকতে বাধ্য না হ'ত। রাধা-কুমুদবাবু দেখিয়েছেন যে, এই স্বদেশ-জ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান নয়, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে জড়িত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে পুণ্যভূমি ;—সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র, প্রতি নদী—তীর্থ, প্রতি পর্ব্বত—দেবাত্মা। কিন্তু এই ভক্তি-ভাব আর্য্য মনোভাব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদ হতে পঞ্চ-

নদের আবাহনস্বরূপ একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে রাধাকুমুদ-বাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্ব্বপ্রথমে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈদিক মনোভাব যে ক্রমে বৃদ্ধি এবং বিস্তার লাভ করে' শেষে লৌকিক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, বৈদিক ধর্ম্ম নয়, লৌকিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্ম; বিদেশী বিজেতা-আর্য্যদের ধর্ম্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। সে ধর্ম্ম আকাশ থেকে পড়েনি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে, সেই হচ্ছে অন্নদা, এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রস-সঞ্চার করে, সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ। সীতার মত এ সকল দেবতা হলমুখে ধরণী হতে উত্থিত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিমা মাটির দেহ ধারণ করে এবং জলে তার বিসর্জ্জন হয়। "তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে" একথা মোটেই বৈদিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। কেননা, পঞ্চনদ-বাসী আর্য্যেরা মন্দিরও গড়াতেন না, প্রতিমাও পূজা করতেন না। এই দেশভক্তি পৌরাণিক সাহিত্যে অতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে যে বৌদ্ধযুগ ছিল, সেই যুগেই এই স্বদেশ-জ্ঞান ও স্বদেশ-প্রীতি ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম অবৈদিক ধর্ম্ম, এবং সার্ব্বজনীন বলে' তা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। অপর পক্ষে বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যদের গৃহধর্ম্ম, বড়জোর কুলধর্ম্ম। সমগ্র দেশকে

একাত্ম করবার ক্ষমতা সে ধর্ম্মের ছিল না। যেমন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সুরেরা এক ঈশাণকোণ ব্যতীত আর সকল-দিকেই পরাস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবত ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ-প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা দেশজ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই পরাস্ত হয়েছিলেন। অন্তত আকাশের দেবতারা যে, মাটির দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম। বৈদিক ও লৌকিক মনোভাবের মিশ্রণে এই নবধর্ম্মভাবের জন্ম। আর্য্যেরা যে কস্মিনকালেও সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলে স্বীকার করতে চাননি, তার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় মনু-সংহিতা লিখিত হয়। এই সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং আর্য্যাবর্ত্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে ঘৃণ্য ম্লেচ্ছদেশ। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন যে, দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিম্বা আর্য্যত্ব-গুণ নেই। যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মনিরত আর্য্যেরা বাস করেন, সেই হচ্ছে আর্য্যভূমি,—বাদবাকি সব ম্লেচ্ছদেশ। আর্য্য-দের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশ-জ্ঞানের প্রতিকূল ছিল। পঞ্চনদের পঞ্চনদীর উল্লেখ করে তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বৈদিক ঋষিরা যে গণ্ডূষ করতেন, সে কতকটা সেই ভাবে, যে ভাবে একালে বিলাতী-আর্য্যেরা মহোৎসবের ভোজনান্তে "The Land we live in"-এর নামোচ্চারণ করে সুরায় আচমন করেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির মনে দেশ-প্রীতির চাইতে আত্ম-প্রীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। প্রতি দেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাই ছিল তাঁদের স্বধর্ম্ম। রাধাকুমুদবাবু এমন কোন বিরুদ্ধ-প্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যা'তে করে' আমার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হতে পারে।

(৪)

ইংরাজ যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মানচিত্র লালবর্ণে চিত্রিত করেছেন তা নয়; আজ দু-হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে অশোকও একবার ঐ মানচিত্র গেরুয়া-রঙে রঞ্জিত করেছিলেন। একথা শিক্ষিত লোকমাত্রেরই জানা না থাক, শোনা আছে। যা সুপরিচিত তার আর নূতন করে আবিষ্কার করা চলে না, সুতরাং রাধাকুমুদবাবু প্রাচীন ভারতের এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন,—তাঁর পুস্তিকার মৌলিকতা এইখানেই। সুতরাং তিনি অনুসন্ধানের ফলে যে নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা বিনা পরীক্ষায় গ্রাহ্য করা যায় না।

শাস্ত্রকারেরা বেদকে স্মৃতির মূল বলে' উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু বেদ যে শূদ্ররীতি কিম্বা বৌদ্ধনীতির মূল, এ কথা তাঁরা কখনও মুখে আনেন নি; বরং বৌদ্ধাচার্য্যেরা যখন বেদের কোন উৎসন্ন শাখা থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভূত হয়েছে এই দাবী করতেন, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কানে হাত দিতেন। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, ইতিহাস যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় দেয়, তা বৌদ্ধযুগে ব্রাত্যদেশে শূদ্র-ভূপতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধের নন্দবংশও শূদ্রবংশ, মৌর্য্যবংশও শূদ্রবংশ ছিল। এবং অশোক, সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু রাজচক্র নয়, ধর্ম্মচক্রেরও স্থাপনা করে, সসাগরা বসুন্ধরার সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক-মনে পাওয়া যাবে কি না—সে বিষয়ে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে কোন একরাটের পরিচয় ইতিহাস দেয় না। কিন্তু ইতিহাসের পশ্চাতে কিম্বদন্তী আছে,—সেই কিম্ব-

দন্তীর সাহায্যে, দেশের বিশেষ-কোন ঘটনা না হোক্, জাতির বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আমরা পেতে পারি। রাধাকুমুদ বাবু ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে রাজনীতিসম্বন্ধে আর্য্যজাতির মনোভাব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন।

রাধাকুমুদবাবুর দাখিলি বৈদিক-দলিলগুলির কোন তারিখ নেই—সুতরাং তার সবগুলি যে মাগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল, তা বলা যায় না; অতএব কোন বিশেষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক-সাহিত্যের অন্তর্ভূর্ত হলেও তার প্রতি বাক্য যে বৈদিক মনোভাবের পরিচয় দেয় এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। ওরূপ দলিলের বলে, তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। বিশেষত যখন তাঁর সংগৃহীত দলিল তাঁর মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। রাধাকুমুদবাবুর প্রধান দলিল হচ্ছে "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"। ঐ গ্রন্থেই তিনি সাম্রাজ্য শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং সেই শব্দই হচ্ছে তাঁর মতের মূলভিত্তি। উক্ত ব্রাহ্মণের একখানি বাঙলা অনুবাদ আছে; তারি সাহায্যে রাধাকুমুদবাবুর মত যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। "সম্রাট" কাকে বলে' তার পরিচয় ঐ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান-অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন, অভিষেকের পর তাঁহারা "সম্রাট" নামে অভিহিত হন"।—("ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" ৩৮শ অধ্যায়)।

রাধাকুমুদবাবু বলেন যে, এ-স্থলে মাগধ-সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর উক্ত অনুমান গ্রাহ্য হয়, তাহ'লে প্রাচীন ভারত-সাম্রাজ্যের বৈদিক ভিত্তি ঐ এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এ নানারূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যথা—রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মহারাজ্য ইত্যাদি। রাধাকুমুদবাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঐ সকল নাম উচ্চ-নীচ-হিসাবে একরাটের অধীন ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণগ্রন্থেই প্রমাণ আছে যে, ঐ সকল নাম হচ্ছে পৃথক পৃথক দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নাম। তার সকল-দেশই পঞ্চনদের বহির্ভূত, কোন কোন দেশ ভারতবর্ষেরও বহির্ভূত, এবং বিশেষ করে একটি দেশ পৃথিবীর বহির্ভূত। যথা—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের রাজা—সম্রাট। দক্ষিণদিকে সত্বৎগণের রাজা—ভোজী। পশ্চিমদিকে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজা স্বরাট। উত্তর-দিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়, অভিষেকের পরে তাহারা বিরাট নামে অভিহিত হয়। মধ্যমদেশে সবশ উশীনরগণের ও কুরুপাঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন তাহারা রাজা নামে অভিহিত হন। এবং উর্দ্ধদেশে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র পারমেষ্ঠ্য লাভ করিয়াছিলেন।"

উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, দেশ-ভেদ-অনুসারে সে যুগের রাজাদের নামভেদ হয়েছিল,—পদমর্য্যাদা অনুসারে নয়। উক্ত ব্রাহ্মণে একরাট শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে একরাট, একসঙ্গে স্বরাট, বিরাট, সম্রাট, সব রাট হতে পারতেন,—অর্থাৎ তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশ-দেশের রাজা হতে পারতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ একরাটের নিকট ভারতবর্ষের একরাষ্ট্রীয়তার সন্ধান নিতে যাওয়া বৃথা।

আসল কথা এই যে, রাজনীতি অর্থে আমরা যা বুঝি ও চাণক্য যা বুঝতেন—ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই। ব্রাহ্ম-

পেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুনরভিষেক, ঐন্দ্র মহাভিষেক,—এ সব হচ্ছে যজ্ঞ। এবং এ সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজ্যস্থাপনা নয়, পুরোহিতকে ভূরি দান করানো এবং ঐরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজমানের অভ্যুদয় সাধিত হ'তে পারে, তাই প্রমাণ করা। রাধাকুমুদবাবু তাঁর পুস্তিকাতে, পুরাকালে যাঁরা একরাট পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের নামের একটি লম্বা ফর্দ্দ "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" হ'তে তুলেছিলেন। সম্ভবত তিনি উক্ত রাজাগণের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্য লাভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে মনে করেন, কিন্তু আমরা তা পারিনে, কারণ উক্ত ব্রাহ্মণের মতে, ঐন্দ্র মহাভিষেকের বলেই প্রাচীন রাজারা ঐ ইন্দ্র-বাঞ্ছিত পদলাভ করেছিলেন। মন্ত্রবলে এবং যজ্ঞফলে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকার দরুণ আমরা উক্ত রাজযজমানদের ঐরূপ আত্যন্তিক অভ্যুদয়, এবং রাজ-পুরোহিতদের তদনুরূপ দক্ষিণালাভের ইতিহাসে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারিনে। রাধাকুমুদবাবু নামের ফর্দ্দের পাশাপাশি যদি দানের ফর্দ্দটি তুলে দিতেন, তাহ'লে পাঠকমাত্রেই "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এর কথা কতদূর প্রামাণ্য, তাহা সহজেই বুঝতে পারতেন। ঐন্দ্র মহাভিষেক উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিতরূপ দান করা হত—

বদ্ধ শতকোটী গাভীর মধ্যে প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সবনে দুই দুই সহস্র। আটাশী হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য শ্বেত অশ্ব। এদেশ ওদেশ হইতে আনীত নিষ্ককণ্ঠী আঢ্য দুহিতার মধ্যে দশ সহস্র।

এরূপ দানের দাতা দুর্লভ হ'লেও, গ্রহীতা আরও বেশি দুর্লভ। এত গরু এত ঘোড়া এত বনিতা রাখি কোথায় আর খাওয়াই কি, এ প্রশ্ন বোধ হয় দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনে উদিত হ'ত। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, সে যুগে এমন বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন যাঁদের নিজেদের কোষ-বৃদ্ধি, এবং অধিকার-বৃদ্ধির প্রতি

লোভ ছিল, এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের তন্তর-মন্তর-যাদুতে বিশ্বাস করতেন। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এ যে সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে তা ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল দ্বারা নয়—ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলের দ্বারা লাভ করবার বস্তু। কারণ শত্রু নাশের জন্য তাঁদের যুদ্ধ করা আবশ্যক হ'ত না, ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হ'ত। এই অতীত সাহিত্যের ভিত্তির উপর যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তাহলে আমাদের মনোজগতের গন্ধর্ব্বপুরী চিরকাল আকাশেই ঝুলবে।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরোনো বোতলে ঢালছি। আমরা Spencer-এর বিলেতি মদ শঙ্করের বোতলে ঢালি, Comte-এর ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি, এবং তাই যুগসঞ্চিত সোমরস বলে' পান করে' তৃপ্তিও লাভ করি, মোহও প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই ঢালা-ঢালি এবং ঢলাঢলিরও একটা সীমা আছে। Bismarck-এর জর্ম্মান মদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের চমসে ঢালতে গেলে আমরা সে সীমা পেরিয়ে যাই। ও-হাতায় এ জিনিষ কিছুতেই ধরবে না। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের আধিদৈবিক ব্যাপার সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি, এবং চাই কি তাতে কৃতকার্য্যও হতে পারি,—কিন্তু শুধু ইংরাজি শিক্ষা নয়, তদুপরি ইংরাজি ভাষার সাহায্যেও তার "আধিরাষ্ট্রিক" ব্যাখ্যা করতে পারিনে।

(৫)

এতদিন, প্রাচীন ভারতের নাম উল্লেখ করবামাত্রই, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন, এই সকল কথাই আমাদের স্মরণ-

পথে উদিত হ'ত, এবং বঙ্গসাহিত্যে তারই গুণকীর্ত্তন করে আমরা যশ ও খ্যাতি লাভ করতুম। Imperialism-নামক আহেল-বিলাতি পদার্থ পুরাকালে এদেশে ছিল, এরূপ কথা পূর্ব্বে কেউ বললে তার উপর আমরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠতুম, কেননা ওরূপ কথা আমাদের দেশ-ভক্তিতে আঘাত করত। বৈরাগ্যের দেশ ঐহিক ঐশ্বর্য্যের স্পর্শে কলুষিত হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ যে নব দেশভক্তি ঐ Imperialism-এর উপর এত ঝুঁকেছে, তার একমাত্র কারণ কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের আবিষ্কার। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, ইউরোপীয় রাজনীতির যা শেষ কথা ভারতবর্ষের রাজনীতির তাই প্রথম কথা। এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে আমাদের চোখ এতই ঝল্‌সে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে, সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিরূপ দেখছি। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের চোখ যখন আবার প্রকৃতিস্থ হবে, তখন আমরা এই প্রাচীন Imperialism-কেও খুঁটিয়ে দেখতে পারব, এবং কৌটিল্যকেও জেরা করতে শিখব। ইতিমধ্যে এই কথাটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মহাভারত রচনা করেছিলেন,—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু তারই ভাষ্য। যে মনোভাবের উপর সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মনোভাব বৈদিক নয়, সম্ভবত আর্য্যও নয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত অর্থ-শাস্ত্রকারের মানসিক প্রকৃতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের প্রকৃতি এক নয়। সে পার্থক্য যে কোথায় ও কতখানি তা আমি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দেব।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্ম শব্দের অর্থ Law, এবং শাস্ত্রকারদের

মতে এই law-এর মূল হচ্ছে বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি। রাজশাসন অর্থাৎ legislation যে ধর্ম্মের মূল হতে পারে, এ কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নি। রাজা ধর্ম্মের রক্ষক, স্রষ্টা নন। অপরপক্ষে কৌটিল্যের মতে রাজশাসন সকল-ধর্ম্মের উপরে। এ কথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনই মেনে নেন নি,—কেননা তাঁদের মতে ধর্ম্মের মূল হচ্ছে বেদ; অতএব ধর্ম্ম অপৌরুষেয়। তার পরে আসে স্মৃতি, অর্থাৎ আর্য্য ঋষিদের স্মৃতি,—তার পর সদাচার, অর্থাৎ আর্য্যদের কুলাচার,—তার পর আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মতুষ্টি। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে—"পারম্পর্য্যক্রমাগত" আর্য্য-আচারই একমাত্র এবং সমগ্র Law. যাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চাণক্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতি কখনই স্বচ্ছন্দ মনে গ্রাহ্য করতেন না। সম্ভবত এই কারণেই, চাণক্য নিজে ব্রাহ্মণ হ'লেও, সংস্কৃত সাহিত্যে হিংসা প্রতিহিংসা ক্রোধ দ্বেষ ক্রূরতা ও কুটিলতার অবতার-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন, এবং একই কারণে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁর অনাদৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সকল কারণ আমরা অবগত নই। যখন সে ইতিহাস আবিস্কৃত হবে, তখন সম্ভবত আমরা দেখতে পাব যে, এ ধ্বংস-ব্যাপারে বৈদিক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট হাত ছিল।

এ কথা বোধহয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্য্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্য-গঠনে নয়—সমাজ-গঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে-বাণিজ্যে নয়—চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হলে "পৃথিবীর সর্ব্ব-মানবকে" আর্য্য-আচার শিক্ষা দেওয়া, এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র

ভারতবাসীকে এক-সমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দু সমাজের যা-কিছু গঠন আছে তা আর্য্য-দের গুণে, এবং যা-কিছু জড়তা আছে তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্য তাঁরা যে দুর্গ-গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, অভিধানে, ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি,—যে ভাষার তুলনা জগতে নেই, সেই সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এ দেশের প্রাচীন আর্য্যেরা যে, সাম্রাজ্যের চাইতে সমাজকে, এবং সমাজের চাইতেও মানুষের আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তার জন্য সমাজের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই; কারণ বর্ত্তমানে ইউরোপের মনেও এ ধারণা হয়েছে যে, Political problems-এর অপেক্ষা Social problems-এর মূল্য কিছু কম নয়। এবং শাসনযন্ত্রের চাইতে মানুষের মূল্য ঢের বেশি।

আষাঢ়, ১৩২১ সন।

ইউরোপে কুরুক্ষেত্র।

—:০:—

ইউরোপে আজ যে কুরুক্ষেত্র বেধেছে, সেটি তত আশ্চর্য্যের বিষয় নয়,—আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কাল তা বাধেনি। যে দেশের আপামরসাধারণ সকলেই সশস্ত্র,— সে দেশে "দিন যায় ক্ষণ যায় না" এ বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে ইউরোপের প্রতি রাজ্যের প্রায় সমগ্র রাষ্ট্রশক্তি যুদ্ধের অনুষ্ঠান এবং যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয়িত হয়েছে। দেবতার আরাধনা নয়, বিজ্ঞানের সাধনা করে' ইউরোপ যে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র লাভ করেছে, তা এদেশের পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিকদের উদ্দাম কল্পনারও অতীত। মানুষ-মার্‌বার এমন কল মানুষের হাতে পূর্ব্বে কখন তৈরি হয় নি। সে কল মাটির উপর ছুটে বেড়ায়, সুড়ঙ্গ-পথে প্রবেশ করে, জলে ভাসে, ডুব-সাঁতার দেয়, পাখীর মত আকাশে ওড়ে, বাজের মত মাথায় ভেঙে পড়ে। আর এই সকল কল চালাবার জন্য লক্ষ লক্ষ স্থলচর সৈন্য, সহস্র সহস্র জলচর সৈন্য এবং শত শত খেচর সৈন্যের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে এতদিন ধরে' ইউরোপের বাহিরে শান্তি থাকলেও, অন্তরে শান্তি ছিল না। যুদ্ধের এই বিরাট আয়োজন ইউরোপে সকল জাতির মনে একটি সর্ব্বনাশী মারী-ভয়ের মত চেপে ছিল। জীবনের আলোর পাশে এই মৃত্যুর ছায়া দিনের পর দিন এমনি ঘনীভূত হয়ে এসেছে যে, এ আশঙ্কা মানুষের মনে সহজেই উদয় হয় যে, একদিন হয়ত মানবের স্বহস্তরচিত এই

অন্ধকার, ইউরোপীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করবে। এই কারণ ইউরোপ একদিকে যেমন লড়ালড়ির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, অপর দিকে তেমনি শান্তিরক্ষার জন্যও লালায়িত হয়েছিল। যারা বারুদের ঘরে বাস করে, তারা আগুন নিয়ে খেলা করতে পারে না। যাতে ইউরোপের ঘরে আগুন না লাগে, সে ভাবনা ইউরোপের মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। কিন্তু আজ সে আগুন লেগেছে। এ অগ্নিকাণ্ডের শেষ যে কোথায়, আজ তা কেউ বলতে পারেন না। এ আগুনের আঁচ পৃথিবীর সমগ্র মানব-জাতির গায়ে লাগবে, আমরাও বাদ যাব না। ইউরোপের নানা দেশের নানা জাতির স্বার্থের সংঘর্ষে এই সমরানল প্রজ্বলিত হয়েছে, কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডেই ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে।

(২)

এই যুদ্ধটি কতকটা বিনা-মেঘে বজ্রাঘাতের মত ইউরোপের মাথার উপর এসে পড়েছে। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে চিরদিন স্বার্থ নিয়েই লড়াই হয়। কিন্তু আজ একমাস পূর্ব্বে ইউরোপে এমন কোন রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হয় নি, যার মীমাংসা তরবারির সাহায্য ব্যতীত অপর কোন উপায়ে হতে পারত না। ইউরোপে গত দশ বারো বৎসরের মধ্যে অন্তত দুচারবার অতি গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু দশে মিলে তার আপোষে মীমাংসা করে নিয়েছেন। সুতরাং দূর থেকে আমাদের মনে হয় যে, নিতান্ত অকারণে বা অতি তুচ্ছ কারণে এই প্রলয়কাণ্ডের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা আদার

ব্যাপারী হলেও জাহাজের খোঁজ না নিয়ে থাকতে পারিনে। কেননা আজকের দিনে জাহাজ বাদ দিয়ে কোনও ব্যাপার নেই। সুতরাং পৃথিবীর শান্তিভঙ্গ করবার জন্য কে দায়ী, এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা নয়। এ প্রশ্নের উত্তরে সার্ভিয়া, রাসিয়া, বেলজিয়ম, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ড বলেন দোষী জার্ম্মানী। এমন কি জার্ম্মানীর মিত্ররাজ্য ইটালিও স্পষ্টাক্ষরে এই মতেই সায় দিয়ে জার্ম্মানীর সঙ্গে সন্ধি-বিচ্ছেদ করেছেন। অর্থাৎ ইউরোপে জার্ম্মানেতর সকল জাতিই এক-বাক্যে জার্ম্মানীর উপরই দোষারোপ করছে। অপর পক্ষে জার্ম্মান-সম্রাট ঈশ্বর সাক্ষ্য করে, মুক্তকণ্ঠে এই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, অপরে জোর করে তাঁর হাতে তলোয়ার গুঁজে দিয়েছে। কিন্তু সে অপর যে কে, তার কোনও উল্লেখ নেই। সম্ভবত এ স্থলে অপর শব্দের অর্থ বিশ্বমানব। Prince von Bulow এই স্পর্দ্ধা করেছেন যে, যেহেতু পৃথিবীর অপর সকলে ভূতপ্রেত, সে কারণ তাঁরা সূর্য্যলোকে কিম্বা সূর্য্যালোকে বাস করবেন। আত্মশ্লাঘা করাটা হাল জার্ম্মান-রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। লোকে বলে এক হাতে তালি বাজে না, কিন্তু এক হাতে যে চপেটাঘাত করা যায় না, এ কথা কেউ বলে না। জার্ম্মানীই যে অকারণে সমগ্র ইউরোপের গণ্ডে চপেটাঘাত করেছেন, তার প্রমাণ Bulow-র সদ্য-প্রকাশিত Imperial Germany নামক গ্রন্থ হতেই পাওয়া যায়। গ্রন্থকার বহুকাল জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁর মুখেই জার্ম্মান রাজনীতির পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যাবে। Bulow-র মতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জার্ম্মানী অসংখ্য খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল বলে' জার্ম্মান জাতির কোন রাষ্ট্রবল ছিল

না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্ম্মানী বুদ্ধিবলে ও বাহু-বলে ইউরোপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। ইউরোপে আজ জার্ম্মানী যে সর্ব্বাগ্রগণ্য সর্ব্বশক্তিশালী জাতি, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। তারপর বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জার্ম্মানী সমগ্র পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করাটা তার জাতীয় কর্ত্তব্য বলে স্থির করেছে। শুধু ইউরোপে নয়, সসাগরা বসুন্ধরায় সর্ব্বেসর্ব্বা হওয়া জার্ম্মানীর কপালে লেখা আছে, এবং বিধাতার সে লিপি কেউ খণ্ডন করতে পারবেন না, কেননা এ ক্ষেত্রে অদৃষ্ট ও পুরুষকার একত্রে মিলিত হয়েছে। Prince Bulow-র মতে জার্ম্মান-জন-সাধারণের বীর্য্য আছে অতএব ধৈর্য্য আছে, শক্তি আছে অতএব সংযম আছে, সাহস আছে অতএব ভরসা আছে। অপরপক্ষে জার্ম্মান রাজপুরুষেরা বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, বহুদর্শী ও দূরদর্শী, একাগ্র ও একনিষ্ঠ। বাহুবল এবং বুদ্ধিবলের এহেন মিলন পৃথিবীর কুত্রাপি আর হয় নি। পূর্ব্বোক্ত কারণে জার্ম্মানী তার মহত্ত্বের ও প্রভুত্বের ব্রত উদযাপন করতে বাধ্য। সমস্ত পৃথিবীর উপর Made in Germany এই ছাপ মেরে দেওয়াটাই হচ্ছে জার্ম্মান-রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য।

জার্ম্মানী যে মন্ত্রের সাধনা করছে, Prince Bulow-র মতে তার সিদ্ধির পথে দুটি অন্তরায় আছে—এক ফ্রান্সের শত্রুতা, আর এক ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বীতা।

ফ্রান্স জার্ম্মানীর চিরশত্রু; তার স্পষ্ট কারণ এই যে, ফ্রান্স আজও আল্‌সেস্ লোরেনের কথা ভুলতে পারে নি, আর তার গূঢ় কারণ এই যে, ফ্রান্স আজও তার পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলতে পারে নি। প্রায় তিনশত বৎসর ধরে ফ্রান্স ইউরোপের হর্ত্তা-কর্ত্তাবিধাতা ছিল। এই অতীত গৌরবকাহিনী ফ্রান্সের

মজ্জাগত হয়ে গেছে। সুতরাং জার্ম্মানীর বর্ত্তমান প্রাধান্য ফ্রান্সের নিকট অসহ্য, এবং তার জাত্যভিমানে নিত্য আঘাত করে। তারপর ফরাসী জাতি স্বভাবতই অধীর ও চঞ্চল, উদ্যমশীল ও যুদ্ধপ্রিয়। ফরাসীদের জাতীয় স্বার্থজ্ঞানের চাইতে জাতীয় আত্মজ্ঞান অনেক বেশি। Prince Bulow-র মতে, এ জাতির মনে লাভের চাইতে ভাবের প্রভাব বেশি (It is a peculiarity of the French nation that they place spiritual needs above material needs); তা ছাড়া ফরাসী জাতির অন্তরে এমন অপূর্ব্ব জীবনীশক্তি নিহিত আছে যে, ফ্রান্সকে যতই কেন আঘাত কর না, সে মরতে জানে না। সুতরাং এরূপ চরিত্রের জাতির কাছ থেকে জার্ম্মানীর বিপদ আছে। যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারলে, ফ্রান্স আবার জার্ম্মানীকে সেই শক্তি পরীক্ষা করবার জন্য যুদ্ধে আহ্বান করবে। এ ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য পূর্ব্ব হতেই জার্ম্মানী ফ্রান্সের শক্তি হ্রাস করতে বাধ্য। অতএব ফ্রান্সের শত্রুতা করা জার্ম্মানীর পক্ষে কর্ত্তব্য। এই ত গেল ফ্রান্সের কথা।

অপর-পক্ষে সমগ্র পৃথিবীতে জার্ম্মানীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে ইংলণ্ড চিরবাধা। কি বাণিজ্যে, কি রাজ্যে—আজ ইংলণ্ডের সমকক্ষ কোন দেশ পৃথিবীতে নেই। জার্ম্মানীর ইচ্ছা এ ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের সমকক্ষ হন; সুতরাং রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংলণ্ড জার্ম্মানীর সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। পৃথিবীতে জার্ম্মানীর উন্নতি ইংলণ্ডের স্বার্থের বিরোধী। অতএব ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর সখ্য অসম্ভব। কিন্তু তাই বলে' ইংলণ্ডের শত্রুতা করা যে জার্ম্মানীর পক্ষে কর্ত্তব্য, তাও নয়। তার কারণ অর্থবলে ও নৌবলে ইংলণ্ড অদ্বিতীয়। এত

প্রবল ও ঐশ্বর্য্যশালী জাতির সঙ্গে বিবাদ করা জার্ম্মানীর পক্ষে সুবিবেচনার কাজ নয়—অথচ ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য জার্ম্মানীর প্রতিদিন প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। এ অবস্থায় জার্ম্মানীর রাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে জাতীয় বিদ্বেষ-বুদ্ধি সেই পরিমাণে উদ্রেক করা, যাতে ইংলণ্ডের সঙ্গে জার্ম্মানীর যুদ্ধ অনিবার্য্য হয়ে না পড়ে, কেননা আজও জার্ম্মানীর নৌবল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। (Patriotic feeling must not be roused to such an extent as to damage irreparably our relations with England, against whom our sea-power for years would be insufficient). অর্থাৎ ইংলণ্ডের সঙ্গে জলযুদ্ধ করবার শক্তি যতদিন না সঞ্চয় করতে পারেন, ততদিন জার্ম্মান-রাজপুরুষেরা অনাহূত ইংলণ্ডের শত্রুতা করবেন না। এত শুধু সময়ের কথা। ইত্যবসরে জার্ম্মানী রণতরীর পর রণতরী প্রস্তুত করে' এবং সেই সঙ্গে দেশের লোককে পেট্রিয়টিজমের সুরাপান করিয়ে আসছে।

পূর্ব্বে যা বলা গেল সে সবই Prince Bulow-র কথা, এক বর্ণও আমার নিজের নয়। এর থেকেই দেখা যায় জার্ম্মানীর রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে শক্তিহীন করা। Prince Bulow বলেন যে, জাতীয় আত্ম-রক্ষার জন্য তাঁরা এই নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য। জার্ম্মানী অবশ্য আত্মরক্ষা অর্থে, যা আছে তাই রক্ষা করা বোঝেন না। যে ঐশ্বর্য্য যে প্রভুত্ব জার্ম্মানীর আজও নেই, তাই আয়ত্ত করাই হচ্ছে জার্ম্মানীর মতে আত্মরক্ষা। এখন জিজ্ঞাস্য, এই আত্ম-রক্ষার উপায় ও পদ্ধতি কি? Prince Bulow বলেন—

"The fleet as well as the army would, needless to say, in accordance with Prussian and German traditions, consider attack the best form of defence"—অর্থাৎ জার্ম্মান-মতে পরকে আক্রমণ করাই আত্ম-রক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

ইটালি বলেছে যে, আত্মরক্ষা এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য জার্ম্মানীর নয়—দস্যুতা। ইটালির কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তার প্রমাণ Prince Bulow-র গ্রন্থের প্রতি অক্ষরে পাওয়া যায়। সুতরাং ইউরোপে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড সৃষ্টি করবার জন্য প্রাধানত জার্ম্মানী দায়ী। ইউরোপের রাজনীতির একটি কথা আছে যে, জেরুজেলম্ পৌঁছতে হলে লোহিত সমুদ্র পার হওয়া দরকার। 'যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ' এই শাস্ত্রবচনের যদি কোন সার্থকতা থাকে, তাহলে জার্ম্মানী তার এই স্বখাদ রক্ত-সমুদ্রে ডুবে মরবে।

(৩)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে এই ব্যাপারে ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে।

আজ তিন হাজার বৎসরে ইউরোপে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে—সে সভ্যতার লক্ষণ ও ধর্ম্ম সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ঐতিহাসিক Seignobos নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করেছেন।

প্রথমত—বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে সমাজ সনাতন-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। নির্ব্বিচারে সে প্রথা রক্ষা করাই লোকে কর্ত্তব্য মনে করত। কিন্তু আজ ইউরোপবাসীরা, যা চলে আসছে তাতে সন্তুষ্ট না

থেকে মানব-সমাজের উন্নতির জন্য চিন্তা করে ও চেষ্টা করে। বর্ত্তমান সভ্যতার জপ-মন্ত্র হচ্ছে—progress।

দ্বিতীয়ত—বর্ত্তমানে সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুগে মানুষের উপর মানুষের কোন অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইউরোপে মানুষ আজ মানুষের দাস নয়।

তৃতীয়ত—বর্ত্তমান সমাজ সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন সমাজ উচ্চ-নীচ হিসাবে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল, এবং প্রতি সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিকার ও বিশেষ কর্ত্তব্য ছিল। এ যুগের আইনকানুনে এই অধিকারভেদ ও কর্ত্তব্য-ভেদের স্থান নেই। অর্থের তারতম্য ব্যতীত ইউরোপে মানুষ মাত্রেই অধিকারে ও কর্ত্তব্যে একজাতীয়।

চতুর্থত—বর্ত্তমানে রাজ্য স্বায়ত্ত-শাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে ইউরোপে জাতি বলতে কোন দেশের জনগণকে বোঝাত না। সে কালে শাসক-সম্প্রদায় বলে একটি বিশেষ সম্প্রদায় ছিল। রাজ্যশাসনের ভার তাঁদেরই হস্তে নিহিত ছিল। বাদ-বাকী লোকের শাসনকার্য্যের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না। আজ মানুষ মাত্রেই রাষ্ট্রের (Body politic) অন্তর্ভূত। ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, সকলেরই ভোট আছে, এবং সকলের মতই সমান মূল্যবান।

পঞ্চমত—ইউরোপীয় সমাজ নিরাপদ। পূর্ব্বের ন্যায় দস্যু-ভয়ও নেই, রাজকর্ম্মচারীদের অত্যাচারও নেই। এ যুগের

রাজকর্ম্মচারীরা অধিকাংশই শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র, তা ছাড়া তাঁদের কার্য্যের উপর গভরমেণ্টের দৃষ্টি সর্ব্বদাই থাকে।

ষষ্ঠত—বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে আজও যুদ্ধবিগ্রহ আছে; কিন্তু ইউ-রোপের মতে যুদ্ধব্যাপার একটি পাপ—কেবল কোন কোন অবস্থায় কোন কোন জাতিকে দায়ে পড়ে এ কার্য্য করতে হয়। ইউরোপে বর্ত্তমানে ক্ষত্রিয় বলে কোন মহামান্য এবং অসামান্য ক্ষমতাপন্ন সম্প্রদায় নেই। বর্ত্তমানে মানুষে কর্ত্তব্যের খাতিরে সৈনিক হয়,—সখের জন্যও নয়, মানের জন্যও নয়। বর্ত্তমানে যুদ্ধ-ব্যাপারটি এমন ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডে পরিণত হয়েছে যে, যুদ্ধ একালে অতি কম হয়, এবং অতি কম দিনের জন্য হয়।

ইউরোপীয় সভ্যতার উপরোক্ত বর্ণনা যে সত্য, তা যিনিই ইউরোপের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য।

(৪)

যে সকল মনোভাবের উপর বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, ইংলণ্ডে তার উৎপত্তি, এবং ফ্রান্সে তার পরিণতি হয়েছে। নেপোলিয়ানের অধঃপতনের পর, রাসিয়া অষ্ট্রীয়া এবং প্রুশিয়া এই নূতন সভ্যতার উচ্ছেদ এবং মধ্যযুগের পুনঃ-প্রতিষ্ঠার জন্য একবার বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন, কিন্তু সে সভ্যতা নষ্ট করবার ক্ষমতা সে-কালে এই তিন-রাজ্যের মিলিত-শক্তিরও ছিল না। এ সভ্যতাকে ঘা-খাওয়াবার শক্তি আজ একমাত্র জার্ম্মান-সম্রাজেই আছে। কেননা রাসিয়া ইউরোপের ভূগোলের

অন্তর্ভূর্ত হলেও, তার ইতিহাসের বহির্ভূত। রাসিয়াকে ইউ-রোপ আজও একটি প্রাচ্যদেশ হিসেবেই দেখে।

অষ্ট্রিয়ার সাম্রাজ্য একটি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মাত্র। নানা বিভিন্ন জাতি ও নানা বিভিন্ন দেশকে জোড়াতাড়া দিয়ে এ সাম্রাজ্যকে খাড়া করে রাখা হয়েছে। অষ্ট্রিয়াকে জার্ম্মানীর সামন্তরাজ বললেও অত্যুক্তি হয় না, কেননা জার্ম্মানীর সাহায্য ব্যতীত অষ্ট্রিয়া একদিনও দাঁড়াতে পারে না। আমরা আজ যাকে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য বলি, সে হচ্ছে একটি যুক্তরাজ্য, এবং প্রুশিয়ার রাজা সেই যুক্তরাজ্যের মণ্ডলেশ্বর। জার্ম্মান-রাষ্ট্রনীতির অর্থ হচ্ছে প্রুশিয়ার রাজনীতি। বর্ত্তমান জার্ম্মান-সভ্যতার স্বরূপ বুঝতে হলে এই কথাটি মনে রাখা দরকার। এই রাজ-শক্তি আজকের দিনে সমগ্র সভ্য-সমাজের নিকট একটি বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জার্ম্মানী আজ ইউরোপে প্রবল পরাক্রান্ত, কিন্তু জার্ম্মানী, কি সমাজনীতিতে, কি রাজনীতিতে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নি। জার্ম্মানীর ideal পূর্ব্ববর্ণিত ইউরোপীয় সভ্যতার ideal হতে পৃথক, এবং কোন কোন অংশে বিরোধী। সুতরাং এ যুদ্ধের মূলে কেবল স্বার্থের নয়, ideal-এর বিরোধ ও সংঘর্ষ আছে।

(৫)

প্রথমত—বর্ত্তমান জার্ম্মান-সাম্রাজ্য উচ্চ আদর্শের উপর নয়, উচ্চ আশার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবজাতির উন্নতি নয়, জার্ম্মানীর অভ্যুদয়ই হচ্ছে জার্ম্মান সম্রাটের এবং জার্ম্মান রাজপুরুষদের কামনার ধন। কি রাজ্যে কি বাণিজ্যে দিগ্বিজয়

করাই হচ্ছে জার্ম্মানীর ideal। জার্ম্মানীর জপ-মন্ত্র progress নয়,—self aggrandisement.

দ্বিতীয়ত—জার্ম্মানীতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,—ইউরোপের অপর সকল দেশের অপেক্ষা কম। জার্ম্মান রাজনীতির বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করা জার্ম্মান আইন-অনুসারে দণ্ডনীয়। জার্ম্মানদেশে প্রতি ব্যক্তি যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসরের জন্য সৈনিক হতে বাধ্য। এবং পরে রাজার আদেশে যুদ্ধ করতে বাধ্য। ইংলণ্ড ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপরে এরূপ হস্তক্ষেপ করা বর্ব্বরতা মনে করে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ কেবলমাত্র জার্ম্মানীর সৈন্যবলের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য এই জার্ম্মান-প্রথা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত পোল, দিনেমার, ফরাসী প্রভৃতি জার্ম্মানেতর জাতির নিজের প্রবৃত্তি ও রুচি অনুসারে জীবন গঠন করবার অধিকার নেই। জার্ম্মান-আইন-অনুসারে তারা জার্ম্মান সভ্যতায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত হতে বাধ্য। এমন কি নিজের নিজের ভাষা ব্যবহার করবার স্বাধীনতা হতেও তারা বঞ্চিত।

তৃতীয়ত—জার্ম্মানীতে আজও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে প্রভেদ আছে। ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব জার্ম্মান-সমাজ নতশিরে গ্রাহ্য করে নিয়েছে।

চতুর্থত—জার্ম্মান-সাম্রাজ্য স্বায়ত্তশাসনের উপর নয়, রাজশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। Prince Bulow বলেন, ইউরোপের অন্যান্য দেশের ন্যায় জার্ম্মানীতে ডিমোক্রাসী স্থাপন করা অসম্ভব। কেননা জার্ম্মান জাতি রাজনৈতিক বুদ্ধিহীন। আটশত বৎসর নানা ক্ষুদ্ররাজ্যে বিভক্ত থাকার দরুণ জার্ম্মান জাতির মনে স্বাতন্ত্র্যের ভাব অতি প্রবল। এই কারণে জার্ম্মান-

জনসাধারণের মনে সমগ্র জার্ম্মানী সম্বন্ধে আজও দেশাত্মজ্ঞান জন্মলাভ করে নি। এতদ্ব্যতীত জার্ম্মানদের মনে স্বজাতি-বাৎসল্য হয় অতি সঙ্কীর্ণ, নয় অতি উদার। হয় তা নিজের দলের মধ্যে আবদ্ধ, নয় তা বিশ্বমানবের ভিতর ব্যাপ্ত। Prince Bulow-র মতে জার্ম্মানীর ইতিহাস জার্ম্মান জাতিকে স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষে অনুপযুক্ত করে ফেলেছে। যদি প্রজা-সাধারণের হাতে রাজ্যশাসনের ভার পড়ে, তাহ'লে জার্ম্মান-সাম্রাজ্য দুদিনেই আবার ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়বে। অতএব প্রুশিয়ার রাজা, রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যবলের সহায়তায় জার্ম্মান-সাম্রাজ্য আজও শাসন করছেন এবং চিরদিন করবেন। রাজ-শক্তি অবাধ এবং অক্ষুণ্ণ রাখাই জার্ম্মান-রাজনীতির মূলমন্ত্র।

পঞ্চমত—জার্ম্মানীর জনসাধারণ সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। জার্ম্মানীতে অবশ্য দস্যুভয় নেই, কিন্তু রাজভয় আছে। প্রজা-সাধারণের উপর রাজকর্ম্মচারীদের, বিশেষত সেনাধ্যক্ষদের অবৈধ অত্যাচারের উপযুক্ত বৈধ শাস্তি নেই।

ষষ্ঠত—জার্ম্মান-সাম্রাজ্য যুদ্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত, শান্তির উপর নয়। জার্ম্মান-কর্ত্তৃপক্ষদের মতে যুদ্ধ পুণ্যকার্য্য, পাপ নয়। জার্ম্মানীর সৈনিক সাধারণ-মানব নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর জীব। জার্ম্মানীতে অস্ত্রধারণ করা কর্ত্তব্যও বটে, গৌরবের কথাও বটে। Might is right (অর্থাৎ বাহুবলই ধর্ম্মবল) এই মতের ভিত্তির উপর জার্ম্মান-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত।

এই কারণেই জার্ম্মান-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ইউরোপের সভ্য সমাজে বর্ব্বরতার পুনরভ্যুদয় বলে গণ্য। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপের নব-সভ্যতার স্রষ্টা। আশা করি এই বর্ব্বরতার

আক্রমণ হতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ইউরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারবে। সে সভ্যতা যদি এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহ'লেই প্রমাণ হবে যে, পশুবলই শ্রেষ্ঠ বল নয়, আর সভ্যতাও শক্তিহীন নয়।

ভাদ্র, ১৩২১ সন।

বর্ত্তমান সভ্যতা বনাম বর্ত্তমান যুদ্ধ।

(১)

বর্ত্তমান যুদ্ধের কার্য্যকারণ সম্বন্ধে ইউরোপে যদি কোন বাজে কথা কিম্বা অসঙ্গত কথা বলা হয়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কারণ নেই, কেননা মানুষে যখন যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, মনে যখন রাগ ও দ্বেষই প্রাধান্য লাভ করে তখন তার পক্ষে বাক্যের সংযম কতক পরিমাণে হারানো স্বাভাবিক। ঘরে ডাকাত পড়লে তার সঙ্গে মিষ্ট এবং শিষ্ট আলাপ করা সম্ভবত দেবতার পক্ষে স্বাভাবিক, মানুষের পক্ষে নয়; এবং ইউরোপের লোক দেবতা নয়, মানুষ।

কিন্তু এই যুদ্ধব্যাপারটি আমাদের পক্ষে নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার বিশেষ কোনও বাধা নেই। আমরা ও-জালে জড়িয়ে পড়িনি; এখন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারের যা-কিছু যোগ আছে সে শুধু তারের,—নাড়ীর নয়।

ইউরোপে সুরাসুর মিলে যে ভবসমুদ্র মন্থন করেছেন—তার ফলে অমৃতই উঠুক আর হলাহলই উঠুক—তার ভাগ আমরাও পাব; কিন্তু সে ভবিষ্যতে। সে বস্তু পান করবার পূর্ব্বেই আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম হবার কোনও কারণ নেই। বরং এই অবসরে আমরা যদি ব্যাপারটি ঠিকভাবে দেখতে ও বুঝতে শিখি তাহ'লে এর ভবিষ্যৎ-ফলাফলের জন্য আমরা অনেকটা প্রস্তুত থাকব।

এই সমরানলে যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে সে কথা সত্য। কিন্তু "বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা"র অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দেখতে পাই অনেকের তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। এমন কি, কেউ কেউ এই উপলক্ষ্যে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

আমার মতে ইউরোপের প্রতি অবজ্ঞার কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। এ অবশ্য রুচির কথা; সুতরাং এ ক্ষেত্রে মত-ভেদের যথেষ্ট অবসর আছে। মনোভাব প্রকাশ না করলেই যে, সে ভাব মন থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায় তা অবশ্য নয়। অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, আমরা মুখে কি বলি তার চাইতে আমরা মনে কি ভাবি তার মূল্য আমাদের কাছে ঢের বেশি; কেননা সত্যের জ্ঞান না হলে মানুষে সত্য কথা বলতে পারে না।

প্রথমত কি স্বদেশী, কি বিদেশী, কি নবীন, কি প্রাচীন কোন সভ্যতাকেই এক-কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

একটি বিপুল মানব-সমাজের পক্ষে কিম্বা বিপক্ষে ও-রকম এক-তরফা ডিক্রি দেওয়ার নাম বিচার নয়। বহু মানবে বহু দিন ধরে কায়মনোবাক্যে যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে তার ভিতর যে মনুষ্যত্ব নেই, এ কথা বলতে শুধু তিনিই অধিকারী যিনি মানুষ নন। অপর পক্ষে "চরম সভ্যতা" বলে' কোনও পদার্থ মানুষে আজ পর্য্যন্ত সৃষ্টি করতে পারেনি এবং কখনও পারবে না। কেননা, পৃথিবী যে দিন স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠবে সে দিন মানুষের দেহমনের আর কোনও কার্য্য থাকবে না—কাজেই মানুষ তখন চিরনিদ্রা উপভোগ করতে বাধ্য হবে। অন্তত

পৃথিবীতে এমন কোনও সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত হয়নি—যা একে-বারে নির্গুণ কিম্বা এককেবারে নির্দ্দোষ। কোনও একটি বিশেষ সভ্যতার বিচার করবার জন্য তার দোষগুণের পরিচয় নেওয়া আবশ্যক, মনকে খাটানো দরকার। যখন আমরা আলস্যে অভিভূত হয়ে হাই তুলি তখনই আমরা তুড়ি দিই, সুতরাং আমরা যখন তুড়ি দিয়ে কোন জিনিষ উড়িয়ে দিতে চাই তখন আমরা মানসিক আলস্য ব্যতীত অন্য কোন গুণের পরিচয় দিই না। এ সত্য অবশ্য চিরপরিচিত কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই উপেক্ষিত।

(২)

ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, যে মনোভাবের উপর সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত এই মহাসমর হচ্ছে তার স্বাভাবিক পরিণতি; কেননা এ যুগে ইউরোপ ধর্ম্মপ্রাণ নয়, কর্ম্মপ্রাণ। সে দেশে আজ আত্মার অপেক্ষা বিষয়ের, মনের অপেক্ষা ধনের মাহাত্ম্য ঢের বেশি। শিল্প-বাণিজ্যের পরিমাণ-অনুসারেই এ যুগে ইউরোপে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের পরিমাপ করা হয় এবং সে দেশের লোকের বিশ্বাস যে, মানবের ভ্রাতৃভাব নয় ভ্রাতৃবিরোধই হচ্ছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক অভ্যুদয়ের একমাত্র উপায়। অতএব এই যুদ্ধ হচ্ছে ইউরোপের আজ একশ' বৎসরের কর্ম্মফল।

এ অভিযোগের মূলে যে কতকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু কতটা—তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

আমরা মানব-সভ্যতাকে সচরাচর দুই ভাগে বিভক্ত করি—প্রাচীন ও নবীন। কিন্তু পৃথিবীতে এমন কোনও বর্ত্তমান

সভ্যতা নেই যা অনেক অংশে প্রাচীন নয়। যেমন আমাদের বর্ত্তমান সভ্যতা কিম্বা অসভ্যতা এক-অংশে প্রাচীন হিন্দু এবং আর-এক-অংশে নব্য ইউরোপীয়—তেমনি ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতা আট আনা নতুন হলেও আট আনা পুরোনো। সুতরাং এই যুদ্ধের জন্য ইউরোপের নব-মনোভাবকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যেতে পারে না, বরং তার পূর্ব্ব-সংস্কারকেই এর জন্য দোষী করা অসঙ্গত হবে না।

মানুষে মানুষে কাটাকাটি মারামারি করা যদি অসভ্যতার লক্ষণ হয় তাহলে বল্‌তে হবে ইউরোপের বর্ত্তমান যুগের অপেক্ষা মধ্যযুগ ঢের বেশি অসভ্য ছিল। সে যুগে যুদ্ধপার্ব্বণ বারো মাসে তের বার হত এবং সে কালের মতে ও-কার্য্যটি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মধ্যযুগকে ইউরোপীয়েরা কৃষ্ণযুগ বলেন—কিন্তু আসলে সেটি রক্তযুগ। আমরা আমাদের বর্ত্তমান মনোভাব-বশতই যুদ্ধকার্য্যটি হেয় মনে করি—প্রাচীন মনোভাব থাকলে শ্রেয়ঃ মনে কর্‌তুম। ইউরোপের নবযুগ অবশ্য এক হিসাবে যন্ত্রযুগ কিন্তু তাই বলে মধ্যযুগ যে মন্ত্রযুগ ছিল, তা নয়। যে হিসাবে মধ্যযুগ ধর্ম্মপ্রাণ ছিল সে হিসাবে নবযুগ ধর্ম্মপ্রাণ নয়। সে হিসাবটি যে কি, তা একটু পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বৌদ্ধধর্ম্মের মত খৃষ্টধর্ম্মেরও ত্রিরত্ন আছে;—সে হচ্ছে খৃস্ট, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ; এবং খৃষ্টিয়ানমাত্রেই নামমাত্র এই তিনের স্মরণ গ্রহণ করেন। কিন্তু যুগভেদে এই তিনের মধ্যে এক একটি রত্ন সর্ব্বাপেক্ষা মহামুল্য হয়ে উঠে।

প্রথম যুগে (Primitive Christianity) খৃষ্টিয়ানের পক্ষে খৃষ্টই ছিল শরণ্য। মধ্যযুগে খৃষ্টের স্থান খৃষ্ট-সঙ্ঘ অধিকার করেন এবং ইউরোপের মনোরাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন

করেন; সে সঙ্ঘ, সে আধিপত্যের ভাগ খৃষ্টকেও দেন নি, ধর্ম্মকেও দেন নি। প্রায় এক হাজার বৎসর ধরে খৃষ্ট-সঙ্ঘ মানবের বুদ্ধি ও আত্মাকে সমান অভিভূত করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, সাংসারিক হিসাবেও এই সঙ্ঘ ইউরোপের রাজ-রাজেশ্বর হয়ে উঠেছিলেন। এই সঙ্ঘ মানুষের তনমনধনের উপর এই অসীম প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ধর্ম্মের নামে কত যে অধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রবর্ত্তন করেছেন তার প্রমাণ মধ্যযুগের ইতি-হাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়।

এই সঙ্ঘের ধর্ম্ম ও খৃষ্টধর্ম্ম এক বস্তু নয়। সুতরাং এই সঙ্ঘের দাসত্ব হতে মুক্তিলাভ করে ইউরোপের যে ধর্ম্মজ্ঞান লুপ্ত হয়েছে এ কথা বলা চলে না। বরং পূর্ব্বের অপেক্ষা বর্ত্তমানে ইউরোপীয়দের যে ধর্ম্মবুদ্ধি (conscience) অধিক জাগ্রত হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ ইউরোপের সকল আইন-কানুনে, সকল সমাজব্যবস্থায় পাওয়া যায়।

মধ্যযুগের অন্ধ কারাগার আপনি ভেঙ্গে পড়ে নি; মানব-মনের একটির পর আর-একটি, তিনটি প্রবল ধাক্কায় তার পাষাণ প্রাচীর বিদীর্ণ হয়েছে। সে তিন হচ্ছে—ইতালির 'রেনেসাঁস্', জর্ম্মানীর 'রিফর্‌মেশান' এবং ফ্রান্সের 'রেভলিউসান'।

গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার স্পর্শে ইতালি যেদিন নবজীবন লাভ করলে সেইদিন ইউরোপে নবসভ্যতার সূত্রপাত হল। এই প্রাচীন সাহিত্যের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ নিজের শক্তি ও বাহিরের সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করলে। মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের চোখ দিয়ে দেখতে এবং নিজের বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে শিখলে। মানুষের পক্ষে তার এই নব আবিষ্কৃত অন্তর্নিহিত শক্তির চর্চ্চাই তার প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে উঠল। যে

প্রকৃতিকে ইউরোপীয়েরা হাজার বৎসর ধরে বিমাতা মনে করে আসছিল, তাকে তারা সেবাদাসীতে পরিণত করতে ব্যগ্র হয়ে উঠল। এই নবজীবন—শিল্পে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, ইতিহাসে, বিকশিত হয়ে উঠল। এককথায় নবজীবন লাভ করে মানুষের চোখ-কান ফুটল এবং হাত-পায়ের খিল খুলে গেল।

এর পরবর্ত্তী যুগে জর্ম্মানী বাইবেলের আবিষ্কারের সঙ্গে নিজের আত্মারও আবিষ্কার করলে;—মানুষে এই সত্যের পরিচয় পেলে যে, ধর্ম্মের মূল তার নিজের অন্তরে, ধর্ম্মযাজকের মুখে নয়। খৃষ্টের ধর্ম্মের পরিচয় লাভ করে মানুষে খৃষ্টসঙ্ঘের সংস্কারের জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। জর্ম্মানীর এই নবসংস্কারের গুণে ইউরোপের মানবশক্তি আবার অন্তর্মুখী হল। মানুষ আত্মদর্শনের জন্য লালায়িত হয়ে উঠল।

এই রেনেসাঁসের ফলে ইউরোপে মানুষের কর্ম্মবুদ্ধি এবং এই রিফরমেশনের ফলে তার ধর্ম্মবুদ্ধি মুক্তিলাভ করলে; কিন্তু তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন ঘটল না।

তারপর ফ্রান্সের বিপ্লবের ফলে ইউরোপীয় মানব মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করে জীবনেও স্বাধীনতা লাভ করলে। সুতরাং ইউরোপের নবযুগের সভ্যতায় মানুষ তার মনুষ্যত্ব ফিরে পেলে,—হারাল না। যে মনোভাবের উপর এ সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত তা শান্তির পক্ষে অনুকূল বই প্রতিকূল নয়। সামাজিক স্বাধীনতা যে সামাজিক মৈত্রীর প্রতিবন্ধক নয়, তার প্রমাণ এই যুদ্ধেই পাওয়া যায়। আজ দেখা যাচ্ছে যে, ইউ-রোপের এক একটি জাতি যেন এক একটি ব্যক্তিস্বরূপ হয়ে উঠেছে; মধ্যযুগে এরূপ একজাতীয়তার ভাব মানুষের কল্পনারও অতীত ছিল।

(৩)

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, কোন যুগের কোনও সভ্যতা একেবারে নির্দ্দোষ কিম্বা একেবারে নির্গুণ নয়। ইউরোপের মধ্যযুগের স্বপক্ষে যে কিছু বলবার নেই, তা নয়। অন্ধকারেরও একটা অটল সৌন্দর্য্য আছে এবং তার অন্তরেও গুপ্ত শক্তি নিহিত থাকে। যে ফুল দিনে ফোটে, রাত্রে তার জন্ম হয়—এ কথা আমরা সকলেই জানি। সুতরাং নবযুগে যে সকল মনোভাব প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে তার অনেকগুলির বীজ মধ্য-যুগে বপন করা হয়েছিল। কিন্তু নবযুগের আলোক না পেলে সে সকল বীজ বড়জোর অঙ্কুরিত হত,—তার বেশি নয়।

ইউরোপের নবসভ্যতার আলোক, সূর্য্যের আলো নয় যে, তা কেউ নেবাতে পারে না। এ আলো প্রদীপের আলো, আকাশ থেকে পড়ে নি, মানুষে নিজহাতে রচনা করেছে; সুতরাং ইউ-রোপের নিশাচররা এ আলো নেবাবার বহু চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগের সঙ্গে পদে পদে লড়াই করে নবযুগকে অগ্রসর হতে হয়েছে। রিফর্‌মেসনকে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় দেড়শ' বছর অবিরাম যুদ্ধ করতে হয়েছে। ফরাসী-বিপ্লব আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়, তা ইউরোপময় ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী"র মন্ত্রে দীক্ষিত নেপোলিয়েন—সমগ্র ইউরোপকে প্রায় নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। স্বাধীনতার অবতার পরের স্বাধীনতা অপহরণ করা, মৈত্রীর অবতার পরের শত্রুতা করা এবং সাম্যের অবতার যে ইউরোপের একেশ্বর হওয়া তাঁর জীবনের ব্রত করে তুলেছিলেন, এ কথা মনে করলে মানব-সভ্যতা সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আমরা আজ একশ' বছর পরে নেপোলিয়ানের এই

বিরাট দস্যুতার বিচার করে দেখতে পাই যে, তার সুফল হয়েছে এই যে, ফরাসী রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমগ্র ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর তার কুফল হয়েছে এই যে, সেই সঙ্গে নেপোলিয়ানের militarism'ও সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের প্রবল সংঘর্ষে যে অমৃত ও হলাহল উত্থিত হয়েছে, ইউরোপের সকল জাতির দেহ ও মনে তার অল্প বিস্তর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রধান সমস্যাই এই যে, কি-উপায়ে সভ্য সমাজের দেহ এই বিষমুক্ত করা যেতে পারে।

(৪)

এ সমস্যা অতি গুরুতর সমস্যা। কেননা, এক পক্ষে যেমন ইউরোপের সভ্যজাতিদের মনে যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি কমে এসেছে, অপর পক্ষে তাদের জীবনে পরস্পর যুদ্ধ করবার নূতন কারণেরও সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণে ইউরোপের মুখে শান্তি-বচন এবং হাতে অস্ত্র।

সকলেই জানেন যে, শিল্প ও বাণিজ্যই হচ্ছে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান আশ্রয়স্থল। শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার অর্থই হচ্ছে নিজের পরিশ্রমে জীবিকা অর্জ্জন করা। আর যুদ্ধের দ্বারা অন্নবস্ত্র সংগ্রহ করার অর্থ হচ্ছে পরের পরিশ্রমের ফল উপভোগ করা। এ দু'টি মনোভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। এই কারণেই সকল দেশে সকল যুগেই দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে অবজ্ঞা করে এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়কে ভয় করে। যে জাতির অধিকাংশ লোক শিল্পবাণিজ্যে ব্যাপৃত, সে জাতির যুদ্ধে প্রবৃত্তি না থাকাই স্বাভাবিক।

তার পর, শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে যুদ্ধের ন্যায় ক্ষতিকর ব্যাপার আর নেই। যুদ্ধ যে মানুষের সকল কাজকর্ম্ম, সকল বেচাকেনা একদিনেই বন্ধ করে দেয়, তার প্রমাণ ত আজ হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং, যুদ্ধ জিনিষটি ইউরোপীয়দের স্বার্থের বিরোধী। আর এক কথা, হার্বার্টস্পেনসরপ্রমুখ দার্শনিকেরা আশা করেছিলেন যে, বর্ত্তমান ইউরোপের বৈশ্যসভ্যতা পৃথিবীতে চিরশান্তি স্থাপন করবে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, বাণিজ্যের যোগসূত্র পৃথিবীর সকল জাতির সখ্যসূত্রে পরিণত হবে। এই অন্নবস্ত্রের অবাধ আদান-প্রদানের ফলে প্রতি জাতির কাছেই বসুধা কুটুম্ব হয়ে উঠবে। এই কারণে এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে ক্ষত্রিয় যুগের অপেক্ষা বৈশ্যযুগের সভ্যতা মানব-ইতিহাসের উন্নত স্তরের সভ্যতা। হার্বার্টস্পেনসরের এই আশা যে, কবি-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার প্রমাণ আজ পাওয়া যাচ্ছে। আজ দেখা যাচ্ছে যে, আগে যেমন রাজ্য নিয়ে রাজায় রাজায় লড়াই করত, আজ তেমনি বাণিজ্য নিয়ে জাতিতে জাতিতে লড়াই করছে এবং এ লড়াই অতি ভীষণ এবং অতি নিষ্ঠুর। কারণ আগে মানুষ হাতে যুদ্ধ করত, এখন কলে যুদ্ধ করে। এই কারণেই বর্ত্তমান যুদ্ধ নিতান্ত অমানুষী ব্যাপার, কেননা বাহুবলের ভিতর মনুষ্যত্ব আছে কিন্তু যন্ত্রবলের ভিতর নেই। কিন্তু এ সত্বেও একথা সত্য যে, বৈশ্যসভ্যতা যুদ্ধের অনুকূল নয়, কেননা যুদ্ধ বৈশ্যধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

(৫)

ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স যে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর কোনও কারণে যুদ্ধ করাটা অকর্ত্তব্য মনে করে সে বিষয়ে সন্দেহ

করবার কোনও বৈধ কারণ নেই। ইউরোপের নবযুগের নবসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী হচ্ছে এই দু'টি দেশ। ইংরাজ ও ফরাসী উভয়েই ক্ষত্রিয়যুগ উত্তীর্ণ হয়ে বৈশ্যযুগে এসে উপস্থিত হয়েছেন। সুতরাং এঁদের দেহে রণসজ্জা থাকলেও মনে খাঁটি militarism নেই। অপর পক্ষে জর্ম্মানী হচ্ছে যুদ্ধপ্রাণ; militarism—জর্ম্মানীর যুগপৎ ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। বর্ত্তমান জর্ম্মানীর এরূপ মনোভাবের জন্য দায়ী জর্ম্মানীর পূর্ব্ব-ইতিহাস।

প্রায় আটশত বৎসর ধরে ইউরোপে জর্ম্মানজাতির কোন-রূপ প্রভুত্ব ছিল না—তার কারণ জর্ম্মানরা এই দীর্ঘকালের ভিতর একটি জর্ম্মান-রাজ্য কিম্বা একটি জর্ম্মানজাতি গড়ে তুলতে পারে নি। যে কালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বরাজ্য লাভ করেছিল, সে কালে জর্ম্মানী শত শত পরস্পর-বিরোধী খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এ কতকটা জর্ম্মানীর কপালের দোষে, কতকটা তার বুদ্ধির দোষে। জর্ম্মানী সমগ্র ইউরোপের সম্রাট হবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করত বলে, স্বদেশেও একরাট হতে পারে নি।

কোনও কোনও বৌদ্ধদেশে দুটি করে রাজা থাকেন; একজন প্রকৃতিপুঞ্জের আত্মার প্রভু, আর-একজন দেহের। মধ্যযুগের প্রথম ভাগে সমগ্র ইউরোপীয় মানবকে এইরূপ দুইছত্রের অধীন করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। পোপ ইউ-রোপের ধর্ম্মরাজের পদ এবং জর্ম্মানরাজ দেবরাজের পদ অধিকার করে বসেছিলেন। ইউরোপ একটি মহাদেশ এবং ইউরোপীয়েরা নানা বিভিন্ন জাতীয় সুতরাং ঐহিক কিম্বা পারত্রিক কোনও বিষয়ে একজাতি হওয়া যে তাদের পক্ষে

অসম্ভব, এ কথা পোপও স্বীকার করেন নি, জর্ম্মান-সম্রাটও স্বীকার করেন নি। জর্ম্মানজাতি যে, ইউরোপের অন্যান্য জাতি হতে মনে ও চরিত্রে পৃথক, এ সত্য উপেক্ষা করবার ফলে জর্ম্মানী ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ল। স্বদেশ এবং স্বজাতির উপর কোনরূপ একাধিপত্য না থাকলেও জর্ম্মান সম্রাট তাঁর সম্রাট-পদবী এবং সাম্রাজ্যের আশা ত্যাগ করতে পারলেন না, এবং স্বজাতিকে নিয়ে একটি স্বরাজ্য গঠন করবার চেষ্টামাত্রও করলেন না। এই কারণে জর্ম্মানজাতির পূর্ব্বে কোনরূপ রাষ্ট্রশক্তি ছিল না। অথচ জর্ম্মানজাতির ভিতর কি দেহের, কি বুদ্ধির, কি চরিত্রের কোনরূপ বলের যে অভাব ছিল না— জর্ম্মান কাব্যে দর্শনে শিল্পে সঙ্গীতে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ফলে জর্ম্মানীর মহাপুরুষেরা লৌকিক-রাজ্যের আশা ত্যাগ করে চিন্তারাজ্য অধিকার করাই নিজেদের কর্ত্তব্য বলে মেনে নিলেন। সম্ভবত জর্ম্মানজাতির ইতিহাস অদ্যাবধি ঐ একই পথ অনুসরণ করে চলত—যদি নেপোলিয়ান জর্ম্মানজাতিকে আকাশ থেকে টেনে মাটিতে ফেলে পদদলিত না করতেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে Jenaর যুদ্ধে পরাজিত এবং লাঞ্ছিত হবার পর জর্ম্মান মাত্রেরই এ জ্ঞান জন্মাল যে, জর্ম্মানীর খণ্ডরাজ্য সকলকে একত্র করে একটি যুক্তরাজ্যে পরিণত না করতে পারলে জর্ম্মানজাতির পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

অসংখ্য দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, অধ্যাপক প্রভৃতি চিরজীবন প্রাণপণে চেষ্টা করেও এ ব্রত উদযাপন করতে পারেন নি; কিন্তু আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিস্‌মার্ক দু'টি যুদ্ধের সাহায্যে জর্ম্মানজাতির প্রাণের আশা ফলে পরিণত

করেছিলেন। বিস্‌মার্ক অষ্ট্রিয়াকে পরাভূত করে উত্তর-জর্ম্মানীর এবং ফ্রান্সকে পরাভূত করে দক্ষিণ-জর্ম্মানীর যোগসাধন করেন। বিস্‌মার্ক বলতেন যে, রক্ত ও লৌহের রসান দিয়ে তিনি ভাঙ্গা জর্ম্মানীকে যোড়া দিয়েছেন। সুতরাং যুদ্ধের দ্বারা যে রাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে, যুদ্ধের দ্বারাই তার রক্ষা এবং যুদ্ধের দ্বারাই তার উন্নতি সাধন করতে হবে—এই হচ্ছে নবজর্ম্মানীর দৃঢ়ধারণা।

যুদ্ধকার্য্য অপ্রিয় হলেও আত্মরক্ষার্থ যে তা করা কর্ত্তব্য এ বিষয়ে ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপের অগ্রগণ্য জাতির মধ্যে কোনও মতভেদ নেই। জর্ম্মানদের সঙ্গে আর-সকলের প্রভেদ এইখানে যে, জর্ম্মানীর কর্ত্তৃপক্ষদের মতে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করবারও একমাত্র উপায় হচ্ছে তরবারি।

জর্ম্মানীর যোদ্ধাদলের মুখপাত্র জেনারেল বেয়ারণহার্ডি অতি স্পস্টাক্ষরে দুনিয়ার লোককে, জর্ম্মান রাষ্ট্রনীতির মূল কথা জানিয়ে দিয়েছেন। সে কথা এই :—"জর্ম্মানজাতি গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে, তার থেকেই প্রমাণ হয় যে, কি বাহুবলে, কি বুদ্ধিবলে সে জাতির সমকক্ষ দ্বিতীয় জাতি পৃথিবীতে নেই। জর্ম্মানীর শ্রীবৃদ্ধি তার বাণিজ্যবিস্তারের উপর নির্ভর করে। যদিচ ভবের হাটে কেনাবেচার জন্য জর্ম্মানজাতিই হচ্ছে জ্যেষ্ঠ অধিকারী তবুও এ ক্ষেত্রে সকলের শেষে উপস্থিত হওয়ার দরুণ সে আজ সর্ব্বকনিষ্ঠ, কেননা পৃথিবীর সকল হাটবাজার আজ অপরের সম্পত্তি। পরের হাটে কেনাবেচা করার অর্থ পরভাগ্যোপজীবী হওয়া ; সুতরাং এ পৃথিবীতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য জর্ম্মানী অপরের সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিতে বাধ্য। যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন উপায়ে জর্ম্মানীর পক্ষে তার

জাতীয় স্বার্থসাধন করা অসম্ভব। অতএব militarism হচ্ছে নবজর্ম্মানীর একমাত্র ধর্ম্ম।"

জেনেরাল বেয়ারণহার্ডি যে স্পষ্টবাদী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দস্যুতাকে ধর্ম্ম বলে প্রচার করতে লোকে সহজেই কুণ্ঠিত হয়। ও-রূপ মনোভাব প্রকাশ করতে হলে অপর দেশের লোকে অনেক বড় বড় নীতির কথায় তাকে চাপা দেয়।

কিন্তু জর্ম্মান-রাজমন্ত্রী কিম্বা জর্ম্মান-রাজসেনাপতির পক্ষে এ বিষয়ে কোনরূপ কপটতা করবার প্রয়োজন নেই। জর্ম্মানীর রাজ-গুরুপুরোহিতেরা যে নবশাস্ত্র রচনা করেছেন, জর্ম্মানীর রাজ-পুরুষদের রাজনীতি সেই শাস্ত্রসঙ্গত।

জর্ম্মান বৈজ্ঞানিকদের মতে ডারউইনের আবিষ্কৃত ইভলিউসনের নির্গলিতার্থ হচ্ছে—"জোর যার মুলুক তার"। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে মানুষে শুধু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবনটা যখন একটা মারামারি কাটাকাটি ব্যাপার, তখন যে মারতে প্রস্তুত নয় তাকে মরতে প্রস্তুত হতে হবে—এই হচ্ছে বিধির নিয়ম। ইভলিউসানের এই ব্যাখ্যা, Nietzsche-নামক একটি প্রতিভাশালী লেখক সমগ্র জর্ম্মানজাতিকে গ্রাহ্য করিয়েছেন। Nietzsche-র মতে দয়া মমতা পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি মনোভাব মানসিক রোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়, কেননা এ সকল মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে মানুষের প্রকৃতি দুর্ব্বল হয়ে পড়ে; এবং দুর্ব্বলতাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র পাপ এবং সবলতাই এক মাত্র পুণ্য; শক্তিই হচ্ছে একাধারে সত্য, শিব ও সুন্দর। ইউরোপীয় মানব যে এই সহজ সত্য ভুলে গেছল তার কারণ ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্ম-নামক রোগে জর্জ্জরিত।

খৃষ্টধর্ম্ম যে এসিয়ায় জন্মলাভ করেছে তার কারণ, এসিয়া-বাসীরা দাসের জাতি, সুতরাং তাদের সকল ধর্ম্মকর্ম্ম দাস-মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এসিয়ার cancer ইউ-রোপের দেহ হতে সমূলে উৎপাটিত করতে হলে অস্ত্রচিকিৎসা ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। ইউরোপের নব-যুগের সাম্য মৈত্রী প্রভৃতি মনোভাব ঐ প্রাচীন রোগের নূতন উপসর্গ মাত্র। সুতরাং ফরাসী ইংরাজ প্রভৃতি যে সকল জাতির দেহে এই সকল রোগের লক্ষণ দেখা যায়, তাদের উচ্ছেদ করা জর্ম্মান ক্ষত্রিয়দের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। Nietzsche-র এই মত জর্ম্মানজাতির মনে যে বসে গেছে, তার কারণ Nietzsche কালি-কলমে লেখেন নি, তার প্রতি অক্ষর বাটালি দিয়ে খোদা।

জর্ম্মান-পণ্ডিতদের মত, কেবলমাত্র জাতীয় স্বার্থের জন্য নয়, লোকহিতের জন্যও, জর্ম্মানীর পক্ষে দিগ্বিজয় করা আবশ্যক। জেনেরাল বেয়ারণহার্ডি বলেন "german labour এবং german idealism-এর প্রচার ব্যতীত, মানবজাতির উদ্ধার হবে না। সুতরাং যেমন তরবারির সাহায্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোককে জর্ম্মান-মাল গ্রাহ্য করাতে হবে, তেমনি ঐ একই উপায়ে জর্ম্মান-তত্ত্বকথাও গ্রাহ্য করাতে হবে। এই হচ্ছে জর্ম্মানীর বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।"

এস্থলে জর্ম্মান-idealism-এর অর্থ কাণ্ট-প্রভৃতির দর্শন নয়; কেননা বেয়ারনহার্ডি কাণ্টপ্রমুখ দার্শনিকদের অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। বেয়ারনহার্ডির মতে এই সকল বাহ্যজ্ঞানশূন্য বিষয়-বুদ্ধিহীন দার্শনিকদের অমার্জ্জনীয় অপরাধ এই যে, তারা বিশ্বমানবের কাছে শান্তির বারতা ঘোষণা করেছিলেন। জর্ম্মানী

আজ তাই তার নব-idealism প্রচার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। আধ্যাত্মিক জগতের নব্য-পন্থীদের সার কথা এই যে, বৈশ্য সভ্যতায় মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে। বৈশ্য-যুগে মানুষ আরামপ্রিয় ও ভোগবিলাসী হয়ে পড়ে। মানুষ বিষয়-প্রাণ হলে তার মনের শক্তি ও আত্মার শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যে, আত্মার অপেক্ষা দেহকে প্রাধান্য দেয় তার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে– মানবজীবনকে যতদূর সম্ভব নিরাপদ করে তোলাই এ সভ্যতার লক্ষ্য। ভয় না থাকলে ভক্তি থাকে না, অথচ বর্ত্তমান সভ্যতা জনসাধারণকে রাজভয়, দস্যুভয় ও মৃত্যুভয় এই ত্রিবিধ ভয় থেকে মুক্ত করেছে। অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা অবশ্য জীবনধারণের জন্য আবশ্যক কিন্তু অর্থকেই জীবনের সার পদার্থ করে তুললে মানুষ অন্তঃসার শূন্য হয়ে পড়ে। সুতরাং মানুষের মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার জন্য সামাজিক জীবন আবার বিপদ-সঙ্কুল করে তোলা দরকার। এ যুগে এক যুদ্ধ ব্যতীত অপর কোনও উপায়ে সে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পরে না। অতএব ইউরোপীয় সমাজকে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয় শাসনাধীন করা আবশ্যক; কেননা, বৈশ্যবুদ্ধি যুদ্ধের প্রতিকূল। এবং ইউরোপের রাজনীতি ক্ষাত্রধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করবার ক্ষমতা একমাত্র জর্ম্মানীর আছে; কেননা জর্ম্মানীর বৈশ্যশূদ্রের আজও কোনরূপ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেই। সুতরাং অর্থরাজ্যের উচ্ছেদ করে' পৃথিবীতে ধর্ম্মরাজ্যের সংস্থাপন করবার ভার জর্ম্মানীর হাতে পড়েছে। এই কারণে যুদ্ধ করা জর্ম্মানীর পক্ষে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য! জর্ম্মানীর নব-militarism-এর প্ররোচনাই এই যুদ্ধের সাক্ষাৎ কারণ।

এই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক militarism ইউরোপের

বর্ত্তমান সভ্যতার অনুবাদ নয়, প্রতিবাদ মাত্র। জর্ম্মানীর পরশ্রী কাতরতাই এর যথার্থ মূল, এবং এ মূল জর্ম্মানীর প্রাচীন ইতিহাস থেকে রস সঞ্চয় করেছে। জর্ম্মানীর বর্ত্তমান উচ্চ আশার ভাষা নতুন হলেও তার ভাব পুরাতন। মধ্যযুগে জর্ম্মানী একবার ইউরোপের সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীত্ব পদ লাভ করবার চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হয়েছিল; আশা করি এবারেও হবে। জর্ম্মান-জাতির যথেষ্ট বাহুবল বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল আছে কিন্তু বিস্‌মার্কের হাতে-গড়া জর্ম্মান-সাম্রাজ্যের অন্তরে নৈতিক বল নেই; সুতরাং জর্ম্মানীর দিগ্বিজয়ের আশা দুরাশা মাত্র। এ যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক, ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতাকে এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে না; কারণ militarism সে সভ্যতার গৃহশত্রু।

ইউরোপের সকলজাতির দেহেই এই militarism অল্প-বিস্তর স্থান লাভ করেছে; একমাত্র জর্ম্মানী তা পূর্ণমাত্রায় অঙ্গীকার করেছে। যা অপর সকল জাতির অন্তরে বাষ্পাকারে বিরাজ করছে জর্ম্মানীতে তা জমে বরফ হয়ে গেছে। সুতরাং এই সমরানলে এই বরফের কাঠিন্যের অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। যদি এই অগ্নিতে militarism ভস্মসাৎ হয় তাহলে যে, কেবল অপরজাতি সকলের মঙ্গল হবে শুধু তাই নয়, জর্ম্মানীও পরিবর্দ্ধিত না হোক, সংশোধিত হবে। যে জাতি মানবাত্মার সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে, যে দেশে কাণ্ট, হেগেল, গেটে, শিলার, বেটোভেন, মোজার্ট জন্মলাভ করেছে, সে জাতির কাছে ইউরোপীয় সভ্যতা চিরঋণী। এই militarism-এর মোহমুক্ত হলে সে জাতি আবার মানবসভ্যতার প্রবল সহায় হবে।

Militarism হেয় বলে' বর্ত্তমান বৈশ্যসভ্যতাই যে শ্রেয় একথা আমি বলতে পারি নে। কোন সভ্যতাই নিরাবিল ও নিষ্কলুষ নয়,—বৈশ্য সভ্যতাও নয়। তবে কোনও বর্ত্তমান সভ্যতার দোষগুণ বিচার করতে হলে', তার অতীতের প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখা চাই, তার ভবিষ্যতের প্রতিও তদ্রূপ দৃষ্টি রাখা চাই। বর্ত্তমান যে, অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলমাত্র—এ কথা ভোলা উচিত নয়। বর্ত্তমানের যে-সকল দোষ স্পষ্ট লক্ষিত হচ্ছে ভবিষ্যতে তার নিরাকরণ হবার আশা আছে কি না, এ সভ্যতা স্বীয় শক্তিতে স্বীয় রোগমুক্ত হতে পারবে কি না,—এই হচ্ছে আসল জিজ্ঞাস্য। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার সে শক্তি আছে। সে যাইহোক, বৈশ্য-সভ্যতার রোগ-সারাবার বৈধ উপায় হচ্ছে মন্ত্রৌষধির প্রয়োগ—জর্ম্মানীর অস্ত্রচিকিৎসা নয়।

অগ্রহায়ণ, ১৩২১ সন।

নূতন ও পুরাতন।

(১)

আমাদের সমাজে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ টন্‌টনে হয়ে উঠেছে, এরূপ ধারণা আমার নয়। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমরা সকলেই এক-পথের পথিক, এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কেউ বা পুরাতনের কাছ থেকে বেশি সরে এসেছি—কেউ বা কম। আমাদের মধ্যে আসল বিরোধ হচ্ছে মত নিয়ে। মনো-জগতে আমরা নানা-পন্থী। আমাদের মুখের কথায় ও কাজে যে সব সময়ে মিল থাকে, তাও নয়।

এমন কি, অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যাদের সামাজিক ব্যবহারে সম্পূর্ণ ঐক্য আছ, তাদের মধ্যেও সামাজিক মতামতে সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকে,—অন্তত মুখে। সুতরাং নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে ত, সে সাহিত্যে,—সমাজে নয়।

এ বাদানুবাদ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তাই শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এই পরস্পর-বিরোধী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করে দিতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন, যেটি অবলম্বন করলে নূতন ও পুরাতন হাত-ধরাধরি করে উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। যে পথে দাঁড়ালে নূতন ও পুরাতন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করতে বাধ্য হবে, এবং উভয়ে মনের মিলে সুখে থাকবে। সে পথের

পরিচয় নেওয়াটা অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক। যারা এ-পথও জানে, ও-পথও জানে কিন্তু দুঃখের বিষয় মরে আছে, তারা হয় ত একটা নিষ্কণ্টক মধ্য-পথ পেলে বেঁচে উঠবে।

(২)

ঘটকালি করতে হলে ইনিয়ে-বিনিয়ে-বানিয়ে নানা কথা বলাই হচ্ছে মামুলি দস্তুর। সুতরাং নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধ করতে গিয়ে বিপিনবাবুও নানা কথার অবতারনা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার অনেক ছোটখাট কথা সত্য, আর কতক বড় বড় কথা নতুন। তবে তাঁর কথার ভিতর যা সত্য তা নতুন নয়, আর যা নতুন তা সত্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখা আবশ্যক।

বিপিনবাবু প্রথমে আমাদের সমাজে নূতন ও পুরাতনের বিরোধের কারণ নির্ণয় করে', পরে তার সমন্বয়ের উপায়-নির্দ্দেশ করেছেন।

তাঁর মতে আমরা—

"ইংরাজি শিখিয়া ইউরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া * * * ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম।"

এই ছোটাটাই হচ্ছে নূতন, এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এইখানেই সূত্রপাত। আবার আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। অতএব এখন মিলনের কাল উপস্থিত হয়েছে। গত-শতাব্দিতে দেশসুদ্ধ লোকের মন যে এক-লম্ফে সমুদ্রলঙ্ঘন করে' বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছিল, এবং এ শতাব্দিতে সে মন যে আবার উল্টো লাফে দেশে ফিরে' এসেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

আমাদের মনের দিক্ থেকে দেখতে গেলে, উনবিংশ শতাব্দি ও বিংশ শতাব্দিতে যে বিশেষ কোনও প্রভেদ আছে, তা নয়, যদি থাকে ত সে উনিশ-বিশ। আজকালকার দিনে, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব, ঢের বেশি লোকের মনে ঢের বেশি পরিমাণে স্থান লাভ করেছে। বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বহু ইউরোপীয় মনোভাব দেশের মনে এত বসে গেছে যে, সে ভাব দেশী কি বিদেশী তাও আমরা ঠাওর করতে পারিনে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, একটি বিশেষজাতীয় মনোভাব, যার ক থেকে ক্ষ পর্য্যন্ত প্রতি অক্ষর বিদেশী, তাকে আমরা বলি "স্বদেশী"।

ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরের দিকটা দেখে' অবশ্য জনকতক সেদিকে ছুটেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাঁদের ঘরে ফিরে' না আসাতে দেশের কোনও ক্ষতি নেই, বরং তাঁদের ফেরাতে বিপদ আছে। বিপিনবাবু বলেন—

"এ কথা সত্য নয় যে, একদিন আমরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম, আজ বাড়ি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।"

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের মধ্যে যারা ইউরোপের সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে বেড়া ভেঙ্গে ছুটেছিল, তারাই আবার বাড়ি খেয়ে বাড়ী ফিরেছে। পাঁচনই তাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করেছে। কেননা ও-জাতির অন্ধতা সারাবার শাস্ত্রসঙ্গত বিধান এই—"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণংছিত্ত্বা" দেগে দেওয়া।

বিপিনবাবু বলেন—

"কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি বিচার বিবেচনাবিরহিত হইয়াই,

স্বদেশের যাহা-কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিপিনবাবুর মতে এরূপ মনে করা ভুল। কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে যে মোটেই বিরল নয়, সে কথা "নারায়ণ" পত্রে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন। তাঁর মতে—

"য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া ইউরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না, আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশি করিয়া কিয়ৎপরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি।"

ডাক্তার শীল বলেন, এরূপ বিচার "স্বজাতি-পক্ষপাতিত্ব-দোষে দুষ্ট অতএব সত্যভ্রষ্ট।" আমাদের পক্ষে এরূপ মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে যে সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করা হয়, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কেননা, ইউরোপের জনসাধারণের জাতীয় অহঙ্কার জাতীয় অভ্যুদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের জাতীয় অহঙ্কার জাতীয় হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইউরোপের অহঙ্কার তার কৃতিত্বের সহায়, আমাদের অহঙ্কার আমাদের অকর্ম্মণ্যতার পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এ শ্রেণীর লোকের দ্বারা নূতন ও পুরাতনের বিরোধের যে সমন্বয় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা। যাঁরা মদ ছেড়ে আফিং ধরেন, তাঁরা যদি কোন-কিছুর সমন্বয় করতে পারেন ত, সে হচ্ছে এই দুই

নেশার। মদ আর আফিং এই দু'টি জুড়িতে চালাতে পারে সমাজে এমন লোকের অভাব নেই।

আসল কথা, নব-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে নশ' নিরনব্বই জন কস্মিনকালে প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। অদ্যাবধি তাঁরা কেবলমাত্র অশনে বসনে ব্যসনে ও ফ্যাসনে সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে আসছেন; কেননা, এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করবার দরুণ তাঁদের কোনরূপ সামাজিক শাস্তিভোগ করতে হয় না। পুরাতন সমাজ-ধর্ম্মের অবিরোধে নূতনকামের সেবা করাতে সমাজ কোনওরূপ বাধা দেয় না, কাজেই শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেওয়াটাই তাঁদের জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এ শ্রেণীর লোকেরা দায়ে পড়ে সমাজের যে-সকল পুরোনো নিয়ম মেনে চলেন, অপরের গায়ে পড়ে তারই নতুন ব্যাখ্যা দেন। এঁরা নূতন পুরাতনে বিরোধ ভঞ্জন করেন নি—যদি কোন-কিছুর সমন্বয় করে থাকেন ত, সে হচ্ছে সামাজিক সুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত আরামের সমন্বয়।

পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধের সৃষ্টি সেই দু-দশজনে করেছেন, যাঁরা সমাজের মরচে-ধরা চরকায় কোনওরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন—সে তেল দেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক। এর প্রমাণ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর, দয়ানন্দ স্বামী, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এর প্রথম তিন জন সমাজের দেহে যে স্নেহ প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি খাঁটি দেশী এবং সংস্কৃত। অথচ এঁরা সমাজদ্রোহী বলে গণ্য।

সমাজ সংস্কার, অর্থাৎ পুরাতনকে নূতন করে তোলবার চেষ্টাতেই এদেশে নূতন-পুরাতনে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপিনবাবুর মুখের কথায় যদি এই বিরোধের সমন্বয় হয়ে যায়, তাহলে আমরা সকলেই আশীর্ব্বাদ করব যে, তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

(৩)

দু'টি পরস্পর-বিরোধী পক্ষের মধ্যস্থতা করতে হ'লে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, অথচ একপক্ষ-না-একপক্ষের প্রতি টান থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বিপিনবাবুও এই সহজ মানবধর্ম্ম অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর নানান উল্টোপাল্টা কথার ভিতর থেকে তাঁর নূতনের বিরুদ্ধে নূতন ঝাঁজ ও পুরাতনের প্রতি নূতন ঝোঁক ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তাঁর একটি কথার উল্লেখ করছি।

সকলেই জানেন যে, পুরাতন, সংস্কারের নাম শুনতে পারে না, কারণ সুপ্তকে জাগ্রত করবার জন্য নূতনকে পুরাতনের গায়ে হাত দিতে হয়—তাও আবার মোলায়েমভাবে নয়,—কড়াভাবে। বিপিনবাবু তাই সংস্কারকের উপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পালমহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজকে অটল করতে চায় তাদের পক্ষে।

বিপিন বাবু বলেন—

"দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই।"

দুনিয়াটা যে কি কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আমরা জানি নে, তার কারণ সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ও-কাজ করেন নি। তবে তিনি যে পালমহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে

সৃষ্টি করেছেন, এমনও ত মনে হয় না। কারণ, দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্ট হোক, বক্তৃতাকারের গলা সাধবার জন্য হয় নি। সৃষ্টির পূর্ব্বের খবর আমরাও জানি নে, বিপিনবাবুও জানেন না; কিন্তু জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক তা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। ম্লেচ্ছ-ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দু-দর্শনের ভাষায় তার নাম—"ইদং"। ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল "নারায়ণ" পত্রে সেই ইদং-এর নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়েছেন—

"ইদংকে যে জানে, যে ইদং-এর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া যাহাকে এই ইদং-এর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়, সেই মানুষ অহং পদবাচ্য।"

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার জ্ঞাতা ও কর্ত্তা। শুধু তাই নয়, মানুষ ইদং-এর কর্ত্তা বলেই তার জ্ঞাতা। মনোবিজ্ঞানের মূল সত্য এই যে, বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যদি ক্রিয়া ও প্রতি-ক্রিয়ার কারবার না থাকত, তাহ'লে তার কোনওরূপ জ্ঞান আমাদের মনে জন্মাত না। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার মূলসম্পর্ক ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে। আমাদের ক্রিয়ার বিষয় না হ'লে, দুনিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ও হত না—অর্থাৎ তার কোনও অস্তিত্ব থাকত না। এবং সে ক্রিয়াফল হচ্ছে ইদং-এর "পরিচালন ও পরিবর্ত্তন",—আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সংস্কার। সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব না জানলেও মানুষে এ কথা জানে যে, তার জীবনের নিত্য কাজ হচ্ছে সৃষ্ট পদার্থের সংস্কার করা। মানুষ যখন লাঙ্গলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে, তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অপর কোনও কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে

সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ঋষির কাজও কৃষিকাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয়,—অহং। সুতরাং সংস্কারকদের উপর বক্র দৃষ্টিপাত করে বিপিনবাবু দৃষ্টির পরিচয় দেন নি, পরিচয় দিয়েছেন শুধু বক্রতার।

শাস্ত্রে বলে যে, ক্রিয়াফল চার প্রকার—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজ্য, যার সংস্কারে হাত দেন তারই বিকার ঘটান, এমন লোকের অভাব যে বাঙলায় নেই, সম্প্রতি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। একই উপাদান নিয়ে কেউ গড়েন শিব, কেউ বা বাঁদর। এ অবশ্য মহা আক্ষেপের বিষয়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, দেশসুদ্ধ লোকের মাটির সুমুখে হাতজোড় করে বসে থাকতে হবে।

(৪)

বিপিনবাবুর মতে নূতনে-পুরাতনে মিলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নূতন; কারণ নূতনই হচ্ছে মূল বিবাদী। সুতরাং নূতনকে বাগ মানাতে হলে, তাকে কিঞ্চিৎ আক্কেল দেওয়া দরকার।

নূতন তার গোঁ ছাড়তে চায় না, কেননা সে চায় উন্নতি। কিন্তু সে ভুলে যায় যে, জাগতিক নিয়মানুসারে—উন্নতির পথ সিধে নয়, পেঁচালো। উন্নতি যে পদে পদে অবনতিসাপেক্ষ, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। বিপিনবাবু এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির বক্ষ্যমান রূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

"তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানব সমাজ একটা সরল রেখার ন্যায় উর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না। * * কিন্তু ঐ তালগাছে কোন

সতেজ ব্রততী যেমন তাহাকে বেড়িয়া বেড়িয়া উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটির গায়ে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও, প্রতি স্তরেই উপরে উঠিবার জন্যই একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যক-গতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে, ইহাকে স্পাইরাল মোষন (spiral motion) বলে। সমাজবিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইরাল, একান্ত সরল নহে। * * আপনার গতিবেগের অবিছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধমুখী তির্য্যক-গতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।”

বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতি-তত্ত্ব যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ; কিন্তু সত্য কি না তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

বিপিনবাবু বলেন যে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, সত্যজ্ঞান নয়,—ভ্রম। একথা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু রজ্জুতে লতাজ্ঞান যে সত্যজ্ঞান, এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ কি ? রজ্জু জড়পদার্থ, এবং “সতেজ ব্রততী” সজীব পদার্থ। দড়ি বেচারার আপনার “গতিবেগ” বলে’ কোনরূপ গুণ, কি দোষ নেই। ও-বস্তুকে ইচ্ছে করলে নীচে থেকে জড়িয়ে উপরে তুলতে পার, উপর থেকে জড়িয়ে নীচে নামাতে পার, লম্বা করে ফেলতে পার, তাল-পাকিয়ে রাখতে পার। রজ্জু উন্নতি, অবনতি, তির্য্যকগতি, কি সরল গতি—কোনরূপ ধার ধারে না। বিপিনবাবু এ ক্ষেত্রে রজ্জুর যে ব্যবহার করেছেন, তা জ্ঞানের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারপর বিপিনবাবু এ সত্যই বা কোন বিজ্ঞান থেকে উদ্ধার করলেন যে, মানুষের মন ও মানব-সমাজ উদ্ভিদ জাতীয়? Psychology এবং Sociology যে Botany-র অন্তর্ভূত, একথা ত কোনও কেতাবে কোরাণে লেখে না। তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত উদ্ভিদ-তত্ত্ব মেনে নিলেও সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয় না। মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মানুষের মন ও মানব-সমাজ উদ্ভিদ হলেও, ঐ দুই পদার্থ যে লতাজাতীয়, এবং বৃক্ষজাতীয় নয়, তারই বা প্রমাণ কোথায়? গাছের মত সোজাভাবে সরলরেখায় মাথা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা যে মানবধর্ম্ম নয়, কোন্ যুক্তি, কোন্ প্রমাণের বলে বিপিনবাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা আমাদের জানানো উচিত ছিল; কেননা পালমহাশয়ের আপ্তবাক্ আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই। উক্তি যে যুক্তি নয়, এ জ্ঞান বিপিন-বাবুর থাকা উচিত। উত্তরে হয় ত তিনি বলবেন যে, ঊর্দ্ধগতি-মাত্রেই তির্য্যকগতি—এই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঊর্দ্ধগতি-মাত্রকেই যে স্ক্রুর আকার ধারণ করতে হবে, জড়জগতের এমন কোন বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না জানি নে। যদি থাকে ত মানুষের মতিগতি যে সেই একই নিয়মের অধীন, একথা তিনিই বলতে পারেন—যিনি জীবে জড় ভ্রম করেন।

"আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধমুখী তির্য্যকগতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।"

বিপিনবাবুর এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল, তা তাঁর প্রদর্শিত উদাহরণ থেকেই প্রমাণ করা যায়। "তালগাছ যে সরল ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠে"—তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যে নিজের জোরে ওঠে সে সিধেভাবেই ওঠে; আর যে পরকে

আশ্রয় করে ওঠে সেই পেঁচিয়ে ওঠে, যথা—তরুর আশ্রিত লতা।

দশ ছত্র রচনার ভিতর Dynamics, Botany, Sociology, Psychology প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের নানা সূত্রের এহেন জড়াপট্‌কি বাধানো যে সম্ভব, এ জ্ঞান আমার ছিল না। সম্ভবত পালমহাশয় যে "নূতন দৃষ্টি" নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, স্বর্গের সিঁড়ি—গোল সিঁড়ি। যদি তাই হয়, তাহ'লে এ কথাও মানতে হবে যে, পাতালের সিঁড়িও গোল; কারণ ওঠা-নামার জাগতিক নিয়ম অবশ্যই এক। সুতরাং ঘুরপাক খাওয়ার অর্থ ওঠাও হতে পারে, নামাও হতে পারে। এ অবস্থায় উন্নতিশীলের দল যদি কুটিল পথে না চ'লে সরল পথে চলতে চান, তাহ'লে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

(৫)

বিপিনবাবু যে তাঁর প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পর্য্যায়ে নানারূপ পরস্পর-বিরোধী বাক্য একত্র করতে কুণ্ঠিত হন নি, তার কারণ তিনি ইউরোপীয় দর্শন হতে এমন এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। হেগেলের Thesis, Antithesis এবং Synthesis, এই ত্রিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভূত সকল লোক যে ধরা পড়বে তার আর আশ্চর্য্য কি? হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, "ভাব" (Being) এবং "অভাব" (Non-Being) এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী,—এবং এই দু'য়ের সমন্বয়ে যা দাঁড়ায় তাই হচ্ছে "স্বভাব" (Becoming)।

মানুষের মনের সকল ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টি-প্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কেননা এ জগৎ চৈতন্যের লীলা। অর্থাৎ তাঁর লজিক এবং ভগবানের লজিক যে একই বস্তু, সে বিষয়ে হেগেলের মনে কোনরূপ দ্বিধা ছিল না। তার কারণ হেগেলের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভগবানের শুধু অবতার নন—স্বয়ং ভগবান। হেগেলের এই ঘরের খবর তাঁর সপ্রতিভ শিষ্য কবি হেনরি হাইনের (Henri Heine) গুরুমারা-বিদ্যের গুণে ফাঁস হয়ে গেছে। বিপিনবাবুরও বোধ হয় বিশ্বাস যে, হেগেলের কথা হচ্ছে দর্শনের শেষ কথা। সে যাই হোক, হেগেলের এই পশ্চিম-মীমাংসার বলে বিপিনবাবু নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় করতে চান। তিনি অবশ্য শুধু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন—তার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের।

(৬)

হেগেলের মত একে নতুন তার উপর বিদেশী; সুতরাং পাছে তা গ্রাহ্য করতে আমরা ইতস্তত করি এই আশঙ্কায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হেগেলও যা, বেদান্তও তাই, সাংখ্যও তাই।

সমন্বয় অর্থে বিপিনবাবু কি বোঝেন, তার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মতে—

"সমন্বয় মাত্রেই যে-বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই দাবী দাওয়া কিছু কাটিয়া ছাঁটিয়া, একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেওয়া।"

অর্থাৎ Thesis-কে কিছু ছাড়তে এবং Antithesis-কে কিছু ছাড়তে হবে, তবে Synthesis ডিক্রি পাবে। তাঁর

দর্শনের এ ব্যাখ্যা শুনে সম্ভবত হেগেলের চক্ষুস্থির হয়ে যেত; কেননা তাঁর Synthesis কোনরূপ রফাছাড়ের ফল নয়। তাতে Thesis এবং Antithesis দু'টিই পূরামাত্রায় বিদ্যমান; কেবল দু'য়ে মিলিত হয়ে একটি নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। Synthesis-এর বিশ্লেষণ করেই Thesis এবং Antithesis পাওয়া যায়। এর আধখানা এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্দ্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি নয়।

তারপর মীমাংসা অর্থে যদি রফাছাড়ের নিষ্পত্তি হয়, তাহ'লে বলতেই হবে যে, বিপিনবাবুর মীমাংসার সঙ্গে ব্যাস জৈমিনির মীমাংসার কোনই সম্পর্ক নেই। বেদান্তের মীমাংসা আর যাই হোক, আপোষ-মীমাংসা নয়। বেদান্তদর্শন নিজের দাবীর এক পয়সাও ছাড়ে নি, কোন বিরোধী-মতের দাবীর এক পয়সাও মানে নি। উত্তর মীমাংসাতে অবশ্য সমন্বয়ের কথা আছে, কিন্তু সে সমন্বয়ের অর্থ যে কি, তা শঙ্কর অতি পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"এ সূত্র বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র, অনুমান বা যুক্তি গাঁথিবার নহে। ইহাতে নানাস্থানস্থ বেদান্তবাক্য সকল আহৃত হইয়া মীমাংসিত হইবে।"

এবং শঙ্করের মতে মীমাংসার অর্থ "অবিরোধী তর্কের সহিত বেদান্তবাক্য-সমূহের বিচার"। এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বেদান্ত-বাক্যসমূহ পরস্পরবিরোধী নয়। হেগেলের পশ্চিম মীমাংসার সহিত ব্যাসের উত্তর মীমাংসার কোনও মিল নেই;—না মতে, না পদ্ধতিতে, ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্ম, হেগেলের প্রতিপাদ্য বিষয় অপরব্রহ্ম। নিরুক্তের মতে ভাববিকার ছয় প্রকার, যথা—সৃষ্টি, স্থিতি, হ্রাস, বৃদ্ধি,

বিপর্য্যয় ও লয়। শঙ্কর হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়কে গণনার মধ্যে আনেন নি, কেননা তাঁর মতে এ তিনটি হচ্ছে স্থিতিকালের ভাববিকার। অপর পক্ষে এই তিনটি ভাবই হচ্ছে হেগেলের অবলম্বন, কেননা তাঁর absolute হচ্ছে eternal becoming। সুতরাং হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম—অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া-রাজ্যে বিগ্রহবান হয়েছিলেন। শঙ্কর যে জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, সে জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া নয়; অপর পক্ষে হেগেলের জ্ঞান, ক্রিয়ারই যুগপৎ কর্ত্তা ও কর্ম্ম।

বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় যুক্তি নয়; অপর পক্ষে হেগেলের মতে যুক্তির উপরেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে। Thesis এবং Antithesis-এর সুতোয় সুতোয় গেরো দিয়েই এক একটি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত পাওয়া যায়। বেদান্তের ব্রহ্ম স্থির-বর্ত্তমান, হেগেলের ব্রহ্ম চির-বর্দ্ধমান—অর্থাৎ একটি static, অপরটি dynamic। আসল কথা এই যে, বেদান্ত যদি Thesis হয়, তাহ'লে হেগেল তার Antithesis—এ দুই মতের অভেদ জ্ঞান শুধু অজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব।

(৭)

বিপিনবাবুর হাতে পড়ে' শুধু বাদরায়ণ নয়, কপিলও হেগেলে লীন হয়ে গেছেন।

বিপিনবাবু আবিষ্কার করেছেন যে, যার নাম thesis, antithesis এবং synthesis, তারই নাম তম, রজ ও সত্ত্ব।

কেননা তাঁর মতে thesis-এর বাঙলা হচ্ছে স্থিতি, antithesis-এর বাঙলা বিরোধ, এবং synthesis-এর বাঙলা সমন্বয়। এ অনুবাদ অবশ্য গায়ের জোরে করা। কেননা thesis যদি স্থিতি হয়, তাহলে antithesis অ-স্থিতি (গতি), এবং synthesis সংস্থিতি। সে যাই হোক, সাংখ্যের ত্রিগুণের সঙ্গে অবশ্য হেগেলের ত্রিসূত্রের কোনও মিল নেই ; কেননা সাংখ্যের মতে এই ত্রিগুণের সমন্বয়ে জগতের লয় হয়,—সৃষ্টি হয় না। সত্ত্ব রজ তমের মিলন নয়, বিচ্ছেদই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ ; অপরপক্ষে হেগেলের মতে thesis এবং antithesis-এর মিলনের ফলে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিপিনবাবুর ন্যায় পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দর্শনের সমন্বয়-কারের কাছে অবশ্য এ সকল পার্থক্য, তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর ; অতএব সর্ব্বথা উপেক্ষনীয়।

তম ও রজের মিলনে যে বস্তু জন্মলাভ করে, তা হেগেলের synthesis হতে পারে, কিন্তু তা সাংখ্যের সত্ত্ব নয়। এ কথা দুটি-একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের মন ও মানব-সমাজের উন্নতির পদ্ধতি। বিপিনবাবুর উদ্ভাবিত কপিল-হেগেল-দর্শন-অনুসারে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

তামসিক-মন = সুপ্ত রাজসিক-মন = জাগ্রত

সাত্ত্বিক-মন = ঝিমন্ত

তামসিক-সমাজ = মৃত রাজসিক-সমাজ = জীবিত

সাত্ত্বিক-সমাজ = জীবন্মৃত

অর্থাৎ সমন্বয়ের ফলে রজোগুণের উন্নতি নয়, অবনতি হয়। সত্ত্বগুণ যে তমোগুণ এবং রজোগুণের মাঝামাঝি একটি পদার্থ, এ কথা সাংখ্যাচার্য্যেরা অবগত নন, কেননা তাঁরা হেগেল পড়েন

নি। উক্ত দর্শনের মতে সত্বগুণ রজোগুণের অতিরিক্ত, অন্তর্ভূত নয়। সাত্বিক-ভাব যে বিরোধের ভাব নয়, তার কারণ রজোগুণ যখন তমোগুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়, তখনই তা সত্বগুণে পরিণত হয়। হেগেলের মত অবশ্য সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যকে উল্টে ফেল্‌লে যা হয়, তারই নাম হেগেল-দর্শন। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অনুলোমক্রমে স্থূল হয়, হেগেল-মতে ঐ একই পদ্ধতিতে স্থূল সূক্ষ্ম হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি হেগেলের পুরুষ। সাংখ্যের মতে সৃষ্টিতে প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হন, হেগেলের মতে পুরুষ সাকার হন।

বিপিনবাবু দেশী-বিলাতি-দর্শনের সমন্বয় করে' যে মীমাংসা করেছেন সে হচ্ছে অপূর্ব্ব মীমাংসা—কেন না, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ইতিপূর্ব্বে এরূপ অদ্ভুত মীমাংসা আর কেউ করেন নি।

নূতন-পুরাতনের সমন্বয়ের এই যদি নমুনা হয়—তাহলে নূতন ও পুরাতন উভয়েই সমন্বয়কারকে বলবে—"ছেড়ে দে বাবা, লড়ে' বাঁচি।"

বিপিনবাবু যাকে সমন্বয় বলেন, বাঙ্গলা ভাষায় তার নাম খিচুড়ি।

সমাজ-দেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়ি-ভোগ নিবেদন করে দিয়েছেন, যিনি তার প্রসাদ পাবেন তাঁর যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আসল কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের মোট কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনও বিশেষ সমস্যার মীমাংসা করা নয়, —তার কাছ থেকে পলায়ন করা। দর্শন কি বিজ্ঞান যে আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন নি যার সাহায্যে কোনও বিশেষ বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা করা

যায়—তার কারণ সকল বিশেষ বস্তুর বিশেষত্ব বাদ দিয়েই সর্ব্বসাধারণে গিয়ে পৌঁছান যায়। বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা বিশ্বতত্ত্ব লাভ করেন। সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেওয়াই দার্শনিকদের চিরকেলে অভ্যাস। এ উপায়ে সম্ভবত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ হয় না। সমাজের উন্নতি দেশ-কাল-পাত্র সাপেক্ষ, সুতরাং দেশ-কালের অতীত কিম্বা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমান বলবৎ কোনও সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা। Physics কিম্বা Metaphysics-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়, এবং এ দুই তত্ত্ব যে পৃথক জাতীয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিপিনবাবুর আবিষ্কৃত ঊর্দ্ধগতির দৃষ্টান্ত থেকেই দেখানো যেতে পারে। এমন কোনও জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়, এ তিনই জীবনের ধর্ম্ম—সুতরাং সমাজের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ। তা ছাড়া মানবের উন্নতি যে ক্রমোন্নতি হতে বাধ্য, এমন কোনও নিয়মের পরিচয় ইতিহাসে দেয় না। বরং ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বিপর্য্যয়ের ফলেই মানব অনেক সময়ে মহা উন্নতি লাভ করেছে। যে সব মহাপুরুষকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করি,—যথা বুদ্ধদেব, যিশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি এঁরা মানুষের মনকে বিপর্য্যস্ত করেই মানব-সমাজকে উন্নত করেছেন ;—এঁরা Spiral motion-এর ধার ধারতেন না, কিম্বা স্থিতি ও গতির মধ্যে দূতীগিরী করে তাদের মিলন ঘটানও নিজেদের কর্ত্তব্য বলে মনে করেন নি।

মানুষের মনকে যদি গেরোবাজের মত আকাশে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে উঠতে হত, এবং মানব-সমাজকে যদি লোটনের মত মাটিতে লুটুতে লুটুতে এগোতে হত, তাহলে এ দুয়ের বেশিক্ষণ সে কাজ করতে হত না,—দুদণ্ডেই তাদের ঘাড় লট্‌কে পড়ত। সুতরাং কি মন, কি সমাজ, কোনটিকেই পাকচক্রের ভিতর ফেল্‌বার আবশ্যকতা নেই। বিপিনবাবুর বক্তব্য যদি এই হয় যে, পৃথিবীতে অবাধগতি বলে কোন জিনিস নেই, তাহলে আমরা বলি—এ সত্য শিশুতেও জানে যে পদে পদে বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হতে হয়। তাই বলে স্থিতি-গতির সমন্বয় করে চলার অর্থ যে শুধু হামাগুড়ি দেওয়া, এ কথা শিশুতেও মানে না। অধোগতি অপেক্ষা উন্নতির পথে যে অধিকতর বাধা অতিক্রম করতে হয়, এ ত সর্ব্ব-লোকবিদিত। কিন্তু এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, স্থিতির বিরুদ্ধে গতি নামক "বিরোধটি জাগিয়ে" রাখা মূর্খতা—এবং সেটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফূর্ত্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে, জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙ্গে পড়ে তার চাইতে যা গড়ে ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি। কোনও নূতনের বরের ঘরের পিসি ও পুরাতনের কনের ঘরের মাসির মধ্যস্থতায় এ দুই পক্ষের ভিতর যে চির-শান্তি স্থাপিত হবে—এ আশা দুরাশামাত্র।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, "নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও

বিবাদ থাকে ত সে সাহিত্যে—সমাজে নয়।" আমার বিশ্বাস যদি অন্যরূপ হত, তাহলে আমি বিপিনবাবুর কথার প্রতিবাদ করতুম না। তার কারণ, প্রথমতঃ আমি সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী। অতএব এ ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় এবং কোন্‌টি বিগ্রহের এবং কোন্‌টি সন্ধির যুগ তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ বিপিনবাবুর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নূতন-পুরাতনের জমাখরচ করলে, সামাজিক হিসাবে পাওয়া যায় শুধু শূন্য। সুতরাং কি নূতন, কি পুরাতন, কোন পক্ষই ও উপায়ে কোন সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টামাত্রও করবেন না। তৃতীয়তঃ ডাক্তার শীলের মতে—

"সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে, তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই।"

যে সমাজ হাজার বৎসর একস্থানে একভাবে বসে আছে তার আসন টলাবার শক্তি আমাদের মত সাহিত্যিকের শরীরে নেই। বিপিনবাবুর মতামত কর্ম্মকাণ্ডের নয়, জ্ঞানকাণ্ডের বস্তু বলেই এ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাঁর বর্ণিত সমন্বয়ের কোনও সার্থকতা সমাজে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে নেই। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে দুধের সঙ্গে জলের সমন্বয় প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে সাহিত্যে জলোদুধের আমদানি আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারিনে। কারণ ও বস্তু অন্তরাত্মার পক্ষে মুখরোচকও নয়—স্বাস্থ্যকরও নয়। অথচ সরস্বতীর মন্দিরে কিঞ্চিৎ দুধ আর কিঞ্চিৎ মদের সমন্বয় যে জ্ঞানামৃত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যের এই Punch পান

করে আমাদের সমাজের আজ মাথা ঘুরছে। এই ঘুরুনির চোটে অনেকে চোখে এতটা ঝাপ্‌সা দেখেন যে কোন্ বস্তু নূতন আর কোন্ বস্তু পুরাতন, কোন্‌টি স্বদেশী আর কোন্‌টি বিদেশী—তাও তাঁরা চিনতে পারেন না। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর প্রথম দরকার—সমাজে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় নয়—মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো। আমাদের শিক্ষা যাকে একসঙ্গে গুলে ঘুলিয়ে দিচ্ছে—আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত—তাই বিশ্লেষণ করে পরিষ্কার করা।

পৌষ, ১৩২১ সন।

———

বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কি ?

—:*:—

শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রবাবুর "বাস্তব"-নামক প্রবন্ধের প্রতিবাদে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তর্কই হচ্ছে আলোচনার প্রাণ। পৃথিবীর অপর-সকল বিষয়ের ন্যায় সাহিত্য সম্বন্ধেও কোন মীমাংসায় উপস্থিত হতে হলে, বাদী-প্রতিবাদী উভয়-পক্ষেরই উক্তি শোনাটা দরকার।

এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রবাবুর কাব্যের দোষগুণ বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তার কারণ, রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে বস্তু-তন্ত্রতা নেই বললে আমার বিশ্বাস কিছুই বলা হয় না। কোন্ কাব্যে কি আছে তাই আবিষ্কার করা এবং প্রকাশ করাই হচ্ছে সমালোচনার শুধু মুখ্য নয়,—একমাত্র উদ্দেশ্য। অবিমারকে যা আছে শকুন্তলায় তা নেই, শকুন্তলায় যা আছে মৃচ্ছকটিকে তা নেই, এবং মৃচ্ছকটিকে যা আছে উত্তররামচরিতে তা নেই—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য হলেও, এ সত্যের দৌলতে আমাদের কোনরূপ জ্ঞানবৃদ্ধি হয় না। কোন এক ব্যক্তি Iceland সম্বন্ধে একখানি একছত্র বই লেখেন। তাঁর কথা এই যে, "Iceland-এ সাপ নেই।" এই বইখানি সম্বন্ধে ইউরোপের সকল সমালোচক একমত এবং সে মত এই যে, উক্ত পুস্তকের সাহায্যে Iceland-সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় না।

কোন বিশেষ পদার্থের অভাব নয়, সদ্ভাবের উপরেই মানুষের মনে তদ্বিষয়ক জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রবাবুর কাব্য-সম্বন্ধে রাধাকমলবাবুর মতের প্রতিবাদ করাও আমার উদ্দেশ্য নয়। কোন একটি মতের খণ্ডন করতে হলে সে মতটি যে কি তা জানা আবশ্যক। "Iceland-এ সাপ নেই"—এ কথা অপ্রমাণ করবার জন্য লোককে দেখিয়ে দেওয়া দরকার যে, সে দেশে সাপ আছে, এবং তার জন্য সাপ যে কি-বস্তু সে বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে "বস্তুতন্ত্রতা" আছে, কি নেই, সে বিচার করতে আমি অপারগ, কেননা রাধাকমলবাবুর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে "বস্তুতন্ত্রতা" যে কি বস্তু তার পরিচয় আমি লাভ করতে পারি নি। তিনি সাহিত্যে বাস্তবতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে "নিত্যবস্তু"র উল্লেখ করেছেন। "বস্তুতন্ত্রতা"র অর্থ গ্রহণ করা যদি কঠিন হয় তাহ'লে "নিত্য-বস্তুতন্ত্রতা"র অর্থ গ্রহণ করা যে অসম্ভব, সে কথা বলা বাহুল্য। সেই বস্তুই নিত্য, যা কালের অধীন নয়। এরূপ পদার্থ যে পৃথিবীতে আছে এ কথা এ দেশের প্রাচীন আচার্য্যেরা স্বীকার করেন নি। বিষ্ণুপুরাণের মতে—

"যাহা কালান্তরেও অর্থাৎ কোন কালেও পরিণামাদিজনিত সংজ্ঞান্তর প্রাপ্ত হয় না, তাহাই প্রকৃত সত্যবস্তু। জগতে সেরূপ কোন বস্তু আছে কি ?—কিছুই না।"—(রামানুজধৃত বচন—শ্রীভাষ্য)

যে বস্তু জগতে নেই, সে বস্তু যদি কোন কাব্যে না থাকে তাহ'লে সে কাব্যের বিশেষ কোনও দোষ দেওয়া যায় না, কেননা এই জগতই হচ্ছে সাহিত্যের অবলম্বন।

(২)

"বস্তুতন্ত্রতা" আত্মপরিচয় না দিলেও তার পরিচয় নেওয়াটা আবশ্যক; কেননা এ বাক্যটির দাবি মস্ত। "বস্তুতন্ত্রতা" একাধারে সকল সাহিত্যের মাপকাটি ও শাসনদণ্ড; সুতরাং সাহিত্য-সমাজে এর প্রচলন, বিনা বিচারে গ্রাহ্য করা যায় না।

এ বাক্যটি বাঙলাসাহিত্যে পূর্ব্বে ছিল না। সুতরাং এই অপরিচিত আগন্তুক শব্দটির কুলশীলের সন্ধান নেওয়া আবশ্যক।

এ বাক্যটি সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নেই, দর্শনশাস্ত্রে আছে।

কাব্যে ও দর্শনে যোগাযোগ থাকলেও, এ দুটি যে পৃথক-জাতীয় সাহিত্য, এ সত্য ত সর্ব্বলোকবিদিত। দার্শনিকমাত্রেই নাম-রূপের বহির্ভূত দুটি-একটি ধ্রুব সত্যের সন্ধানে ফেরেন, অপর পক্ষে, নাম-রূপ নিয়েই কবিদের কারবার। সুতরাং দার্শনিক পরিভাষার সাহায্যে কাব্যের রূপগুণের পরিচয় দেবার চেষ্টা, সকল সময়ে নিরাপদ নয়। তবে শঙ্করের "বস্তুতন্ত্রতা" কাব্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে আমার বিশেষ কোন আপত্তি নেই। শঙ্করের মতে—

"জ্ঞান কেবল বস্তুতন্ত্র—অর্থাৎ জ্ঞান প্রমাণ জন্য, প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়াই জন্মে, অতএব জ্ঞান ইচ্ছানুসারে করা, না করা এবং অন্যথা করা যায় না।"

শঙ্কর একটি উদাহরণ দিয়ে তাঁর মত স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেটি এই—

"হে গোতম! পুরুষও অগ্নি, স্ত্রীও অগ্নি ইত্যাদি শ্রুতিতে যে স্ত্রী পুরুষে বহ্নিবুদ্ধি উৎপাদন করিবার বিধান আছে, তাহা মনঃসাধ্য, অর্থাৎ তাহা মনের অধীন, পুরুষের অধীন এবং শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যের অধীন।

কিন্তু প্রসিদ্ধ অগ্নিতে যে অগ্নিবুদ্ধি, তাহা না পুরুষের অধীন, না শাস্ত্রীয় আজ্ঞাবাক্যের অধীন। অতএব জ্ঞান প্রত্যক্ষ-বিষয় বস্তুতন্ত্র।”

সাহিত্যে বস্তুতন্ত্রতার অর্থ যদি প্রত্যক্ষবস্তুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তাহ’লে এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, বস্তুতন্ত্রতার অভাবে দর্শন হতে পারে কিন্তু কাব্য হয় না। যদি বর্ণনার গুণে কোন কবির হাতে বেল, কুল হয়ে দাঁড়ায়, তাহ’লে যে তাঁর বেলকুল ভুল হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাধাকমলবাবু অবশ্য যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং অর্থে ও বাক্য ব্যবহার করেন না; কেননা যে কবির হাতে বাঙলার মাটি এবং বাঙলার জল পরিচ্ছন্ন মূর্ত্তি লাভ করেছে, তাঁর কাব্যে যে পূর্ব্বোক্ত হিসেবে বস্তুতন্ত্রতা নেই, এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। দেশের রূপের সম্বন্ধে যিনি দেশসুদ্ধ লোকের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছেন, তাঁর যে প্রত্যক্ষ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান নেই, এ কথা চোখের মাথা না খেয়ে বলা চলে না। শঙ্করের বস্তুতন্ত্রতাকে যদি কোনও বিশেষণে বিশিষ্ট করতে হয়, তাহ’লে সেটির অনিত্য-বস্তুতন্ত্রতা সংজ্ঞা দিতে হয়। কেননা প্রসিদ্ধ অগ্নি ইত্যাদি যে অনিত্যবস্তু সে ত সর্ব্বদর্শন সম্মত। সুতরাং রাধাকমলবাবুর মত এবং শঙ্করের মত এক নয়, কেননা নিত্য-বস্তুতন্ত্রতার সঙ্গে অনিত্য-বস্তুতন্ত্রতার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। সত্য কথা এই যে, “বস্তুতন্ত্রতা” নামে সংস্কৃত হলেও পদার্থটি আসলে বিলেতি। সেই জন্য রাধাকমলবাবু তাঁর প্রবন্ধে তাঁর মতের স্বপক্ষে কেবলমাত্র ইউরোপীয় লেখকদের মত উদ্ধৃত করতে বাধ্য হয়েছেন; যদিচ সে লেখকদের পরস্পরের মতের কোনও মিল নেই। জর্ম্মাণ-দার্শনিক Eucken এবং ইংরাজ-নাটককার Bernard Shaw যে সাহিত্য-জগতে

একপন্থী নন—এ কথা, তাঁদের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন।

ইউরোপীয় সাহিত্যের Realism-ই নাম-ভাঁড়িয়ে বাঙলা-সাহিত্যে “বস্তুতন্ত্রতা”-নামে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বস্তুতন্ত্রতার বিচার করতে হলে অন্তত দু' কথায় এই Realism-এর পরিচয় দেওয়াটা আবশ্যক।

ইউরোপের দার্শনিক জগতেই এ শব্দটি আদিতে জন্মলাভ করে। Idealism-এর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েই Realism দর্শনের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, এবং সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত উভয়ের যুদ্ধ সমানে চলে আসছে। Idealism-এর মূল কথা হচ্ছে—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; এ Realism-এর মূল কথা জগৎ সত্য, ব্রহ্ম মিথ্যা। এ অবশ্য অতি স্থূল প্রভেদ। কেননা এ উভয় মতই নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। এবং এই সকল শাখায় প্রশাখায় কোন কোন স্থলে প্রভেদ এত সূক্ষ্ম যে তাদের ইতরবিশেষ করা কঠিন। দর্শনের ক্ষেত্রে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয় ক্রমে তা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত গত-শতাব্দীতে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করে Realism, ইউরোপীয় সাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার Idealism-এর উপর প্রবল পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করে।

রাধাকমলবাবু বস্তুতন্ত্রতার স্বপক্ষে Bernard Shaw-এর দোহাই দিয়েছেন। Bernard Shaw-প্রমুখ লেখকদের মতে Realism-এর অর্থ যে Idealism-এর উপর আক্রমণ, তার স্পষ্ট প্রমাণ তাঁর নিজের কথাতেই পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে Ibsen-এর নাটকের সারমর্ম্ম হচ্ছে—“His attacks on ideals and idealisms”—এবং এই দুই মনোভাবের প্রতি

Bernard Shaw-র যে কতদূর ভক্তি আছে তার পরিচয়ও তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"I have sometimes thought of substituting in this book the words, idol and idolatry for ideal and idealism ; but it would be impossible without spoiling the actuality of Ibsen's criticism of society. If you call a man a rascally idealist, he is not only shocked and indignant but puzzled : in which condition you can rely on his attention. If you call him a rascally idolator, he concludes calmly that you do not know that he is a member of the Church of England. I have therefore left the old wording." (The quintessence of Ibsenism)

Bernard shaw-র অভিমত-"বস্তুতন্ত্রতা" রবীন্দ্রবাবুর কাব্যে সম্ভবত নেই। কিন্তু রাধাকমলবাবু কখনই বাঙলা-সাহিত্যে এ জাতীয় বস্তুতন্ত্রতার চর্চ্চা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না ; কেননা তিনি চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মনে উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করবে, অপর পক্ষে Bernard Shaw চান যে, সাহিত্য জনসাধারণের মন থেকে তথাকথিত উচ্চ আদর্শ সকল দূর করবে।

Realism শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইউ-রোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত। এক কথায় Realistic-সাহিত্য Romantic-সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা এবং Victor Hugo-প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদ স্বরূপেই

Falubert প্রমুখ লেখকেরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

Romanticism-এর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই যে, সে সাহিত্য মনগড়া সাহিত্য। Romantic কবিদের মানসপুত্র ও মানসী কন্যারা এ পৃথিবীর সন্তান নন এবং যে জগতে তাঁরা বিচরণ করেন সেটি কবিদের স্বকপোলকল্পিত জগৎ। এক কথায় সে রূপের রাজ্যটি রূপকথার রাজ্য। উক্ত শ্রেণীর কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে যে মাকড়সার জাল বুনে- ছিলেন ফরাসী Realism তারই বক্ষে নখাঘাত করে। এ অভিযোগের মূলে যে অনেকটা সত্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না। এক গীতিকাব্য বাদ দিলে ফরাসীদেশের গতশতাব্দীর Romantic লেখকদের বহু নাটক নভেল যে অশরীরী এবং প্রাণহীন সে কথা সত্য। কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চ্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন Romantic-দের দোষ, সত্যের চর্চ্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটাও Realist-দের তেমনি দোষ; প্রমাণ Zola. আকাশ-গঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ। কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্ত্তে খোলা নর্দ্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তার জীবনদান করা নয়। রাধাকমলবাবু অবশ্য এ জাতীয় Realism-এর পক্ষপাতী নন। কেননা তাঁর মতে যেটি এদেশের আদর্শ কাব্য অর্থাৎ রামায়ণ, সেটি হচ্ছে সংস্কৃত-সাহিত্যের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান Romance. Zola প্রভৃতি Realism-এর দলবল সরস্বতীকে আকাশপুরী হতে শুধু নামিয়েই সন্তুষ্ট হননি, তাঁকে জোর করে মর্ত্ত্যের ব্যাধিমন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়েছেন। কারণ রোগ যে বাস্তব, সে কথা আমরা চীৎকার করে মানতে বাধ্য।

(৩)

রাধাকমলবাবু যখন দেশী কাব্যের গায়ে বিলাতী ফুলের গন্ধ থাকাতেই আপত্তি করেন, তখন অবশ্য তিনি আমাদের সাহিত্যে বিলাতী ওষুধের গন্ধ আমদানী করতে চান না। তিনি "বস্তুতন্ত্রতা" অর্থে কি বোঝেন, তা তাঁর প্রদত্ত দুটি একটি উপমার সাহায্যে আমরা কতকটা আন্দাজ করতে পারি। রাধাকমলবাবু বলেন—

"মৃণাল না থাকিলে, লতিকা না থাকিলে পদ্ম যে ঢলিয়া পড়িবে। বাস্তবকে অবলম্বন না করিলে সাহিত্যের সৌন্দর্য্য কি করিয়া ফুটিবে?

"জীবন্ত গাছ হইতেছে সাহিত্যের আসল বাস্তব। সে গাছ তাহার শিকড়ের দ্বারা জাতীর অন্তরতম হৃদয়ের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অটুট রাখিয়াছে, সমস্ত জাতির হৃদয় হইতে তাহার রস সঞ্চার হয়। এই রস-সঞ্চারই সাহিত্যে বাস্তবতার লক্ষণ।"

"একটা গোলাপ গাছের যদি আশা হয়, সে স্থান কাল ও অবস্থাকে অগ্রাহ্য করিয়া নীচের মাটি হইতে রস সঞ্চয় না করিয়া, আলোক ও বাতাসের দানকে অবজ্ঞা করিয়া, এক কথায় বাস্তবকে না মানিয়া সে লিলি ফুল ফুটাইবে—তাহা হইলে তাহার যেরূপ বিড়ম্বনা হয়, কোন দেশের সাহিত্যের পক্ষে দেশের সমাজ ও যুগধর্ম্ম-বাস্তবকে অগ্রাহ্য করিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টির চেষ্টাও সেইরূপ ব্যর্থ হয়।"

এর অনেক কথাই যে সত্য, সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। মৃণালের অস্তিত্ব না থাকলে পদ্মের ঢলে পড়ার চাইতেও বেশি দুরবস্থা ঘটবে, অর্থাৎ তার অস্তিত্বই থাকবে না। তবে মৃণাল যদি বাস্তব হয়, পদ্ম যে কেন তা নয়, তা বোঝা গেল না। সম্ভবত তাঁর মতে যে যার নীচে থাকে সেই তার বাস্তব। ফুলের তুলনায় তার বৃন্ত, বৃন্তের তুলনায় শাখা, শাখার তুলনায়

কাণ্ড, কাণ্ডের তুলনায় শিকড় এবং শিকড়ের তুলনায় মাটি— উত্তরোত্তর অধিক হইতে অধিকতর এবং অধিকতম বাস্তব হয়ে ওঠে। পঙ্কজের অপেক্ষা পঙ্কে যে অধিক পরিমাণে বাস্তবতা আছে—এই বিশ্বাসে Zola প্রভৃতি বস্তুতান্ত্রিকেরা মানব-মনের এবং মানব-সমাজের পঙ্কোদ্ধার করে সরস্বতীর মন্দিরে জড়ো করেছিলেন। রাধাকমলবাবু কি চান যে আমরাও তাই করি? গোলাপ গাছের পক্ষে লিলি প্রসব করবার প্রয়াসটি যে একেবারেই ব্যর্থ, তাই নয়—মাটি হতে রস সঞ্চয় না করে আলোক ও বাতাসের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত করে সে গোলাপও ফোটাতে পারবে না, কেননা ওরূপ ব্যবহার করলে গোলাপগাছ দুদিনেই দেহত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

গাছের ফুল আকাশে ফোটে, কিন্তু তার মূল যে মাটিতে আবদ্ধ, সে কথা আমরা সকলেই জানি, সুতরাং কবিতার ফুল ফুটলেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, মনোজগতে কোথাও-না-কোথাও তার মূল আছে। কিন্তু সে মূল ব্যক্তিবিশেষের মনে নিহিত নয়, সমাজের মনে নিহিত, এই হচ্ছে নূতন মত। এ মত গ্রাহ্য করবার প্রধান অন্তরায় এই যে, সামাজিক মন বলে কোন বস্তু নেই; ও পদার্থ হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে abstraction.

সে যাই হোক, রাধাকমলবাবু এই সহজ সত্যটি উপেক্ষা করেছেন যে, গোলাপ গাছে অবশ্য লিলি ফোটে না কিন্তু একই ক্ষেত্রে গোলাপও জন্মে লিলিও জন্মে। স্বদেশের ক্ষেত্রেও যে বিদেশী ফুলের আবাদ করা যায়, তার প্রমাণ স্বয়ং গোলাপ। পারস্যদেশের ফুল আজ ভারতবর্ষের ফুলের রাজ্যে গৌরব এবং সৌরভের সহিত নবাবি করছে।

বহির্জগতে যদি এককক্ষেত্রে নানা ফুল ফোটে, তাহ'লে মনোজগতের যে-কোনো ক্ষেত্রে অসংখ্য বিভিন্ন জাতীয় ফুল ফোটবার কথা। কেননা খুব সম্ভব মনোজগতের ভূগোল আমাদের পরিচিত ভূগোলের অনুরূপ নয়। সে জগতে দেশভেদ থাকলেও পরস্পরের মধ্যে অন্তত অলঙ্ঘ্য পাহাড়-পর্ব্বতের ব্যবধান নেই, এবং মানুষের হাতে-গড়া সে রাজ্যের সীমান্ত-দুর্গসকল এ যুগে নিত্য ভেঙে পড়ছে। ভাবের বীজ হাওয়ায় ওড়ে এবং সকল দেশেই অনুকূল মনের ভিতর সমান অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং বাঙলা-সাহিত্যে লিলি ফুটলে আঁতকে ওঠবার কোন কারণ নেই। রাধাকমলবাবু বলেছেন—

"জাতীয় মনের ক্ষেত্র হইতেই কবির মন রস সঞ্চয় করে।"

যদি একথা সত্য হয় তাহ'লে যদি কোনও কাব্য শুষ্ক কাষ্ঠ মাত্র হয়, তাহ'লে তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী হচ্ছে সামাজিক মন। জাতীয় মন যদি নীরস হয় তাহ'লে কাব্য কোথা হতে রস সঞ্চয় করবে? উপমান্তরে দেশ-মাতার স্তনে যদি দুগ্ধ না থাকে, তাহ'লে তাঁর কবিপুত্রকে যে পেঁচোয় পাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রাধাকমলবাবুর এ মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। কবির মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যোগাযোগ থাকলেও কবিপ্রতিভা সামাজিক মনের সম্পূর্ণ অধীন নয়।

রাধাকমলবাবু উদ্ভিদ-জগৎ হতে যে উপমা দিয়েছেন, ইউরোপে ঘোর materialism-এর যুগে ঐ উপমাটি জড়জগৎ ও মনোজগতের মধ্যে যোগসাধনের সেতুস্বরূপ ব্যবহৃত হত। মাটি জল আলো ও বাতাস প্রভৃতির যোগাযোগে জীব সৃষ্ট হয়েছে এবং জীবের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফলে তার মনের

সৃষ্টি হয়েছে, এই বিশ্বাসবশতই ইউরোপের একদল বস্তু-তান্ত্রিক-দার্শনিক ধর্ম্ম কাব্য আর্ট নীতি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ব্যাপার সকলের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছিলেন। বলা বাহুল্য, ওরূপ ব্যাখ্যায় পারিপার্শ্বিক অবস্থারই বর্ণনা করা হয়েছিল, কাব্য প্রভৃতির বিশেষ-ধর্ম্মের কোনও পরিচয় দেওয়া হয় নি। দার্শনিক ভাষায় বলতে গেলে, তাঁরা কাব্যের উপাদান-কারণকে তার নিমিত্ত-কারণ বলে ভুল করেন। তাঁরা বাহ্যশক্তিতে বিশ্বাস করতেন, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতেন না, সুতরাং তাঁদের মতে কবির আত্মশক্তি নয়, পারিপার্শ্বিক সমাজের বাহ্য-শক্তিই কাব্যের উৎপত্তির কারণ বলে স্থিরীকৃত হয়েছিল। কবিতার জন্ম ও কবির জন্মবৃত্তান্ত যে স্বতন্ত্র, এই সত্য উপেক্ষা করবার দরুণ সাহিত্যতত্ত্ব সমাজতত্ত্বের অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছিল।

রাধাকমলবাবুর বস্তুতন্ত্রতা ইউরোপের গত-শতাব্দীর materialism-এর অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি বই আর কিছু নয়।

আসল কথা এই যে, প্রতি কবির মন এক-একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস। কবির কার্য্য হচ্ছে সামাজিক মনকে সরস করা। কবির মনের সঙ্গে অবশ্য সামাজিক মনের আদান-প্রদানের সম্পর্ক আছে। কবি কিন্তু সমাজের নিকট হতে যা গ্রহণ করেন সমাজকে তার চাইতে ঢের বেশি দান করেন। যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কবি এই অতিরিক্ত রস কোথা হতে সংগ্রহ করেন? তার উত্তরে আমরা বলব—আধ্যাত্মিক জগৎ হতে; সে জগৎ অবাস্তবও নয় এবং তা কোন পরম ব্যোমেতেও অবস্থিতি করে না। সে জগৎ আমাদের সত্তার মূলে ও ফুলে সমান বিদ্যমান। কারণ আত্মা হচ্ছে সেই বস্তু—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্
বাচো হ বাচং স উ প্রাণস্য প্রাণঃ।

রামানুজ বলেন—আমরা বদ্ধমুক্ত জীব। আমাদের মন যে-অংশে এবং যে-পরিমাণে বহির্জগতের অধীন, সেই অংশে এবং সেই পরিমাণে তা বদ্ধ এবং যে অংশে ও যে পরিমাণে তা স্বাধীন সে-অংশে ও সে-পরিমাণে তা মুক্ত। আমরা যখন বহির্জগতের সত্যসুন্দরমঙ্গলের কেবলমাত্র দ্রষ্টা, তখন আমরা বদ্ধজীব, এবং আমরা যখন নূতন সত্যসুন্দর-মঙ্গলের স্রষ্টা তখন আমরা মুক্তজীব! যাঁর স্বাধীনতা নেই তাঁর সাহিত্যে কোন কিছুরই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা নেই। তিনি বড়-জোর বিশ্বের রিপোর্টার হতে পারেন, তার বেশি নয়। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, কবি, আর্টিষ্ট প্রভৃতিই মানবের যথার্থ শিক্ষক, কেননা তাঁরাই মানব-সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার করেন। এই কারণে যিনি যথার্থ কবি, তিনি সমাজের ফরমায়েস খাটতে পারেন না, তার জন্য যদি তাঁকে "আত্মম্ভরী" বল, তাতে তিনি আত্মনির্ভরতা ত্যাগ করবেন না। যে দেশে আত্মার সাক্ষাৎ-কার লাভ করাই সাধনার চরম লক্ষ্য বলে গণ্য, সে দেশে কবিকে আত্মতান্ত্রিক বলে নিন্দা করা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

(৪)

দেশ-কালের ভিতর সম্পূর্ণ বদ্ধ না করতে পারলে অবশ্য জড়-বস্তুর সঙ্গে মানব-মনের ঐক্য প্রমাণ করা যায় না। Materialism-এর পাকা ভিতের উপর খাড়া না করলে, Realism-এর গোড়ায় গলদ থেকে যায়। অতএব রাধাকমল-বাবু কবিপ্রতিভাকে কেবলমাত্র স্বদেশ নয়, স্বকালেরও সম্পূর্ণ অধীন করতে চান। তিনি বলেন,—

"সাহিত্যের চরম সাধনা হইয়াছে যুগধর্ম্ম প্রকাশ করা, নবযুগ আনয়ন করা।"

যদি তাই সত্য হয়, তাহলে মহাভারতাদি ব্যতীত অপর কোন কাব্য স্বদেশী এবং জাতীয় নয়, এ কথা বলবার সার্থকতা কি? ও-জাতীয় কাব্য আমরা রচনা করতে পারিনে, কেননা আমরা ত্রেতা কিম্বা দ্বাপর যুগের লোক নই। National epic রচনা করা এ যুগে অসম্ভব, কেননা ও-সকল মহাকাব্যকে অপৌরুষেয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। এরূপ সাহিত্য কোনও এক ব্যক্তির দ্বারা রচিত হয় নি। যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়েই ভারতীকথা মহাভারতে পরিণত হয়েছে। যুগধর্ম্ম যাই হোক, কোন অতীত যুগের পুনরাবৃত্তি করা কোন যুগেরই ধর্ম্ম নয়।

যদি যুগধর্ম্ম অনুসরণ করতে হয়, তাহ'লে এ যুগে কবিদের পক্ষে বিদেশী এবং বিজাতীয় ভাববর্জ্জিত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব, কেননা আমরা বাঙলার মাটিতে বাস করলেও বিলাতের আবহাওয়ার বাস করি। আমাদের মনের নবদ্বার দিয়ে ইউরোপীয় মনোভাব অহর্নিশি আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করছে। কাজেই যুগধর্ম্ম-অনুসারে আমরা আমাদের সাহিত্যে একটি নব এবং মিশ্র মনোভাব প্রকাশ করে থাকি। আমাদের সাহিত্যের গুণও এই, দোষও এই।

এ সাহিত্যের গুণাগুণ, এই দেশী-বিলাতী মনোভাবের যথাযথ মিলনের উপর নির্ভর করে। দুভাগ হাইড্রোজেনের সঙ্গে একভাগ অক্সিজেন মিশ্রিত হলে জলের সৃষ্টি হয়—যা পান করে মানবের পিপাসা নিবারণ হয়। অপর পক্ষে দুভাগ অক্সিজেনের সঙ্গে একভাগ হাইড্রোজেন মিশ্রিত হলে যে বাষ্পের

সৃষ্টি হয়, তা নাকে মুখে ঢুকলে হয় ত আমরা দম-আটকে মারা যাই। শুধু তাই নয়, মাত্রা ঠিক থাকলেও হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনে মিলে জল হয় না— যদি না তাদের উভয়ের রাসায়নিক যোগ হয় অর্থাৎ যদি না ও-দুটি ধাতু পরস্পর পরস্পরের ভিতর সম্পূর্ণ অনুপ্রবিষ্ট হয়।

এই রাসায়নিক যোগসাধনের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য চাই। সুতরাং এই দেশী-বিলাতী ভাবের মিশ্রণে এ যুগের সাহিত্যে অমৃত ও বিষ দুই রচিত হচ্ছে। যে মনের ভিতর আত্মার বৈদ্যুতিক তেজ আছে, সে মনে এ যুগের রাসায়ানিক যোগ হয় এবং যে মনে সে তেজ নেই, সেখানে এ দুই শুধু মিশে যায়, মিলে যায় না।

যুগধর্ম্ম প্রকাশ করাই সাহিত্যের চরম সাধনা, এ কথা সত্য নয়। তার কারণ প্রথমত যুগধর্ম্ম বলে কোনও যুগের একটি মাত্র বিশেষ ধর্ম্ম নেই। একই যুগে নানা পরস্পরের-বিরোধী মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত মন পদার্থটি কোনও বিশেষ কাল সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক-অংশে কালের অধীন, অপর-অংশে মুক্ত ও স্বাধীন। কাব্য, ধর্ম্ম, আর্ট প্রভৃতি মুক্ত আত্মারই লীলা সুতরাং ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, প্রতিযুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সমসাময়িক যুগধর্ম্ম পরীক্ষিত এবং বিচারিত হয়েছে।

নব যুগধর্ম্ম আনয়ন করা যদি সাহিত্যের চরম সাধনা হয়, তাহ'লে সাহিত্য বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম অতিক্রম করতে বাধ্য। যে আদর্শ সমাজে নেই, সে আদর্শের সাক্ষাৎ শুধু মনশ্চক্ষুতে পাওয়া যায় এবং জীবনে নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে হলে, সমাজের

দখলি-সত্ত্ববিশিষ্ট আদর্শের উচ্ছেদ করা দরকার অর্থাৎ যুগধর্ম্মের বিরোধী হওয়া আবশ্যক।

Bernard Shaw অবজ্ঞার সহিত বলেছেন যে তিনি art for art-এর দলের নন। তার কারণ, তিনি এবং তাঁর গুরু Ibsen ইউরোপে সভ্যতার নবযুগ আনয়ন করাই জীবনের ব্রত করে তুলেছেন। এঁদের রচিত নাটকাদি যে সাহিত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে সে যে কতকটা তাঁদের মতের গুণে এবং কতকটা তাঁদের আর্টের গুণে তা আজকের দিনে বলা কঠিন, কেননা তাঁরা যে সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করতে উদ্যত হয়েছেন, তার সঙ্গে সকলেরই সামাজিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে। একথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, এ শ্রেণীর সাহিত্যে শক্তির অনুরূপ শ্রী নেই। সাহিত্যকে কোন-একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় স্বরূপ করে তুললে, তাকে সঙ্কীর্ণ করে ফেলা অনিবার্য্য। আমরা সামাজিক জীব, অতএব নূতন-পুরাতনের যুদ্ধেতে একপক্ষে-না-একপক্ষে আমাদের যোগ দিতেই হবে, কিন্তু আমাদের সমগ্র মনটিকে যদি আমরা এই যুদ্ধে নিয়োজিত করি তাহ'লে আমরা সনাতনের জ্ঞান হারাই। যা কোন-একটি বিশেষ যুগের নয় কিন্তু সকল যুগেরই—হয় সত্য নয় সমস্যা, তাই হচ্ছে মানব-মনের পক্ষে চিরপুরাতন ও চিরনূতন—এক কথায় সনাতন। এই সনাতনকে যদি রাধাকমলবাবু নিত্যবস্তু বলেন, তাহ'লে সাহিত্যের যে নিত্যবস্তু আছে এ কথা আমি অস্বীকার করব না; কিন্তু ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিকেরা তা অগ্রাহ্য করবেন। একান্ত বিষয়গত সাহিত্যের হাত থেকে মুক্তি লাভ করবার ইচ্ছা থেকেই "art for art"-মতের উৎপত্তি হয়েছে। কাব্য

বল, ধর্ম্ম বল, দর্শন বল, এ সকল হচ্ছে বিষয়ে নির্লিপ্ত মনের ধর্ম্ম। এই সত্য উপেক্ষা করার দরুণ ইউরোপের বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্য শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। রাধাকমলবাবু প্রমুখ লেখকদের বস্তুতান্ত্রিকতা যে ইউরোপের Realism ব্যতীত আর কিছুই নয়, তার প্রমাণ স্বরূপ Eucken-বর্ণিত উক্ত মতের লক্ষণগুলি উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। উক্ত জর্ম্মাণ দার্শনিকের মত শিরোধার্য্য করতে রাধাকমলবাবুই যখন আমাদের আদেশ করেছেন, তখন সে মত অবশ্য তাঁর নিকট গ্রাহ্য হবে। Eucken বলেন যে, Realism—

"প্রকৃতিকেই সব বলে ধরে নেয় এবং যে বস্তুর বহির্জগতে অস্তিত্ব আছে তাই হচ্ছে একমাত্র বাস্তব।"

"এ দলের অধিকাংশ লোক, যা ইন্দ্রিয়গোচর তাই সত্য বলে গ্রাহ্য করেন এবং জনকতক আছেন, যাঁদের মতে বিশ্ব একটি যন্ত্রমাত্র এবং যেহেতু মাপজোকের সাহায্য ব্যতীত যন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং যে বস্তুকে মাপা যায় এবং ওজন করা যায় তাই হচ্ছে বাস্তব।" অর্থাৎ যা আঁকা যায় এবং যার আঁক-কসা যায় তাই একমাত্র সত্য। তারপর এ মতে—

"ভাবরাজ্যে কোনরূপ ideal-এর অস্তিত্ব ভ্রান্তিমাত্র, কিন্তু নীতির রাজ্যে ideal (আদর্শ) আছে এবং থাকা উচিত। কেননা এ মতে জ্ঞানের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, সমাজ বহু-ব্যক্তিকে জোড়া দিয়ে তৈরি একটি যন্ত্রমাত্র; আবার কর্ম্মের দিক দিয়ে দেখতে গেলে, তা একটি organism (অঙ্গী) এবং প্রতি ব্যক্তি তার অঙ্গ, অতএব ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের সম্পূর্ণ অধীন। স্বাধীনতা বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব বিশ্বেও

নেই, মানবের অন্তরেও নেই। অথচ এ মতে রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতা-সাধনাই হচ্ছে পরম ধর্ম্ম।”

মানব-সমাজকে হয় যন্ত্র, নয় অঙ্গীস্বরূপে গ্রাহ্য করলে, এবং মানবের আত্মার অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করলে এই যন্ত্রের অংশ অথবা এই অঙ্গীর অঙ্গ যে ব্যক্তি তার অপর-সকল ধর্ম্মকর্ম্মের ন্যায় তার সাহিত্য-রচনাও সম্পূর্ণ সমাজের অধীন এবং তার প্রতি অঙ্গও সেই একই যুগধর্ম্মের অধীন। সুতরাং কোনও ব্যক্তির পক্ষে মনোজগতে যুগধর্ম্ম অতিক্রম করবার চেষ্টা শুধু ধৃষ্টতা নয়—একেবারেই বাতুলতা। আমাদের দেশে যাঁরা বস্তুতন্ত্রতার ধুয়ো ধরেছেন, তাঁরা যে ইউরোপের এই জাতীয় Realism-এর চর্ব্বিত চর্ব্বন রোমন্থন করেছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমি Eucken-এর আর-একটি কথা উদ্ধৃত করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। “All spiritual creation possesses a superiority as compared with the age, and liberates man from its compulsion, nay, it wages an unc asing struggle against all that belongs to the things of mere time.” যথার্থ কবির নিকট এ সত্য প্রত্যক্ষ; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের চোখ-রাঙানী হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন।

(৫)

আসল কথা, এ সকল ন্যায়ের তর্কের সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা নেই। অর্থহীন বস্তু কিম্বা পদার্থহীন ভাব—এ দুয়ের কোনটাই সাহিত্যের যথার্থ উপদান নয়। Realism-এর পুতুল-নাচ এবং Idealism-এর ছায়াবাজি, উভয়ই কাব্যে

অগ্রাহ্য। কাব্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ। এবং যেহেতু জীবে চিৎ এবং জড় মিলিত হয়েছে, সে কারণ যা, হয় বস্তুহীন, নয় ভাবহীন, তা কাব্য নয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি মাত্রেই একাধারে Realist এবং Idealist, কি বহির্জগৎ, কি মনোজগৎ দুয়ের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া কবির দৃষ্টি সাধারণ জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে।

The light that never was on land or sea—সেই আলোকে বিশ্ব দর্শন করবার শক্তিকেই আমরা কবি-প্রতিভা বলি, কেননা সে জ্যোতি বাহ্য-জগতে নেই, অন্তর্জগতেই তা আবির্ভূত হয়।

Realism-এর এই উচ্চবাচ্য ইউরোপীয় সাহিত্যেই যখন বিরক্তি-জনক, তখন বাঙলা-সাহিত্যে তা একেবারেই অসহ্য। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে বস্তু-জগতের উপর প্রভুত্ব করছে, অপর পক্ষে বৈজ্ঞানিক দর্শন আমাদের মনের উপর প্রভুত্ব করছে। অর্থাৎ জড়বিজ্ঞানের যে অংশটি খাঁটি, সেইটি ইউরোপের হাতে পড়েছে এবং তার যে অংশটি ভুয়ো, সেইটিই আমাদের মনে ধরেছে। ইউরোপ পঞ্চভূতকে তার দাসত্বে নিযুক্ত করেছে, আর আমরা তাদের পঞ্চ দেবতা করে তোলবার চেষ্টায় আছি।

মাঘ, ১৩২১ সন।

অভিভাষণ।

(উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।)

আজ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে, এই রাজসাহী সহরে, আমি সর্ব্বজন-সমক্ষে সসঙ্কোচে দুটি চারিটি কথা বলি। আমার জীবনে সেই সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা। কোনও দূর ভবিষ্যতে আমি যে এই সভার মুখপাত্রস্বরূপে আবার আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইব, সে দিন একথা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আজিকার ব্যাপারে যাঁহারা কর্ম্মকর্ত্তা, সে দিনও তাঁহারাই কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন। মহারাজ নাটোর এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের উদ্যোগেই সে সভা আহূত হয়। এবং তাঁহাদের অনুরোধেই আমি সে সভার প্রধান-বক্তা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদানুসরণ করি। এ সভারও পতির আসন রবীন্দ্র-নাথের জন্যই রচিত হইয়াছিল; তাঁহার অনুপস্থিতিতে, পূর্ব্বোক্ত বন্ধুদ্বয়ের অনুরোধে এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রায় মত আমি তাঁহার ত্যক্ত এই রিক্ত আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাঁহারা আমাকে প্রথমে আসরে নামান, তাঁহারাই আজ আমাকে এ আসরের প্রধান নায়ক সাজাইয়া খাড়া করিয়াছেন। এ পদ অধিকার করিবার আমার কোনরূপ যোগ্যতা আছে কি না—সে বিচার তাঁহারাও করেন নাই, আমাকেও করিতে দেন নাই।

এ আসন গ্রহণ করিবার অধিকার যে আমার নাই, তাহা আমার নিকট অবিদিত নয়। আমি অবসরমত সাহিত্যচর্চ্চা করি, কিন্তু সে গৃহকোণে এবং নির্জ্জনে। বক্তা ও লেখক এক-জাতীয় জীব নন; ইঁহাদের পরস্পরের প্রকৃতিও ভিন্ন, রীতিও ভিন্ন। বক্তা চাহেন, তিনি শ্রোতার মন জবরদখল করেন, অপর পক্ষে লেখক, পাঠকের মনের ভিতর অলক্ষিতে এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতে চাহেন। বক্তা শ্রোতার মনকে বিশ্রাম দেন না; লেখক পাঠকের অবসরের সাথী। অক্ষরের নীরবভাষায় একটি অদৃশ্য শ্রোতার কানে-কানে আমরা নানা ছলে নানা কথা বলিতে পারি; কিন্তু জনসমাজে আমাদের সহজেই বাক্‌রোধ হয়। যে বাণী সবুজপত্রের আবডালে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে তাহা সূর্য্যের নগ্ন কিরণের স্পর্শে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। অথচ গুণীসমাজে সুপরিচিত হইবার লোভও আমাদের পূরামাত্রায় আছে। সাহিত্যের রঙ্গভূমিতে দর্শকের নয়ন-মন আকর্ষণ করিবার জন্য আমরা নিত্য লালায়িত, অথচ লেখকের ভাগ্যে পাঠকের সাক্ষাৎকার-লাভ ক্বচিৎ ঘটে। প্রশংসার পুষ্পবৃষ্টি এবং নিন্দার শিলাবৃষ্টি উভয়ই আমাদের শিরোধার্য্য—একমাত্র উপেক্ষাই আমাদের নিকট চির-অসহ্য। সুতরাং সাহিত্য-সমাজে যথাযোগ্য আসন লাভ করাতেই আমরা কৃতার্থতা লাভ করি। দণ্ডী বলিয়াছেন যে—

"কৃশে কবিত্বেপি জনাঃ কৃতশ্রমা
বিদগ্ধগোষ্ঠীষু বি-হর্তুমীশতে।"

আমাদের ন্যায় প্রতিভাবঞ্চিত লেখকদিগের সকল শ্রম বিদগ্ধ-গোষ্ঠীতে স্থানলাভ করাতেই সার্থক হয়। অতএব অন্য কারণাভাবেও অন্তত দুদিনের জন্যও উত্তর-বঙ্গের বিদগ্ধগোষ্ঠীর

গোষ্ঠী-পতি হইবার লোভ সম্ভবত আমি সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

(২)

কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমার বিশেষ করিয়া একটি নিজস্ব কারণ আছে, যাহার দরুণ আমি স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে এ আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছি। এ স্থলে কোনরূপ বিনয়ের অভিনয় করা আমার অভিপ্রায় নয়। অযোগ্য বক্তিকে উচ্চ-পদস্থ করা যে তাহাকে অপদস্থ করিবার অতি সহজ উপায়, এ জ্ঞান আমার আছে। এ সত্বেও আমি যে আপনাদের সম্মুখে সশরীরে উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছি তাহার কারণ উত্তর-বঙ্গের আহ্বান আমি উপেক্ষা করিতে পারি না। আমার দেশ বলিতে আমি প্রথমত এই প্রদেশই বুঝি। বারেন্দ্র সমাজের সহিত আমার নাড়ীর যোগ আছে, বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার রক্তের টান আছে। উত্তর-বঙ্গের প্রতি আমার অনুরাগকে এক-হিসেবে মৌলিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কেননা এই দেশের মাটিতেই এ দেহ গঠিত। আমার বিশ্বাস, বাস্তুভিটার প্রতি মানুষমাত্রেরই যে স্বাভাবিক টান আছে, সেই আদিম মনোভাবের অটল ভিত্তির উপরেই সভ্য মানবের স্বদেশ-বাৎসল্য প্রতিষ্ঠিত। অতীত-অনাগতের এই মিলন-ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের আত্মার সহিত আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচয় পাই। এই বাস্তু-প্রীতিই ক্রমে প্রসার লাভ করিয়া স্বদেশ-প্রীতিতে পরিণত হয়। সুতরাং যে দেশের যে ভূভাগ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের স্মৃতির সহিত একান্ত জড়িত, সে প্রদেশের প্রতি অন্তরের টান থাকা মানুষের পক্ষে

নিতান্ত স্বাভাবিক। আমার পারিবারিক পূর্ব্বকাহিনী এই, এই বরেন্দ্রমণ্ডলের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ। সে সীমা লঙ্ঘন করিয়া আমার জাতীয় পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি, আর্য্যাবর্ত্ত দূরে থাক, কান্যকুব্জেও গিয়া পৌঁছায় না। সুতরাং বরেন্দ্রভূমির প্রতি আমার যে প্রগাঢ় অনুরাগ আছে সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত। এবং সেই মজ্জাগত প্রীতিবশতই, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-পরিষদ যে গুরুভার আমার মস্তকে ন্যস্ত করিয়াছেন, আমি তাহা বিনা আপত্তিতে নতশিরে গ্রহণ করিয়াছি।

(৩)

এই প্রসঙ্গে আমি এইরূপ প্রাদেশিক সাহিত্য সভার সার্থকতা সম্বন্ধে দু একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। কাহারও কাহারও মতে এইরূপ পৃথক পৃথক পরিষদের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য-সমাজেও প্রাদেশিকতার সৃষ্টি করা হয়। এ অভি-যোগের অর্থ আমি অদ্যাবধি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। আমার বিশ্বাস, বাঙলা দেশে এই জাতীয় সভা-সমিতির সংখ্যা যত বৃদ্ধিলাভ করিবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। এবং আমার মতে এই সকল প্রাদেশিক সাহিত্য-সমিতির পক্ষে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করাই শ্রেয়। আমি শিক্ষা এবং সাহিত্য-সম্বন্ধে decentralisation-এর পক্ষপাতী। কোন-একটি আঢ্য পরিষদের শাসনাধীন থাকিলে প্রাদেশিক পরিষদগুলি সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিবে না। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান ত্রুটি তাহার বৈচিত্র্যের অভাব। বঙ্গদেশের সহিত বঙ্গ-

সাহিত্যের সাক্ষাৎ-পরিচয় ঘটিলে এ অভাব দূর হইতে পারে। বঙ্গ-সাহিত্যে আমি দক্ষিণ-বঙ্গের প্রাধান্য অস্বীকার করি না। আমার বিশ্বাস, এক ভাষার গুণে দক্ষিণ-বঙ্গ চিরকাল সে প্রাধান্য রক্ষা করিবে সুতরাং উত্তর-বঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-পরিষদের প্রতি কোনরূপ কটাক্ষপাত করা কলিকাতার পক্ষে সঙ্গতও নহে, শোভনও নহে। বস্তুত সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের উপর নব-নাগরিক-সাহিত্যের প্রভাব এত বেশি যে, আমাদের প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রাদেশিকতার নাম-গন্ধও থাকে না। এমন কি, কোনও হতভাগ্য লেখকের রচনা যদি নাগরিক মতে নাগরিকতা দোষে দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে সকল প্রদেশেই সে রচনা প্রাদেশিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়।

(৪)

উত্তর-বঙ্গের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ এই যে, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতিকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত বরেন্দ্রমণ্ডলের পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শনসকলের বলে উত্তর-বঙ্গের মনে ঈষৎ অহংজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে। এ কথা সত্য কি না তাহা আমি জানিনা। যদিই বা উত্তর-বঙ্গ তাহার অতীত-গৌরবে গৌরবান্বিত মনে করে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সমগ্র বঙ্গের আত্মসম্মান রক্ষা করিতে হইলে প্রদেশমাত্রেরই অহঙ্কার সুপ্রতিষ্ঠিত করা কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন যে, কোনরূপ প্রদেশ-বাৎসল্যের প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, কেননা ঐরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাব উদার স্বদেশ-বাৎসল্যের প্রতিবন্ধক। আমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারেন যে, ইঁহারা যে

মনোভাবকে সঙ্কীর্ণ বলেন, আমি তাহাকেই প্রকৃত উদার মনোভাবের ভিত্তিস্বরূপ জ্ঞান করি। যে স্থলে কোন অংশের প্রতি প্রীতি নাই, সেস্থলে সমগ্রের প্রতি ভক্তির মূল কোথায় তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না।

অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যে মনোভাবকে অতি উদার বলা হয় তাহার কোনরূপ ভিত্তি নাই। বাঙলাদেশের সহিত, বাঙলার ইতিহাসের সহিত, বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত কিছুমাত্র পরিচয় নাই অথচ বঙ্গমাতার নামে মুগ্ধ, এইরূপ লোক আমাদের শিক্ষিত সমাজে বিরল নহে। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইঁহাদের প্রতাপ দুর্দ্দান্ত এবং প্রতিপত্তি অসীম। এইরূপ উদার মনোভাবের অবলম্বন কোন বস্তুবিশেষ নয়,—কিন্তু একটি নামমাত্র। এইরূপ স্বদেশ-প্রীতির মূল—হৃদয়ে নয়, মস্তিষ্কে। এইরূপ স্বদেশী মনোভাব বিদেশী পুস্তক হইতে সংগৃহীত। এইরূপ পুঁথিজাত এবং পুঁথিগত পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে রাষ্ট্রগঠন করা যায় কি যায় না তাহা আমার অবিদিত, কিন্তু সাহিত্য যে সৃষ্টি করা যায় না সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নামের মাহাত্ম্য আমি অস্বীকার করি না। স্বদলবলে উচ্চৈস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে মানুষে দশাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু ঐরূপ ক্ষণিক উত্তেজনার প্রসাদে পৃথিবীর কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। সিদ্ধি সাধনার অপেক্ষা রাখে এবং সাধনা স্থিরবুদ্ধির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং তথাকথিত সঙ্কীর্ণ প্রদেশ-বাৎসল্য যদি এই জাতীয় উদার মনোভাবের বিরোধী হয়, তাহা হইলে এইরূপ সঙ্কীর্ণ মনোভাবের চর্চ্চা করা আমি একান্ত শ্রেয় মনে করি। কিন্তু আসলে এ সকল অভিযোগের মূলে কোনও সত্য নাই। কেননা একমাত্র সাহিত্যই এ পৃথিবীতে মানব-মনের সকলপ্রকার সঙ্কীর্ণতার

জাত-শত্রু। জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। মনোজগতে বাতি জ্বালানো এবং ফুল ফোটানোই সাহিত্যের একমাত্র ধর্ম্ম এবং একমাত্র কর্ম্ম। কোনও জাতির মনের ঐক্য-সাধনের প্রধান উপায় সাহিত্য; কেননা ভাষার ঐক্যই জাতীয় ঐক্যের মূল। ভারতবর্ষ একটি ভৌগলিক সংজ্ঞামাত্র হইতে পারে কিন্তু বাঙালী যে একটি বিশিষ্ট জাতি তাহার কারণ—এক-ভাষার বন্ধনে এ দেশের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান সকলেই আবদ্ধ। সকল-প্রকার স্বার্থের বন্ধনের অপেক্ষা ভাষার বন্ধন দৃঢ়। এ বন্ধন ছিন্ন করিবার শক্তি কাহারও নাই, কেননা ভাষা অশরীরী। শব্দ বহির্জগতে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মনোজগতে চিরস্থায়ী। এই চিরস্থায়ী ভিত্তির উপরই আমরা সরস্বতীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করি।

(৫)

যে সভার বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সেই সভাতে এই রাজসাহী সহরে রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেন যে, আমাদের স্কুল-কলেজে বঙ্গভাষার সম্যক চর্চ্চা হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য এবং আমি সে প্রস্তাবের সমর্থন করি। বঙ্গসন্তানের শিক্ষা যতদূর সম্ভব বঙ্গভাষাতেই হওয়া সঙ্গত, এরূপ প্রস্তাব সে যুগের শিক্ষিত লোকদের মনঃপূত হয় নাই। এ প্রস্তাব শুনিয়া অনেকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই, অনেকে আবার অসম্ভবরূপ বিরক্তও হইয়াছিলেন। এ প্রস্তাবের প্রতি যে সেকালে কতদূর

অবজ্ঞা দেখানো হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ, প্রকাশ্যে কেহ এ কথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাও আবশ্যক মনে করেন নাই। কবির কবিত্ব এবং বিদূষকের ভাঁড়ামি স্বুবুদ্ধি চিরকালই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। আজ মাতৃভাষার চর্চ্চা করিতে বলিলে কাহারও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, কেননা ইতিমধ্যে সে ভাষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এক-কোণে একটুখানি স্থান লাভ করিয়াছে। এমন কি, শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাষাণমূর্ত্তির পাদপীঠে এই শিলালিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছে—তাঁহার যত্ন এবং তাঁহার চেষ্টায় The mother's tongue has been put in the step-mother's hall—অর্থাৎ বিমাতার আলয়ে মাতার রসনা স্থাপিত হইয়াছে। দেশসুদ্ধ লোক ইহা গৌরবের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু বিমাতার মন্দিরে মাতৃভাষা যে অদ্যাপিও যথাযোগ্য স্থান লাভ করেন নাই—ঐ বিমাতৃভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার পরিচয়। এবং উক্ত লিপি ইহাও প্রমাণ করিতেছে যে, ভাষাসম্বন্ধেও আত্মবশ হওয়াই সুখের এবং পরবশ হওয়াই দুঃখের কারণ। সত্যকথা এই যে, মাতৃভাষার সাহায্যেই আমরা যথার্থ ভাষাজ্ঞান লাভ করি এবং সে জ্ঞানের অভাবে আমরা পরভাষাও যথার্থরূপে আয়ত্ত করিতে পারি না। যেদিন আমাদের সকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা প্রাধান্য লাভ করিবে এবং ইংরাজী ভাষা দ্বিতীয় আসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে সেইদিন বঙ্গসন্তান যথার্থ শিক্ষালাভের অধিকারী হইবে।

একদিন যেমন বাঙলা পড়িতে বলিলে অনেকে মনে প্রমাদ গণিতেন—আজ তেমনি বাঙলা লিখিতে বলিলে অনেকে মনে মনে প্রমাদ গণেন। সে কালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, আমরা নবশিক্ষার অভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত

হইয়াছি; একালে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, আমরা নব-সাহিত্যের আভিজাত্য নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমাদের জাতীয় ভাষা যে এত হেয় যে, তাহার স্পর্শে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা সব মলিন হইয়া যায়, এ কথা বলায় বাঙালী অবশ্য তাঁহার আভিজাত্যের পরিচয় দেন না,—পরিচয় দেন শুধু তাঁহার বিজাতীয় নব-শিক্ষার। যে কারণেই হউক, অনেকে যে মাতৃ-ভাষার পক্ষপাতী নহেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমি এই উপলক্ষ্যেই পাইয়াছি। যে দিন আমি এই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হই, সে দিন আমার কোন শুভার্থী বন্ধু আমাকে সতর্ক করিয়া দেন যে, এ সভাস্থলে "বীরবলী ঢং চলবে না!" যে-কোন সভাতেই হউক না কেন, বিদূষকের আসন যে সভা-পতির আসনের বহু নিম্নে সে জ্ঞান যে আমার আছে তাহা অবশ্য আমার বন্ধুর অবিদিত ছিল না। অপর-পক্ষে আমার উপর তাঁহার এ ভরসাটুকুও ছিল যে, এই সুযোগে আমি এই উচ্চ আসন হইতে সভার গাত্রে বীরবলিক অ্যাসিড নিক্ষেপ করিব না। আসলে তিনি এ ক্ষেত্রে আমাকে বীরবলের ভাষা ত্যাগ করিতেই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কেননা সে ভাষা আট পহুরে,—পোষাকি নয়। সভ্যসমাজে উপস্থিত হইতে হইলে সমাজ-সম্মত ভদ্রবেশ ধারণ করাই সঙ্গত, ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে সে বেশ যতই অনভ্যস্ত হউক না কেন। আমি তাঁহার পরামর্শ-অনুসারে 'পররুচি পর্‌ণা'—এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া এ যাত্রা সাধুভাষাই অঙ্গীকার করিয়াছি। কেননা সাধু-ভাষা যে ধোপদুরস্ত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে একটুও রং নাই এবং অনেকখানি মাড় আছে, ফলে ইহা স্বতই ফুলিয়াও উঠে এবং খড়্‌খড়্‌ও করে। আশা করি, এ সন্দেহ

কেহ করিবেন না যে, এই বেশ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার মতেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সময়োচিত বেশ ধারণ করা, আমাদের সমাজের সনাতন প্রথা। আমরা কৈশোরের প্রারম্ভে অন্তত তিন দিনের জন্যও কর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল এবং দেহে গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, মুণ্ডিত-মস্তকে, ঝুলি-স্কন্ধে, দণ্ড-হস্তে, নগ্ন-পদে ভিক্ষা মাগি। এই আমাদের প্রথম সংস্কার। তাহার পর যৌবনের আরম্ভে অন্তত এক দিনের জন্যও আমরা রাজবেশ ধারণ করিয়া তকৃত-রাঙ্গায় চড়িয়া ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পাত্র-মিত্রসমভিব্যাহারে কণে নামক একটি অবলা প্রাণীর গৃহাভিমুখে রণযাত্রা করি। ইহাই আমাদের দ্বিতীয় সংস্কার। আমরা যখন রাজাও সাজিতে জানি, ব্রহ্মচারীও সাজিতে জানি, তখন সভ্য সাজা ত আমাদের পক্ষে অতি সহজ। জীবনে সভ্যতার সাজ খোলাই কঠিন,, পরা সহজ।

(৬)

ভাষা সাহিত্যের মূল-উপাদান, সুতরাং সাহিত্য-পরিষদে ভাষা-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখ-কেরা ভাষার সৌন্দর্য্যের দ্বারাই পাঠকের মনোরঞ্জন করেন এবং ভাষার শক্তির দ্বারাই পাঠকের মন হরণ করেন। কাজেই কোনও লেখক আর সাধ করিয়া শ্রীহীন এবং শক্তিহীন ভাষা ব্যবহার করেন না। আমরা যে লেখায় মৌখিক ভাষার পক্ষ-পাতী, তাহার কারণ আমাদের বিশ্বাস, আমাদের মাতৃভাষা রূপে যৌবনে তথাকথিত সাধুভাষা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য-কথা আমি নানা সময়ে, নানা স্থানে, নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছি। আত্মমত সমর্থনের জন্য কখনও

বা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, বিরুদ্ধমত খণ্ডনের জন্য কখনও বা তাহার উপর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছি। এ স্থলে সে সকল কথার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। কেননা পুনরুক্তি ওকালতিতে যে-পরিমাণে সার্থক, সাহিত্যে সেই পরিমাণে নিরর্থক।

আপাতত আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই সাধুভাষার জন্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতেছি, তাহা হইতেই আপনারা অনুমান করিতে পারিবেন যে, ইহার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার চেষ্টা কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা, কি আর-কিছু।

বাঙলার প্রাচীন সাহিত্য আছে; কিন্তু সে সাহিত্য পদ্যে রচিত, গদ্যে নয়। আজ প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের গদ্য-সাহিত্য জন্মলাভ করে, এবং সাধুতা এই সাহিত্যেরই ধর্ম্ম। শতবর্ষ পরমায়ু—বিধির এই নিয়মানুসারে এ সাহিত্যের এখন পরিণত দেহ ত্যাগ করিয়া নবকলেবর ধারণ করা উচিত।

সে যাহা হউক, এ সাহিত্য জাতীয় মন হইতে গড়িয়া উঠে নাই; ইংরাজ রাজপুরুষদের ফরমায়েসে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক নিতান্ত অযত্নে ইহা গঠিত হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,—দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য। তাঁহার রচিত 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' ১৮১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। "প্রবোধ-চন্দ্রিকায়াং প্রথমস্তবকে মুখবন্ধে ভাষাপ্রশংসানাম প্রথমকুসুমের শেষাংশে" লিখিত আছে যে—

"গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত প্রবোধ-চন্দ্রিকা নামে গ্রন্থ রচিতেছেন—"

বঙ্গভাষা সম্বন্ধে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ধারণা কিরূপ ছিল তাহার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন—

"অস্মদাদির ভাষার যুগপৎ বৈখরীরূপতামাত্র প্রতীতি সে উচ্চারণ-ক্রিয়ার অক্ষিপ্রতাপ্রযুক্ত উপর্য্যধোভাবাস্থিত কোমলতর-বহুল-কমলদল সূচীবেধন ক্রিয়ার মত। এতদ্রূপে প্রবর্ত্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা, বহুবর্ণময়ত্বপ্রযুক্ত একদ্ব্যক্ষর পশুপক্ষিভাষা হইতে বহুতরাক্ষর মনুষ্যভাষার মত ইত্যনুমানে সংস্কৃত ভাষা সর্ব্বোত্তমা ইহা নিশ্চয়—"

উক্ত ভাষা যে অস্মদাদির ভাষা নহে, তাহা বলা বাহুল্য। এবং এই ভাষায় অভিনব যুবক সাহেবজাতেরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহাতে কোনই দুঃখ নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, অভিনব যুবক বঙ্গজাতেরও যুগে যুগে এইরূপ ভাষা উত্তমা ভাষা হিসাবে শিক্ষা করিয়াছেন। কেননা এই রচনাই সাধুভাষার প্রথম সংস্করণ, এবং বিলাতি ছাপাখানার ছাপমারা এই ভাষাই কালক্রমে অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছে। ইহার জন্য মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার প্রমুখ পণ্ডিতমণ্ডলীকে আমি দোষী করি না; তাঁহাদের বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করিবার কোনরূপ অভিপ্রায় ছিল না—কেননা দেশী-ভাষায় যে কোনরূপ শাস্ত্র রচিত হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার বহির্ভূত ছিল।

ফলত এ সকল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নিজের রচনা নহে। দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইরূপ রচনায় কোনরূপ যত্ন, কোনরূপ পরিশ্রমের লেশমাত্রও নিদর্শন নাই। তর্কালঙ্কার মহাশয় নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন

নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি-লেখক, অপরদিকেও তিনি তেমনি চলতি-ভাষারও আদর্শ লেখক। নিম্নে তাঁহার চলতি-ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"মোরা চায করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে, তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিয়া খাব, ছেলেপিলাগুলিন পুঁষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়িধানের মুড়ি ও মটর মসুর শাক পাতা শামুক গুগুলি সিজাইয়া খাইরা বাঁচি। খড় কুটাকাটা শুকনাপাতা বঞ্চী তুষ ও বিলঘটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি, কাপাস তুলি, তুলা করি, ফুঁড়ী পিঁজী পাঁইজ করি, চরকাতে সূতা কাটি, কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাঠে ঘাটে বেড়াইয়া ফলফুলারিটা যা পাই তাহা হাটে বাজারে মাথায় মোট করিয়া লইয়া গিয়া বেচিয়া পণেক দশ গণ্ডা যা পাই ও মিনসা পাড়াপড়সিদের ঘরে মুনিস খাটিয়া দুই চারিপণ যাহা পায়, তাহাতে তাঁতির বাণী দি, ও তেল লুন করি, কাটনা কাটি, ভাড়া ভানি, ধান কুড়াই শিজাই শুকাই ভানি, খুদ-কুঁড়া ফেন আমানি খাই। যেদিন শাক ভাত খাইতে পাই সেদিন ত জন্মতিথি। শীতের দিনে কাঁথাখানি ছালিয়াগুলিকের গায় দি। আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইয়া পোয়ালের বিড়ায় মাতা দিয়া মেলের মাদুর গায়ে দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না। যদি কখন পাথরায় খাইতে পাই ও রাঙা তালের পাতা কাণে পরিতে ও পুতির মালা গলায় পরিতে ও রাঙ্গ শিশা পিতলের বালা তাড়মল খাড়ু গায়ে পরিতে পাই তবে ত রাজরাণী হই। এ দুঃখেও দুরন্ত রাজা, হাজা শুকা হইলেও আপন রাজস্বের কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট ধূল ছাড়েনা। এক আধ দিন আগে পিছে সহেনা। যত্তপিস্যাৎ কখন হয় তবে তার সুদ

দাম বুঝিয়া লয়, কড়াকপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবার যোত্র না হয়, তবে সোনামোড়ল পাটোয়ারি ইজারাদার তালুকদার জমীদারেরা পাইক পেয়াদা পাঠাইয়া হাল যোঁয়াল ফাল হালিয়াবলদ দামড়াগরু বাছুর বকনা কাঁথা পাথর চুপড়ী কুলা ধুচুনী পর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাড়ীয়া করিয়া পিটিয়া সর্ব্বস্ব লয়। মহাজনের দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় করিতে পারি না, কত বা সাধ্যসাধনা করি—হাতে ধরি পায়ে পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বর দুঃখির উপরেই দুঃখ। ওরে পোড়া বিধাতা আমাদের কপালে এত দুঃখ লিখিস। তোর কি ভাতের পাতে আমরাই ছাই দিয়াছি ?"

এ ভাষা অস্মদীয় ভাষা হউক আর না হউক, ইহা যে খাঁটি বাঙলা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত, ইহার শরীরের লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য-রচনার উপযোগী উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ। এই ভাষার গুণেই তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচিত পল্লিচিত্র পাঠকের চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এ বর্ণনাটি সাধুভাষায় অনুবাদ কর, ছবিটি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। অপরপক্ষে তর্কালঙ্কারমহাশয়ের ভাষাসম্বন্ধে পূর্ব্বোদ্ধৃত উক্তিটি ভাষায় অনুবাদ কর, তাঁহার বক্তব্য কথা সুস্পষ্ট হইয়া আসিবে। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কারমহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি অবলম্বন করিতেন তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত এবং পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত। কিন্তু তাঁহারা তর্কালঙ্কারমহাশয়ের গৌড়ীয়-রীতিকেই গ্রাহ্য করিয়া তাহাকে সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পণ্ডিতগণের ত্যক্ত দায় আমরা উত্তরাধিকারী-সত্বে লাভ করিয়া অদ্যাপি

তাহাই ভোগদখল করিয়া আসিতেছি। প্রবোধচন্দ্রিকার তৃতীয় স্তবকের কুসুমগুলি মেঠো হইলেও স্বদেশী ফুল। আর প্রথম স্তবকের কুসুমগুলি শুধু কাগজের নয়, তুলোট কাগজের ফুল। আবাদ করিতে জানিলে কাঠ-গোলাপ বসরাই-গোলাপে পরিণত হয়। কিন্তু কালের কবলে ছিন্ন ভিন্ন বিবর্ণ হওয়া ব্যতীত কাগজের ফুলের গত্যন্তর নাই।

(৭)

কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, এই দুই ভাষার মিলন-সূত্রেই বর্ত্তমান সাধুভাষা জন্মলাভ করিয়াছে; কিন্তু আমার ধারণা অন্যরূপ। বর্ণে ও গঠনে এই দুই ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক-জাতীয় সুতরাং ইহাদের যোগাযোগে কোনরূপ নূতন পদার্থের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। বহুকালযাবৎ এ দুই পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই চর্চ্চা করা হইয়াছিল। একের পরিণতি কালীসিংহমহাশয়ের মহাভারতে, অপরের পরিণতি তাঁহার হুতুম পেঁচার নক্সায়। ইহার কারণও স্পষ্ট। হুতোমি ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করা মূর্খতা এবং মহাভারতের ভাষায় সামাজিক নক্সা রচনা করা ছন্নতামাত্র।

যে ভাষা আসলে এক, জোর করিয়া তাহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এই দুই ভাষা রচিত হয়। সে ভাঙ্গা জোড়া লাগাইবার চেষ্টা বৃথা। আমাদের মৌখিক ভাষা নিছক চাষার ভাষাও নহে, নিটোল সংস্কৃতও নহে। আমাদের মুখের ভাষায় বহু তৎসম শব্দ এবং বহু তদ্ভব শব্দ আছে। দেশীয় শব্দও যে নাই তাহা নহে, তবে তাহাদের সংখ্যা এত অল্প যে নগণ্য

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হয় তৎসম, নয় তদ্ভব শব্দ বর্জ্জন করিয়া বাঙলা লেখার অর্থ ভাষার উপর অত্যাচার করা,—অকারণে অযথারূপে তাহাকে হয় স্ফীত করিয়া তোলা, নয় শীর্ণ করিয়া ফেলা। সুতরাং এ দুই পথের ভিতর কোনও মধ্য-পথ রচনা করিবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না—কেননা সে মধ্যপথ ত চিরকালই আমাদের মুখস্থ ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের ভার কতদূর সয়, মৌখিক ভাষার প্রতি কর্ণপাত করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এ জ্ঞান আর কাহারও থাক আর নাই থাক, রামমোহন রায়ের ছিল।

(৮)

তিনি তাঁহার বেদান্তগ্রন্থের অনুষ্ঠানে লিখিয়াছেন যে—

"প্রথমতঃ বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপারের নির্ব্বাহযোগ্য কেবল কতকগুলিন শব্দ আছে। এ ভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিংবা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের (Sentence) গদ্য হইতে অর্থবোধ করিতে পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থবোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্তশাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এ নিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধুভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক।"

সকল দেশেই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষার যে ঐশ্বর্য্য আছে অশিক্ষিত-সম্প্রদায়ের ভাষায় তাহা নাই। সমাজের নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা ধনে ও মনে সমান দরিদ্র। তাহাদের জ্ঞান নিতান্ত সীমাবদ্ধ এবং ভাষাও সঙ্কীর্ণ। যদি ভদ্র-সমাজের মৌখিক ভাষা সাধুভাষা হয়, তাহা হইলে সাধুভাষাই সাহিত্যের একমাত্র উপযোগী ভাষা। এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, লৌকিক-ভাষা এই সাধুভাষার অন্তর্ভূত, বহির্ভূত নয়। রামমোহন রায় যাহাকে গৃহব্যাপারে নির্ব্বাহযোগ্য শব্দ বলেন সেই শব্দসমূহই সকল ভাষার মূলধন।

রামমোহন রায় বলিয়াছেন যে, এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন। এ কথাও আমরা মানিতে বাধ্য। কিন্তু সে অধীনতা অভিধানের অধীনতা, ব্যাকরণের নয়, এই সত্যটি মনে রাখিলে ব্যাকরণ আমাদের নিকট বিভীষিকা হইয়া দাঁড়ায় না। ভাষার স্বাতন্ত্র্য যে তাহার গঠনের উপর নির্ভর করে, এ সত্য রামমোহন রায়ের নিকট অবিদিত ছিল না। তাঁহার মতে—

"ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় শব্দের বর্ণগত নিয়ম ও বৈলক্ষণ্যের প্রণালী ও অন্বয়ের রীতি যে গ্রন্থের অভিধেয় হয়, তাহাকে সেই সেই দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ কহা যায়।"

অতএব এক ভাষা অপর-ভাষার ব্যাকরণের অধীন হইতে পারে না।

আমরা যখন দৈনিক জীবনের অন্নবস্ত্রের, সুখদুঃখের অতিরিক্ত কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই, তখন সংস্কৃত অভিধানের আশ্রয় লওয়া ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর নাই। নানা ভাষার মধ্যে শব্দের পরস্পর আদান-প্রদান আবহমান-কাল সভ্য-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। আবশ্যক-মত ঐরূপ শব্দ

আত্মসাৎ করায় ভাষার কান্তি পুষ্ট হয়—স্বরূপ নষ্ট হয় না। নিতান্ত বাধ্য না হইলে এ কাজ করা উচিত নয়, কেননা পর-ভাষার শব্দ আহরণ কিম্বা হরণ করা সর্ব্বত্র নিরাপদ নহে। শব্দের আভিধানিক অর্থ তাহার সম্পূর্ণ অর্থ নয়, আভিধানিক অর্থে ভাবের আকার থাকিলেও তাহার ইঙ্গিত থাকে না। লৌকিক-শব্দের আদ্যোপান্ত বর্জ্জন এবং অপর ভাষার অন্বয়ের অনুকরণেই ভাষার জাতি নষ্ট হয়। মৌখিক ভাষার প্রতি ঐরূপ ব্যবহার করিবার যো নাই। সুতরাং শিক্ষিত লোকের সকল অত্যাচার লিখিত-ভাষাকেই নীরবে সহ্য করিতে হয়।

রামমোহন রায় যে মৌখিক ভাষার উপরেই তাঁহার রচনার ভাষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ, তাঁহার ব্যবহৃত পদসকল অবৈধসন্ধিবদ্ধ কিম্বা সমাসবিড়ম্বিত নহে। তিনি জানিতেন যে, "সংস্কৃত সন্ধিপ্রকরণ ভাষায় উপস্থিত করিলে তাবৎ গুণদায়ক না হইয়া বরঞ্চ আক্ষেপের কারণ হয়।" সমাস-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, "এরূপ পদ গৌড়ীয় ভাষাতে বাহুল্যমতে ব্যবহারে আসে না।" তাঁহার মতে "হাড়ভাঙ্গা" "গাছ-পাকা" প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা-সমাসের উদাহরণ। তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকেরা যদি এই সত্যটি বিস্মৃত না হইতেন তবে তাঁহারা বাঙলা সাহিত্যকে সংস্কৃতের জাগ দিয়া পাকাইতে চাহিতেন না এবং হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া দাঁতভাঙ্গা সমাসের সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মৌখিক ভাষার সহজ সাধুত্ব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন বলিয়া বানান-সমস্যারও অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মতে খাঁটি সংস্কৃত শব্দ সংস্কৃতরীতি-অনুসারেই লিখিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং তদ্ভব ও দেশীয় শব্দের বানান তাহার উচ্চারণের অনুরূপ হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ যে

স্থলে শ্রুতিতে স্মৃতিতে বিরোধ উপস্থিত হয়, সে স্থলে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে স্মৃতি মান্য এবং বাঙলা শব্দ সম্বন্ধে শ্রুতি মান্য। রামমোহন রায় বঙ্গ-সাহিত্যের যে সহজ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন সকলে যদি সেই পথের পথিক হইতেন তাহা হইলে আমাদের কোনরূপ আক্ষেপের কারণ থাকিত না।

কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গ-সাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনা-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়। পদে পদে পূর্ব্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়। সুতরাং আমাদের দেশে ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যে পণ্ডিতি যুগের অবসান হইল এবং ইংরাজি যুগের সূত্রপাত হইল। ইংরাজি-সাহিত্যের আদর্শেই আমরা বঙ্গ-সাহিত্য রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। Milton না পড়িলে বাঙালী মেঘনাদবধ লিখিত না, Scott না পড়িলে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত না এবং Byron না পড়িলে পলাশীর যুদ্ধ লিখিত না। সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বঙ্গ-সাহিত্য ইংরাজি-সাহিত্যের একান্ত অধীন হইয়া পড়িল,—ফলে বঙ্গ-সাহিত্য তাহার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ আবার হারাইয়া বসিল। এই ইংরাজি-নবিস লেখকদিগের হস্তে বঙ্গভাষা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। সংস্কৃতের অনুবাদ যেমন পণ্ডিতদিগের মতে সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইত, ইংরাজির কথায় কথায় অনুবাদ তেমনি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট সাধুভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এই অনুবাদের ফলে এমন বহু শব্দের সৃষ্টি করা হইল যাহা বাঙালীর মুখেও নাই

এবং সংস্কৃত অভিধানেও নাই। এবং এই সকল কষ্টকল্পিত পদই এখন বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান সম্বল। নিতান্ত দুঃখের বিষয় এই যে, এই সকল নব শব্দ গড়িবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। সংস্কৃত দর্শনে বিজ্ঞানে কাব্যে অলঙ্কারে যথেষ্ট শব্দ আছে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদিগের নবশিক্ষালব্ধ সকল মনোভাব বঙ্গ-ভাষার জাতি ও প্রকৃতি রক্ষা করিয়া অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারি। আমরা তথাকথিত সাধু-ভাষার বিরোধী, কেননা আমাদের বিশ্বাস, বঙ্গভাষা ব্রাত্য-সংস্কৃতও নহে, শাপ-ভ্রষ্ট ইংরাজিও নহে। এই কারণে আমরা মৌখিক ভাষাকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই; কারণ সে ভাষা সহজ সরল সুঠাম এবং সুস্পষ্ট।

সুতরাং আমাদের এ চেষ্টা যে মাতৃভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-মূলক, এ অভিযোগের কোনরূপ বৈধ কারণ নাই। যদি কেহ বলেন যে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ", সুতরাং সে পথ অনুসরণ না করা ধৃষ্টতামাত্র, তাহার উত্তরে আমরা বলিব, বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা যুগভেদ এবং শিক্ষাভেদ-অনুসারে নানা বিভিন্ন পথের পথিক। দর্শনের ন্যায় সাহিত্য-ক্ষেত্রেও মার্গভেদ আছে; আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনেরা এই ভাষা লইয়া experiment করিয়াছেন; সুতরাং নূতন experiment করিবার অধিকার আমাদের আছে। গদ্য-সাহিত্যের বয়স এখন সবে একশ বৎসর, কাজেই তাহার পরীক্ষার বয়স আজও পার হয় নাই। টোলের ও কলেজের বাহিরে যে ভাষা মুখে মুখে চলিতেছে, সে ভাষার অন্তরে কতটা শক্তি আছে, সে পরীক্ষা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। আমরা সেই পরীক্ষা করিতে চাই। লোকে বলে যখন প্রাক্-ব্রিটীশ যুগে গদ্য ছিল

না, তখন গত-শতাব্দীর গদ্যই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আমরা নিত্য যে ভাষায় কথাবার্ত্তা কই তাহারই নাম যে গদ্য, এ সত্য মোলিয়োরের নাটকের নিরক্ষর ধনী বণিকের জানা ছিল না, কিন্তু আমাদের আছে। সাহিত্যে সেই সনাতন আদর্শই আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আমি ভাষা সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম তাহার কারণ, এই-রূপ সভাসমিতিতে সাহিত্যের যাহা সাধারণ সম্পত্তি তাহার আলোচনা এবং তাহার বিচার হওয়াই সঙ্গত।

(৯)

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ভাষার নাম কাব্য-শরীর; কিন্তু এ শরীর ধরা-ছোঁয়ার মত পদার্থ নয় বলিয়া যাঁহারা এ পৃথিবীতে শুধু স্থূলের চর্চ্চা করেন, সাহিত্যের প্রতি তাঁহাদের চিরদিনই একটি আন্তরিক অবজ্ঞা থাকে এবং ইংরাজি শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের নিকট অর্ব্বাচীন বঙ্গ-সাহিত্যই বিশেষ করিয়া অবজ্ঞার সামগ্রী হইয়াছিল। এই বিরাট কুসংস্কারের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইবার শক্তি ও সাহস পূর্ব্বে ছিল কেবলমাত্র দু'চারিজন ক্ষণ-জন্মা পুরুষের। কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চা যে জীবনের একটি মহৎ কাজ, এ ধারণা যে আজ বাঙ্গালীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই সম্মিলনী। আমাদের নব শিক্ষার প্রসাদে আমরা জানি যে, সাহিত্য জাতীয়-জীবন-গঠনের সর্ব্বপ্রধান উপায়, কেননা সে জীবন মানবসমাজের মনের ভিতর হইতে গড়িয়া উঠে। মানুষের মন সতেজ ও সজীব না হইলে মানব-সমাজ ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারে না। যে মনের ভিতর জীবনী-

শক্তি আছে তাহার স্পর্শেই অপরের মন প্রাণলাভ করে এবং মানুষে একমাত্র শব্দের গুণেই অপরের মন স্পর্শ করিতে পারে। অতএব সাহিত্যই একমাত্র সঞ্জীবনী মন্ত্র। আমাদের সামাজিক জীবনের দৈন্য জগৎবিখ্যাত এবং সে দৈন্য দূর করিবার জন্য আমরা সকলেই ব্যগ্র। এই কারণেই শিক্ষিত লোকমাত্রেরই দৃষ্টি আজ সাহিত্যের উপর বদ্ধ। সাহিত্যই আমাদের প্রধান ভরসাস্থল বলিয়াই বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রতি আমাদের অসন্তোষও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে। এ অসন্তোষের কারণ এই যে, লোকে সাহিত্যের নিকট যতটা আশা করে, প্রচলিত সাহিত্য সে আশা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না। কাজেই নানা দিক হইতে নানা ভাবে নানা ভঙ্গীতে নানা লোকে এই শিশুসাহিত্যের উপর আক্রমণ করিতেছেন। এই সকল সমালোচনার মোটামুটি পরিচয় নেওয়টা আবশ্যক।

(১০)

আজ আমরা সকলে মিলিয়া এ সাহিত্যের জাতবিচার করিতে বসিয়াছি। এ নবপণ্ডিতের বিচার, ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বিচার নহে। কেননা বঙ্গ-সাহিত্য স্বজাতীয় কি বিজাতীয়,—সে বিচার ইউরোপীয় শাস্ত্রের অধীন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যের পুষ্পচয়ন করি আর না করি, ইউরোপীয় শাস্ত্রের পল্লব যে গ্রহণ করি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের নব সমালোচকেরা প্রধানত দুই শাখায় বিভক্ত। একদলের অভিযোগ এই যে, নব সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা প্রাচীন নয়। অপর দলের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় নয়, কেননা তাহা লৌকিক নহে।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারমহাশয় গত দুই বৎসর ধরিয়া লোকারণ্যে এই বলিয়া রোদন করিতেছেন যে, দেশের সর্ব্বনাশ হইল, সুকুমার সাহিত্য মারা গেল। তাঁহার আক্ষেপ এই যে, তাঁহার কথায় কেহ কান দেয় না, কেননা বাঙালী আজ তাঁহার মতে—"মস্তিষ্কের তীব্র চালনা গুণে পাইতেছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিদ্যাদর্শন পুরাবৃত্ত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব জীবতত্ত্ব; হারাইতে বসিয়াছে—দয়ামায়া শ্রদ্ধাভক্তি, স্নেহ-মমতা, কারুণ্য-আতিথ্য আনুগত্য শিষ্যত্ব। আমরা কোমলপ্রাণ বাঙালী, আমাদের আশঙ্কা হয়, আমরা কোমলতা হারাইয়া বুঝিবা সর্ব্বস্ব হারাইয়া ফেলি।" বাঙালীর হৃদয়ের রক্ত সব যে মাথায় চড়িয়া গিয়াছে এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অবশ্য বাঙালীর জীবনসংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তবে মস্তিষ্কের চালনা ব্যতীত এ যুগে যে সাহিত্য রচনা করা যাইতে পারে না এ কথা নিশ্চিত। সরকার-মহাশয় প্রাচীন সাহিত্যের পক্ষপাতী, কেননা তাঁহার বিশ্বাস অতি নিকট-অতীতে,—

"বাঙ্গালী গ্রামে গ্রামে পালোয়ান, বাগ্‌দী, গোপ চণ্ডাল প্রহরী রাখিয়া আপনাদের বিত্তস্বত্ব রক্ষা করিত", এবং তাহার প্রধান কাজ ছিল—"আহারান্তে খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে খুঁটি হেলান দিয়া মুটকলমে ইতিহাস পুরাণ অবলম্বনে পুঁথি লেখা।" এভাবে অবশ্য আমরা পুঁথি লিখিতে পারি না, কেননা আমাদের বিত্ত উপার্জ্জন করিতে হয় বলিয়া আমরা আহারান্তে আপিসে যাই এবং পেন্-কলমে ইংরাজি ভাষাতে ছাই পাঁশ কত কি লিখি। কিন্তু সরকারমহাশয় কোথা হইতে এ সত্য সংগ্রহ করিলেন যে পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাঙলা আলস্যের স্বর্গ ছিল? যাঁহারা পুরাতত্ত্বের সন্ধানে ফেরেন, তাঁহারা ত অদ্যাবধি এ

বাঙলার সাক্ষাৎ লাভ করেন নাই। বোধ হয় সেই কারণেই ইতিহাস, সরকারমহাশয়ের কোমল বাঙালী প্রাণে এত ব্যথা দেয়। "বাঙ্গলা-সাহিত্যে যে ইতিহাসের পর দর-ইতিহাস, তাহার পর ছে-ইতিহাস দাখিল হইতেছে, আবার ইদানিং সওয়াল-জবাবও যে আরম্ভ হইয়াছে", ইহা অক্ষয়বাবুর নিকট অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের নিকট একেবারেই অসহ্য। কেননা এ শ্রেণীর ইতিহাস রচনার জন্য মস্তিষ্ক চালনার প্রয়োজন আছে। অপরপক্ষে সরকারমহাশয়ের রচিত পুরাবৃত্ত কেবল-মাত্র কল্পনা চালনার দ্বারাই সৃষ্ট হয় এবং তাহার গঠনে কিম্বা পঠনে বাঙালীর কোমলতা হারাইবার কোনও আশঙ্কা নাই। আমি সরকারমহাশয়ের মতামত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—কেননা নানা দিক হইতে ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। এ মত-সম্বন্ধে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। এ সকল কথার মূল্য যে কত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে কোনরূপ মস্তিষ্ক চালনার আবশ্যকতা নাই। বঙ্গ-সাহিত্য যতই শিশু হউক না কেন, আমার বিশ্বাস এরূপ আক্রমণে তাহা মারা যাইবে না।

(১১)

অপরশ্রেণীর সমালোচকেরা আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের বিরোধী। ইঁহাদের মতে সে সাহিত্য নেহাৎ বাজে, কেননা তাহা সমাজের কোনও কাজে লাগে না। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের গদ্য ও পদ্যকাব্যসকল যদি সরকারমহাশয়ের বর্ণিত আলস্যজাত সুকুমার সাহিত্য হয়, তাহা হইলে, সে কাব্য যে সম্পূর্ণ নিরর্থক এবং সর্ব্বথা উপেক্ষণীয় সে বিষয়ে আর দ্বিমত

নাই। সরকারমহাশয়ের অভিযোগ এই যে, বর্ত্তমান সাহিত্য জাতীয় চরিত্রের উন্নতি-সাধন করিতেছে না। এ সাহিত্য লোকশিক্ষার সহায় নয়, কেননা ইহা লৌকিক নয়, অতএব ইহা জাতীয় জীবন গঠনের উপযোগী নয়।

এ যুগের সাহিত্য যে লৌকিক নহে, তাহা সকলেই জানেন, কেননা এ সাহিত্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে-গড়া সাহিত্য। আমাদের সাহিত্য যদি এই কারণে নিরর্থক হয়, তাহা হইলে তাহার এই সমালোচনা আরও বেশি নিরর্থক। শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত লোকের মনের প্রভেদ বিস্তর। এই পার্থক্য যদি দোষের হয়, তাহা হইলে এদেশে শিক্ষার পাট উঠাইয়া দেওয়া উচিত। শিক্ষিত লোকের রচিত সাহিত্যে শিক্ষিত মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের শ্রেষ্ঠ-সাহিত্য এই শ্রেণীরই সাহিত্য। শকুন্তলা, Hamlet, Divina Comedia প্রভৃতি স্বল্পবুদ্ধি এবং অল্পজ্ঞানের যোগাযোগে রচিত হয় নাই। মনেরও উপর্য্যুপরি নানা লোক আছে এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্য মানসিক উর্দ্ধলোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোন পদার্থ নাই, সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিষ। এ যুগে এদেশে যদি এমন কাব্য রচিত হইয়া থাকে, যাহা সকল দেশের শ্রেষ্ঠ-মনের পূজার সামগ্রী, তাহা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের যে কোনও সার্থকতা নাই, এরূপ কথার কোনও অর্থ থাকে না। বিশ্ব-

মানবের কাছে আমাদের কাব্যসাহিত্য যে, সে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে তাহা ত সর্ব্বজনবিদিত। Utilitarianism-এর সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না। Faust-এর প্রথম ভাগ, শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ নহে বলিয়া, জর্ম্মাণ পেট্রিয়টিজম সে কাব্যের বিরুদ্ধে কখনও খড়্গহস্ত হয় নাই। প্রতিভাশালী লেখকেরা যে লোকশিক্ষক নহেন, তাহার কারণ তাঁহারা দুনিয়ার শিক্ষকদিগের শিক্ষক।

(১২)

লোকরচিত কিম্বা লোকপ্রিয়—এ দুই অর্থেই লৌকিক সাহিত্য, গান ও গল্পের সাহিত্য। সে গানের বিষয় দৈনিক জীবনের সুখ ও দুঃখ এবং সে গল্পের বিষয় দৈনিক জীবনের বহির্ভূত আশ্চর্য্যকর ঘটনাবলী। গল্প ও গুজবে মিলিয়া যে আজগুবি ব্যাপারের সৃষ্টি হয়, তাহাই জনসাধারণের চিরপ্রিয়। গীতি-কবিতা এবং রূপকথাই লোক-সাহিত্যের চিরসম্বল। এ সাহিত্য আমাদের নিকট তুচ্ছ নয়, কেননা আমরাও মানুষ এবং এইরূপ সুখ দুঃখের আমরাও সমান অধীন। গল্প শুনিতে আমরাও ভালবাসি এবং রূপকথার মায়া আমরাও কাটাইতে পারি না। আমাদের রচিত উপন্যাস নবন্যাসাদিতেও যদি রূপ না থাকে তাহা হইলে তাহা কথা বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হউক, আমাদের কল্পনা তাহার সীমা লঙ্ঘন করিতে সদাই উৎসুক। আমাদের দর্শন-বিজ্ঞানের কথাও কতক-অংশে স্বরূপ কথা, কতক অংশে রূপকথা

এবং এই কারণেই তাহা মানুষের শুধু মন নয়, হৃদয়ও আকর্ষণ করে। ইভলিউশনের ইতিহাসের ন্যায় বিচিত্র কথা কোনও রাজারাণীর উপাখ্যানেও নাই। আমাদের বিজ্ঞানের আলয়, আমাদের নিকটেও এক-হিসাবে যাদুঘর। জনসাধারণের সহিত কৃতবিদ্য লোকের প্রভেদ এই যে, তাহাদের নিকট তাহা যাদুঘর ব্যতীত আর কিছুই নয়। বৈজ্ঞানিক কৌতূহল এবং অবৈ-জ্ঞানিক কৌতূহলের ভিতর ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভেদ। শূদ্র-সাহিত্যে দ্বিজের সম্পূর্ণ অধিকার আছে কিন্তু দ্বিজ-সাহিত্যে শূদ্রের অধিকার আংশিক মাত্র। শূদ্রের শাস্ত্রে অধিকার নাই, অধিকার আছে শুধু পুরাণ ইতিহাসে। কারণ এ সাহিত্য গীত হয় এবং ইহা অপূর্ব্ব কল্পনা এবং অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। সাহিত্য-চর্চ্চায় যে অধিকারীভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়; আধুনিক বঙ্গসাহিত্য লৌকিক না হইলেও যে লোকায়ত্ব, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রবীন্দ্র-নাথের অনেক গান এবং বঙ্কিমের গল্প জনসাধারণের আদরের সামগ্রী হইতে পারে কিন্তু সমালোচকদের আলোচনা, গবেষণা, প্রবন্ধনিবন্ধাদিই তাহাদের বুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

(১৩)

পূর্ব্বোক্ত সমালোচকেরা বঙ্গসাহিত্যের যথার্থ কীর্ত্তিগুলির প্রতিই বিমুখ। যদি বঙ্গসাহিত্যের গৌরব করিবার মত কোনও বস্তু থাকে, তাহা হইলে তাহা বঙ্কিমের উপন্যাস, রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং উত্তরবঙ্গ ও পূর্ব্ববঙ্গের নব্য ঐতিহাসিক-সম্প্রদায়ের আবিষ্কৃত বঙ্গদেশের পুরাতত্ত্ব। কিন্তু এই জাতীয় সাহিত্যই

তাঁহাদের নিকট অগ্রাহ্য, কেননা তাহা জাতীয় নয়। কিন্তু যাহা, জাতীয় হউক, বিজাতীয় হউক, সাহিত্যই নয় তাহার বিরুদ্ধে তাঁহারা কোনরূপ উচ্চবাচ্য করেন না। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সাহিত্য রচনা করিবার রহস্য ও কৌশল যদি সমালোচকদিগের জানা থাকে, তবে তাঁহারা স্বয়ং যে সে সাহিত্য রচনা করেন না, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। কেননা বঙ্গসাহিত্যের দৈন্যই এই যে, দু-একটি প্রথম শ্রেণীর লেখক বাদ দিলে বাদবাকী তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীভুক্তও নন। ইউরোপের যে-কোন দেশের হউক বর্ত্তমান সাহিত্যের সহিত তুলনা করিলে এ সত্য সকলের নিকটই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে। এ দৈন্য ইচ্ছা করিলেই আমরা ঘুচাইতে পারি। সাহিত্যের দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণী অধিকার করিবার জন্য অসাধারণ প্রতিভা চাই না, চাই শুধু যত্ন এবং পরিশ্রম। দণ্ডী বলিয়াছেন—

> "ন বিদ্যতে যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা
> গুণানুবন্ধি প্রতিভানমদ্ভুতং।
> শ্রুতেন যত্নেন চ বাগুপাসিতা
> ধ্রুবং করোত্যেব কমপ্যনুগ্রহম্॥"

অর্থাৎ—

অদ্ভুত প্রতিভা এবং প্রাক্তন সংস্কারের অভাব-সত্ত্বেও আমরা যদি সযত্নে সরস্বতীর উপাসনা করি, তাহা হইলে আমরা তাঁহার কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইব না।

বাঙালী জাতির হৃদয়ে রস আছে, মস্তিষ্কে তেজ আছে, তবে যে আমাদের সাধারণ-সাহিত্য যথোচিত রস ও শক্তি বঞ্চিত তাহার জন্য দোষী আমাদের নবশিক্ষা। আমাদের ত্রুটি কোথায় এবং কিসের জন্য, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

মানুষের সকল চিন্তার, সকল ভাবের, একটি-না-একটি অবলম্বন আছে। বস্তুজ্ঞানের উপরেই সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত, সে বস্তু মনোজগতের হউক, আর বহির্জগতেরই হউক। বিদ্যালয়ে কিন্তু আমরা কোনও বিশেষ বস্তুর পরিচয় লাভ করি না অনেক নাম শিখি। আমরা ইংরাজি-ভাষায়, ইংরাজি সাহিত্যে শিক্ষিত হই, অথচ ইংরাজি-জীবনের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয়ও নাই, কাজেই সে শিক্ষার প্রসাদে আমরা সঞ্চয় করি শুধু কথা। আমরা concrete এর জ্ঞান হারাই এবং তাহার পরিবর্ত্তে পাই শুধু abstractions. ফুল বলিয়া কোনও পদার্থ জগতে নাই, আছে শুধু ভাষায়। পৃথিবীতে আছে শুধু যূথি জাতি মালতী মল্লিকা প্রভৃতি। বর্ণে গন্ধে আকারে একটি অপরটি হইতে বিশিষ্ট। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইহারা আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। হথর্ণ লাইলাক জ্যাসমিন ভায়োলেট আমাদের নিকট নামমাত্র। এ নাম আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' প্রবেশ করে না, আমাদের মনে কোনরূপ পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক করে না, কাজেই ফুলমাত্রেই আমাদের নিকট flower হইয়া উঠে। অর্থাৎ অদৃষ্ট বর্ণ অজ্ঞাত আকার এবং অননুভূত গন্ধের একটি নামাশ্রিত সমষ্টিমাত্র হইয়া দাঁড়ায়। ফলে ইংরাজি সাহিত্য হইতে আমরা অধিকাংশ স্থলে কতকগুলি জাতিবাচক, সম্বন্ধবাচক এবং ভাববাচক শব্দ সংগ্রহ করি; অথচ সে জাতি, সে সম্বন্ধ সে ভাব যে কাহার, তাহার কোন খোঁজ নাই। কাজেই আমরা মানুষের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া মনুষ্যত্বের বিচার করিতে বসি। অথচ পৃথিবীতে মানুষ আছে

কিন্তু মনুষ্যত্বনামক জাতিবাচক শব্দের পশ্চাতে কোনও পদার্থ নাই। সকল বিশেষ্যের সকল বিশেষণ বাদ দিয়াই আমরা সর্ব্বনাম লাভ করি। এই সর্ব্বনামেরও অবশ্য সকল ভাষাতেই স্থান আছে। কিন্তু এরূপ পদের ব্যবহারের সার্থকতা সেই স্থলেই আছে, যে স্থলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আমরা সর্ব্বনামকে ভাঙ্গাইয়া বিশেষ্যে পরিণত করিতে পারি। যে সর্ব্বনাম নাম-মাত্র, তাহা কেবল অদৃষ্টার্থ ধ্বনিমাত্র। আমরা আমাদের শিক্ষালব্ধ abstraction লইয়া সাহিত্যে কারবার করি বলিয়াই আমাদের লেখায় না আছে দেহ, না আছে প্রাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যও আমরা ত্যাগ করিতে পারিব না, আমরা স্বদলবলে ইউরোপে গিয়া উপনিবেশও স্থাপন করিতে পারিব না। তবে এ রোগের ঔষধ কি? আমার বিশ্বাস, আমাদের চতুষ্পার্শ্বস্থ reality-র প্রতি মনোযোগ দিলে আমরা এই abstraction-এর দাসত্ব হইতে মুক্ত হইব। অনুভূতিই যে সকল জ্ঞানের মূল, এই সত্যের সম্যক উপলব্ধি না হইলে আমাদের রচিত সাহিত্য অর্থহীন শব্দাড়ম্বরসার হইতে বাধ্য। আমাদের দেশেও ফুলফল গাছপালা আছে, নরনারী ধনীদরিদ্র আছে। এই সকল বস্তুবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞানের উপরেই যথার্থ বঙ্গ-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই কারণেই আমি সাহিত্যে প্রাদেশিকতার পক্ষপাতী। যাঁহারা চিরজীবন প্রকৃতির সহিত মুখোমুখি করিয়া বাস করেন, আশা করা যায়, তাঁহাদের রচনায় এই reality-র রূপ ফুটিয়া উঠিবে। আমি খাঁটি বাঙলা ভাষার পক্ষপাতী, কারণ সে ভাষা concrete (বিশেষ সংজ্ঞক) শব্দ বহুল। এই বিশেষ জ্ঞানের অভাববশত আমরা ইউরোপীয় সাহিত্য হইতে সংগৃহীত সামান্য ভাবগুলিও যথাযোগ্য প্রয়োগ

করিতে পারি না। যে ভাব জীবনসংগ্রামে আমাদের হাতে অস্ত্র হওয়া উচিত, তাহাকে হয় ত আমরা ভূষণস্বরূপে দেহে ধারণ করি। এবং যাহা ভূষ মাত্র, তাহারও আমরা অযথা ব্যবহার করি। ইউরোপের পায়ের মল, গলার হারস্বরূপে বঙ্গ-সরস্বতীকে কণ্ঠস্থ করিতে দেখা গিয়াছে।

পরীক্ষাব্যতীত কোন বস্তুরই সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন বস্তুকেই পরীক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই। ইহাও আমাদের শিক্ষার দোষে। দিব্যাবদানে দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ যুগে জম্বুদ্বীপে কুলপুত্রদিগকে অষ্টবিধ বস্তু পরীক্ষা করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু এ যুগে স্কুল-কলেজে আমরাই পরীক্ষিত হই, কিছুই পরীক্ষা করিতে শিখি না। আমরা যদি রত্ন পরীক্ষা করিতে শিখিতাম তাহা হইলে আমরা সাহিত্যে কাচকে মণি এবং মণিকে কাচ বলিতে ইতস্তত করিতাম। আমাদের পক্ষে পরীক্ষা-বিদ্যা শিক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আমরা নানা দেশের নানা যুগের নানা শাস্ত্র পড়ি অথচ দেশী বিদেশী নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কোনটি গ্রাহ্য এবং কোনটি অগ্রাহ্য, তাহা স্থির করিতে পারি না। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ এবং প্রাচীন ভারতবর্ষ উভয়কেই সম্বোধন করিয়া বলি,—"ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন মোহয়সি মাম"। এ অবস্থায় সকল বিষয়েরই যে দুটি দিক আছে, এইমাত্র আমরা জানি কিন্তু কোন্‌টি যে তার দক্ষিণ আর কোনটি যে বাম, সে জ্ঞান আমাদের নাই। মাসেরও যে দুটি পক্ষ আছে, এই জ্ঞান আমরা পঞ্জিকা হইতেও সংগ্রহ করিতে পারি কিন্তু তাহার কোনটি কৃষ্ণ এবং কোনটি শুক্ল তাহা জানিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখা আবশ্যক।

বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে মহা আশার কথা এই যে, অন্তত ইহার একটি শাখায় এই পরীক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির নিকট ইহার জন্য আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। সুহৃদ্বর অক্ষয় কুমার মৈত্রমহাশয় এবং তাঁহার শিষ্যবর্গ বরেন্দ্রমণ্ডলের ভূগর্ভে লুক্কায়িত দেবদেবীগণকে টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে ইতিহাসের কাটগড়ায় খাড়া করিয়া আজ প্রশ্ন করিতেছেন, জেরা করিতেছেন। কেবলমাত্র জবানবন্দী লইয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন না, আবশ্যকমত সওয়ালজবাব করিতেও তাঁহারা প্রস্তুত। এরূপ পরীক্ষা-কার্য্যে বাঙালীর কোমল প্রাণে ব্যথা দিতেও যে নব ঐতিহাসিকেরা কুণ্ঠিত নন, তাহার প্রমাণস্বরূপ আমি তাঁহাদের কৃতকার্য্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চাই। "মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক একটি তাম্রপট্টলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে তাহাকে সিন্দূর লিপ্ত করিয়া আমরণ পূজা করিয়াছিল।" এই তাম্রশাসনখানি ঐতিহাসিকদের হাতে পড়িয়া সিন্দুরচর্চ্চিত এবং পূজিত হইতেছে না, পরীক্ষিত হইতেছে।

বঙ্গসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদেরও ইঁহাদের প্রদর্শিত পদ্ধতিই অবলম্বন করিতে হইবে। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ, ভূর্জ্জপত্রে লিখিত এবং বিলাতি কাগজে মুদ্রিত লিপিকে সিন্দূর লিপ্ত করিয়া পূজা করিবার যুগ চলিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে লিপিমাত্রই, সে প্রাচীনই হউক আর অর্ব্বাচীনই হউক, বাঙালীর হাতে পরীক্ষিত হইবে। কেবলমাত্র লিপি পরীক্ষা করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব না। ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সমাজের মন, নিজের মন,—এই সকল বিষয়ই সাহিত্যের বিচারালয়ে পরীক্ষা দিতে

বাধ্য হইবে। এ বিচার কেবল দর্শনে বিজ্ঞানে নয়, নাটকে নভেলেও হইবে। কেননা বিদ্যার সহিত সম্পর্কহীন সাহিত্য সভ্য-সমাজে আদৃত হইতে পারে না। সমাজের সকল জ্ঞান, সাহিত্যে কেন্দ্রীভূত এবং প্রতিফলিত হইতে বাধ্য। যে কথা বিনা পরীক্ষায় ডবলপ্রমোশন পায়, সে কথা ভবিষ্যতের সাহিত্যে স্থান লাভ করিবে না। সত্যের স্পর্শ সহ্য করিবার অক্ষমতার নাম যদি কোমলতা হয়, তাহা হইলে জাতীয় মন হইতে সে কোমলতা দূর করিতে হইবে। কেননা ও কোমলতা দুর্ব্বলতারই নামান্তর এবং যুক্তিতর্কের উপর্য্যুপরি আঘাতে সে মনকে কঠিন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের সাহিত্যের সৌকুমার্য্য নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

ভবভূতি বলিয়াছেন—"মহাপুরুষের মন যুগপৎ বজ্রকঠিন এবং কুসুমসুকুমার"। জাতীয় মহাপুরুষত্ব লাভই সাহিত্য-সাধনার ধ্রুবলক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমি বঙ্গসাহিত্যের আর একটি ত্রুটির বিষয় উল্লেখ করিতে চাহি। আমাদের গদ্যের ভাষা ও ভাব দুই-ই শিথিলবন্ধ। আমাদের রচনায় পদ, বাক্য—কিছুই সুবিন্যস্ত নয় এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বন্ধ নয়। ইহা যে শক্তি-হীনতার লক্ষণ তাহা বলা বাহুল্য, যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সকলের পরস্পর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্য্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের রচনা সুগঠিত হবে না; সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হবে না।

ভাষার ন্যায় ভাবও রচনা করিতে হয়। আমাদের চিত্তবৃত্তি

স্বতই বিক্ষিপ্ত। যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট, তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম্ম।

যে সকল মনোভাব গ্রন্থিবদ্ধ নয়, তাহাদের বিশৃঙ্খল সমষ্টি সমগ্রতা নয়। চিন্তাগঠনের প্রণালীকেই আমরা লজিক বলি। লজিক এবং আর্টের সম্পর্ক যে অতি ঘনিষ্ঠ, গ্রীকসভ্যতাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেননা, আর্ট এবং লজিক—এই দুই এ সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। প্রকরণভঙ্গতা সংস্কৃত-সাহিত্যে মহাদোষ বলিয়া গণ্য। আমাদের গদ্য রচনা যে, এ দোষে অল্প-বিস্তর দুষ্ট, এ কথা অস্বীকার করিবার যো নাই। এ দোষ বর্জ্জন করিবার জন্য প্রতিভার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন আছে শুধু মনোযোগের। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধিলাভ করা যায় না। ধ্যান-ধারণা করা আর না করা আমাদের ইচ্ছাধীন। সুতরাং ইচ্ছা করিলেই আমরা আমাদের রচনা দৃঢ়বন্ধ করিতে পারি।

আমার বিশ্বাস, বাঙালী জাতির হৃদয়-মনের ভিতর অপূর্ব্ব শক্তি আছে। যে শক্তি আজ আংশিকভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, সেই প্রচ্ছন্ন শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তিই আমাদের সকল সাধনার বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। এই কারণেই আমি যে ভাষা ও যে ভাব, সাহিত্যের সেই শক্তির পূর্ণবিকাশের বাধাস্বরূপ মনে করি, তাহার দূরীকরণের প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি।

এ যুগে নিজের মতকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন, অথচ নিজের মনে যাহা সত্য বলিয়া ধারণা, তাহা প্রকাশ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। সুতরাং যাঁহারা আমার মত গ্রাহ্য করিতে অক্ষম, তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন বিনা

বিচারে এ মতের প্রতি সাহিত্য-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ড প্রচার না করেন। আমি একটিমাত্র সত্যকে ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, সে সত্য এই যে, বাঙালী জাতির দেহে প্রাণ আছে। প্রাণের অস্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বাহ্যবস্তুর স্পর্শে তাহা সাড়া দেয়। আজ একশত বৎসর ধরিয়া বাঙালীর মনের সকল অঙ্গ, ইউরোপীয় সভ্যতার স্পর্শে যথোচিত সাড়া দিয়াছে। এই ধ্রুবসত্যের উপরেই সাহিত্য সম্বন্ধে আমার সকল মতামত প্রতিষ্ঠিত।

ফাল্গুন, ১৩২১ সন।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য।

——:o:——

অনেকে বলে' থাকেন যে, আমাদের সাহিত্যের সত্যযুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই এদেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছে। এখন ঘোর কলি, কেননা এ যুগে সাহিত্যের যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে, সে হচ্ছে সমালোচনা, এবং আমাদের যত কিছু লাফাঝাঁপি সে সব ঐ এক পায়ের উপর, তারপর ভবিষ্যতে যখন উক্ত পদের আস্ফালন বন্ধ হবে, তখন মন্বন্তর। এ সব কথা শুনে আমি হতাশ হ'য়ে পড়িনে, কেননা অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালবাসা দুই-ই বেশি আছে। আমরা ইভলিউসন-পন্থী; সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই—সুমুখে গড়ে উঠছে। আমাদের কল্পিত ধরার স্বর্গ অতীতের ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে না, বর্ত্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্ত্তমান ঢের বেশি মূল্যবান। অতীতের সাহায্যে আমরা বড় জোর বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা করতে পারি, তাও আবার আংশিক ভাবে, কিন্তু বর্ত্তমানের সাহায্যে আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আবিষ্কার করার চাইতে নির্ম্মাণ করা যে-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, অতীতের জ্ঞানের চাইতে বর্ত্তমানের জ্ঞান লাভ করা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ বর্ত্তমান-কেই সব চাইতে কম চেনে এবং কম জানে। এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই সব চেয়ে অপরিচিত। যা চব্বিশ ঘণ্টা

আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড় একটা দৃষ্টিপাত করিনে। ঐ কারণেই বর্ত্তমানের চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না, এবং তার রূপ আমাদের মনে ধরে না। তা ছাড়া বর্ত্তমান একটি প্রবাহ, দিনের পর দিন হচ্ছে কালের ঢেউয়ের পরে ঢেউ, সুতরাং এ বর্ত্তমানের ইয়ত্তা করতে হ'লে কালের ঢেউ গুণতে হয়; অপর পক্ষে অতীত হচ্ছে একটি জমাট নিরেট জড় পদার্থ, তার চারিদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়, সুতরাং অতীতের গুণকীর্ত্তন করা নেহাৎ সহজ, বিশেষত চোখ বুজে। আর এক কথা, স্বদেশের অতীত হচ্ছে প্রতি জাতির পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি, এবং তা' সমাজের ভোগ-দখলের বিষয়, অতএব তার প্রতি সাংসারিক মনের টানও বেশি, মানও বেশি। বর্ত্তমানের দুর্ভাগ্য এই যে, তা অস্থাবর। এবং তার যা ভোগ সে শুধু কর্ম্মভোগ। এই কারণে বর্ত্তমানকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না। বর্ত্তমান সাহিত্য হচ্ছে বর্ত্তমানেরই একটি অঙ্গ, কাজেই বর্ত্তমান সাহিত্যিকরা গেঁয়ো যোগীর ন্যায় সমাজের কাছে ভক্তি পাওয়া দূরে থাক, ভিখও পান না। অথচ এই উপেক্ষিত বর্ত্তমানই যখন আমাদের অদূর ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল, তখন এ যুগের সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। চেষ্টা করলে হয়ত এর ভিতর থেকেও একটা আশার চেহারা বার করা যেতে পারে।

আমাদের পক্ষে নব-সাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ, প্রশংসা করা তেমনি কঠিন। কেননা খ্যাতনামা লেখকদের বিচার করবার অধিকার যেখানে কারও নেই, সেখানে অখ্যাতনামা লেখকদের উপরে জজ হয়ে বসবার অধিকার সকলেরই আছে। জন্মাবধি উঠতে বসতে খেতে শুতে যে বস্তুর সুখ্যাতি শুনে

আসছি, সে বস্তু যে মহার্ঘ, এ বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। গুরুজনদের তৈরী মত আমরা বিনাবাক্যে মেনে নেই, কেননা তা মেনে নেবার ভিতর মনের কোনও খাটুনি নেই। যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করব, তাহ'লে গুরুর দরকার কি? আর যদি আমরাই পূজা করব তাহ'লে পুরোহিতের দরকার কি? কেননা গুরুপুরোহিতেরা সমাজের হাতেগড়া, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক labour saving machines. নব-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যই এই যে, তা অতীতের ডিপ্লোমা নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না। এ সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হ'লে নিজের অনুভূতি দিয়ে তা যাচাই করতে হয়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তা পরীক্ষা করতে হয়। আমরা ক'জনে সে পরিশ্রমটুকু করতে রাজি? সুতরাং নব-সাহিত্যের প্রশংসার চাইতে নিন্দাই যে বেশির ভাগ শোনা যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কারণ নেই। এই সকল নিন্দাবাদের বিচারসূত্রেই আমরা প্রকারান্তরে নব-সাহিত্যের গুণাগুণের বিচার করতে চাই।

নব-সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অপর্য্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন, চুটকি ও নকল। আমি একে একে এই সকল অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

নব সাহিত্যের পরিমাণ যে অপর্য্যাপ্ত তা অস্বীকার করবার যো নেই। বর্ত্তমানে এত নিত্য নূতন পুস্তক এবং পুস্তিকা, পত্র এবং পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যে, এ যুগের তুলনায় "বঙ্গদর্শনের" যুগের বঙ্গসরস্বতীকে বন্ধ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নামে এই অপবাদ ছিল যে, বাঙ্গালী রসনা-সর্ব্বস্ব, বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই ত রচনা-

সর্ব্বস্ব। এমন কি এই নব যুগধর্ম্মের শাসনে গত যুগের অনেক পাকা বক্তারা কেঁচে আবার লেখক হয়ে উঠছেন, নইলে যে তাঁদের গাদে পড়ে থাকতে হয়।

এক কথায়, আজকের দিনে বাঙলার সাহিত্য-সমাজ লোকে লোকারণ্য; এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন। বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে বঙ্গ-মহিলারা যে শুধু প্রবেশ লাভ করেছেন তা নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছেন। বসেছেন বলা বোধ হয় ঠিক হ'ল না, কারণ এস্থলে এঁরা বসে নেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলছেন। ইংরাজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে Peaceful penetration, সেই সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্য ধীরে ধীরে এতটা দখল করে নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় যে এ রাজ্য হয়ত ক্রমে নারীরাজ্য হয়ে উঠবে। এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তার প্রমাণ গত মাসের "ভারতবর্ষের" প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। সাহিত্য-সমাজের এই পরদা-পার্টিতে অন্তত চল্লিশ জন ভদ্রমহিলা যোগদান করেছিলেন। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা নেই, সে দেশে স্ত্রীসাহিত্যের এতটা প্রসার ও পশার বৃদ্ধির ভিতর কি একটু রহস্য নেই? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এই নব সাহিত্যের মূলে এমন একটি অজ্ঞাত অবাধ্য এবং অদম্য শক্তি নিহিত রয়েছে, যার স্ফূর্ত্তি কোনরূপ বাহ্য ঘটনার অধীন নয়? বালিকা-বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, উভয় স্থলেই নব-সাহিত্য যে সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছে, এর থেকে বোঝা উচিত যে, আমাদের জাতীয় মন কোনও নৈসর্গিক কারণে সহসা অসম্ভব রকম উর্ব্বর হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে

আশার বীজ বপন করাই সঙ্গত, নিরাশার নয়ন-আসার নয়।

এস্থলে নিজের কৈফিয়ৎ স্বরূপে একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক। কেউ মনে করবেন না যে, আমি লেখিকাদের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করে এসব কথা বলছি। কেননা তাঁদের রচিত সাহিত্যে এক স্বাক্ষর ব্যতীত, স্ত্রীহস্তের অপর কোনও চিহ্ন নেই। ওসব লেখা শ্রী-স্বাক্ষরিত হলে তার থেকে "মতী"-ভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেতেন না। এদেশে স্ত্রীপুরুষের যে কোনও প্রভেদ আছে তা বঙ্গসাহিত্য থেকে ধরবার যো নেই।

এত বেশি লোক যে এত বেশি লেখা লিখছে, তাতে আনন্দিত হবার অপর কারণও আছে। এই অজস্র রচনা এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বাঙালীজাতি এ যুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যদি কেউ এস্থলে একথা বলেন যে, বাঙালীর রচনা যে-পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে, সে-পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না। তার উত্তরে আমি বলব যে, বাঙালীর জাতীয় আত্মা আজও গড়ে' ওঠেনি, এবং সে আত্মা গড়ে' তোলবার পক্ষে সাহিত্য একমাত্র না হলেও, একটি প্রধান উপায়। মানুষের দেহ যেমন দৈহিক ক্রিয়াগুলির চর্চ্চার সাহায্যে গড়ে' ওঠে, মানুষের মনও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে গড়ে' ওঠে। জাতীয় আত্মা আবিষ্কার করবার বস্তু নয়, নির্ম্মাণ করবার বস্তু। আত্মাকে প্রকাশ করবার উদ্যম এবং প্রযত্ন থেকেই আত্মার আবির্ভাব হয়, কেননা সৃষ্টি বহির্মুখী। অবশ্য আমি তাই বলে' এ দাবী করি নে যে, আজকাল যত কথা ছাপায় উঠছে তার সকল কথাই জাতীয় মনের উপর ছাপ রেখে যাবে। "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে

বিস্তর”—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষে তেমনি সত্য। সুতরাং বাঙালীজাতি যে অনেক বাক্য বৃথা ব্যয় করছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে কথা বলবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না, সে কথা বলা হয়েছে বলেই যে তা' টিঁকে যাবে, এমন ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। সাহিত্য-জগৎও যোগ্যতরের উদ্বর্ত্তনের নিয়মের অধীন। কালের নির্ম্মম কবলে পড়ে' যা ক্ষীণজীবী তা অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে বহু লোকে বহু কথা বললে, অনেক সত্য কথা উক্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়; নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্য-সমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা সে মত যদি ভুল হয় তাহলে সাহিত্যের ঘোল কড়াই কাণা হয়ে যায়। এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয় এ-কথা সংস্কৃতেও লেখা আছে। এ যুগের বঙ্গ-সরস্বতী বহুভাষী হলেও যে, বহুরূপী নন এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। তবে আমাদের সাহিত্যের সুর যে একঘেয়ে, তার কারণ আমাদের জীবন বৈচিত্র্যহীন, এবং এই বৈচিত্র্যহীনতার চর্চ্চা আমরা একটা জাতীয় আর্ট করে তুলেছি। উদাহরণ স্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, নানা যন্ত্র এক সুরে বেঁধে তাতে এক সুর বাজালেই ঐক্যতান হয়। আর্ট-জগতে এই অদ্বৈতবাদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গসাহিত্য মুক্তিলাভ করবে না, এবং যতদিন এ দেশে আবার নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব না হবে, ততদিন আমরা এক কথাই একশ-বার বলব, কেননা সে কথা বলার ভিতরেও মন নেই, শোনার ভিতরেও মন নেই। তাই বলে' আমাদের সকল লেখাপড়া একেবারেই অনর্থক নয়। আমরা আর কিছু করি

আর না করি, ভাবী গুণীর জন্য আসর জাগিয়ে রাখছি। পাঠক-সমাজকে ঘুমিয়ে পড়তে না দেওয়াটাও একটা কম কাজ নয়।

আমরা সদলবলে সাহিত্য তৈরি করি আর না করি, সদল-বলে পাঠক তৈরি কচ্ছি।

পূর্ব্বে যা বলা গেল, তা অবশ্য সকলের সমান মনঃপূত হবে না, কিন্তু এ কথা আপনারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা অগণ্য, সে ক্ষেত্রে কোনও লেখক-এরণ্ড সাহিত্য-দ্রুম স্বরূপে গ্রাহ্য হবেন না। এ বড় কম লাভের কথা নয়। হাজার অপ্রিয় হ'লেও একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোন কোন এরণ্ড এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্গ-সাহিত্যের পুরোনো পাণ্ডারা তাঁদের গায়ে সিঁদুর লেপে অপরকে পূজা করতে বলেন। অমুকে কি লিখেছেন কেউ না জানলেও, তিনি যে একজন বড় লেখক তা সকলেই জানেন, এমন প্রথিত-যশ প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বিরল নয়।

এ সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুট্‌কিত্বের যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদের সত্যাসত্য একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ছোট গল্প, খণ্ড-কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। সমালোচকদের মতে এই কৃশতাই হচ্ছে এ সাহিত্যের দুর্ব্বলতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীতে যে, কোনও নূতন মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার কিম্বা শকুন্তলা-তত্ত্ব লেখা হয় নি, এ কথা সত্য। এ যুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোনও কর্ত্তব্য নেই, একথা একালে মানা কঠিন। আর যদি

এ কথা সত্য হয় যে, মারাকাটা ব্যাপার না থাকলে কাব্য মহা-কাব্য হয় না, তাহ'লে বলতে হয় যে, সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, যার দরুণ যুগে যুগে সকলকে শুধু মহাকাব্যই লিখতে হবে। Paradise Lost-এর পরে ইংরাজি ভাষায় আর দ্বিতীয় মহাকাব্য লেখা হয় নি, এবং ফরাসী ভাষায় ও-শ্রেণীর কাব্য কস্মিনকালেও রচিত হয় নি, তাই বলে ফরাসী-সাহিত্য এবং মিল্‌টনের পরবর্ত্তী ইংরাজি সাহিত্যের যে কোনরূপ গৌরব নেই, একথা বলবার দুঃসাহস কোনও পাশ্চাত্য সমা-লোচক তাঁদের রক্তমাংসের শরীরে ধারণ করেন না।

তারপর আমরা যে শকুন্তলার চাইতে দ্বিগুণ বড় শকুন্তলা-তত্ত্ব রচনা করিনে, তার জন্য আমাদের কাছে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার, অতএব সংক্ষিপ্ত। এ বিশ্বটি এত বিরাট যে, তাকে সচরাচর অনন্ত ও অসীম বলা হয়ে থাকে, অথচ তাত্ত্বিকেরা বিশ্বতত্ত্ব দু'চারটি ক্ষীণ সূত্রেই আবদ্ধ করে থাকেন। সুতরাং আমরা কোনও সৃষ্ট পদার্থের বিষয় দুশ'-হাত তত্ত্বজাল বুনতে সাহসী হইনে, অন্তত কোনও কাব-রত্নকে সে জালে জড়াতে চাইনে। কাব্যের আগুনের পরিচয় দেবার জন্য তাকে সমালোচনার ছাই চাপা দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য নয়, কেননা সে গুণের পরিচায়ক হচ্ছে অনুভূতি।

এ যুগের রচনার নাতিদীর্ঘতা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, এ কালের লেখকেরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন। হিন্দু-স্থানীরা বলেন যে, "আক্কেলিকো ইসারা বাস্"। যাঁদের শ্রোতার আক্কেলের উপর কোনও আস্থা নেই, তাঁরাই একটু-খানি কথাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অনেকখানি করে' তুলতে ব্যস্ত।

সমালোচকদের মতে বর্ত্তমানের আর-একটি অপরাধ এই যে, এ যুগে এমন কোনও লেখক জন্মগ্রহণ করেন নি, যাঁর প্রতিভায় দেশ উজ্জ্বল করে রেখেছে। এ আমাদের দুর্ভাগ্য,—দোষ নয়; প্রতিভার জন্মের রহস্য কোনও দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক অদ্যাবধি উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। তবে এটুকু আমরা জানি যে, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য চাই। একথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, নূতন সাহিত্য গড়বার যে সুযোগ গত শতাব্দীর লেখকেরা পেয়েছিলেন, সে সুযোগ আমরা অনেকটা হারিয়েছি।

গত যুগের লেখকেরা সবাই প্রধান না হোন, সবাই স্বাধীন ছিলেন। তৎপূর্ব্ব-যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের চাপের ভিতর থেকে তাঁদের তেড়ে-ফুঁড়ে বেরতে হয়নি। একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই উন-বিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য জন্মলাভ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাক্‌ব্রিটিশযুগের বঙ্গ-সাহিত্যের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না। "অন্নদামঙ্গল"-এর ভাষা ও ছন্দের কোনরূপ খাতির রাখলে মাইকেল "মেঘনাদবধ" রচনা করতেন না, এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীর কোনরূপ খাতির রাখলে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করতেন না। Milton এবং Scott যাঁদের গুরু—তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের ঘেঁসবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু আজকের দিনে ইংরাজি-সাহিত্য আমাদের কাছে এতটা পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে যে, তার থেকে আমরা আর বিশেষ কোনও নূতন উদ্দীপনা কিম্বা উত্তেজনা লাভ করিনে। আমাদের মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ের

চমক ভেঙ্গেছে, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের প্রভাব স্থান পায়নি। সুতরাং আমরা গত-যুগের সাহিত্যেরই জের টেনে আস্‌ছি। আমাদের পক্ষে তাই নতুন কিছু করা একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের সাক্ষাৎ আমরা সেই যুগে পাই, যে যুগে একটা নূতন এবং প্রবল ভাবের প্রবাহ, হয় ভিতর থেকে ওঠে, নয় বাইরে থেকে আসে। গত যুগে যে ভাবের জোয়ার বাইরে থেকে এসেছিল, এ যুগে তার তোড় এত কমে এসেছে যে, ভাটা সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এদিকে ভিতর থেকেও একটা নূতন কোনও ভাবের উৎস খুলে যায়নি। বরং সমাজের মনের টান আজ পুরাতনের দিকে—এও ত ভাবের প্রবাহের ভাটার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাটার মুখে নতুন কিছু করতে হলে, কালের স্রোতের উজান বইতে হয়—তা করা সহজ নয়। এ অবস্থায় যা করা সহজ তা হচ্ছে সনাতন জ্যাঠামি। সুতরাং নব সাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভা-হীন বলায়, সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না। আরও বিপদের কথা এই যে, আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি। কেননা, যদি আমরা গত-শতাব্দীর সাহিত্যের অনুসরণ করি, তাহ'লে সমালোচকদের মতে আমরা নকল-সাহিত্য রচনা করি, আর যদি অনুকরণ না করি, তাহ'লে পূর্ব্বোক্ত মতে আমরা কাব্যের উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হই। অথচ আসল ঘটনা এই যে, নবযুগ কতক অংশে পূর্ব্ব যুগের অধীন, এবং কতক অংশে স্বাধীন। এই কারণে নবীন সাহিত্যিকেরা গতযুগের সাহিত্যের কোন কোন অংশের অনুকরণ করতে অক্ষম, এবং কোন কোন অংশের অনুসরণ করতে বাধ্য। একালে যে মেঘনাদবধ কিম্বা দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে গদ্য এবং পদ্য কাব্য রচিত হয় না,

তার কারণ, বাঙালী জাতির মনের কলে Scott, Milton, Mill ও Comte-এর চাবির দম ফুরিয়ে এসেছে। অপর পক্ষে বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে অতিবিস্তৃত এবং অপ্রতিহত, তা অস্বীকার করবার যো'ও নেই, প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ বলে যে, সে সাহিত্যের কোনও মূল্য কিম্বা মর্য্যাদা নেই, এ কথা বলায় শুধু স্থূলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং নব-সাহিত্যকে নকল-সাহিত্য বলার কি সার্থকতা আছে, তাও একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে, পরের লেখার অনুকরণ কিম্বা অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করা যায় না। এ কথাটা ষোল-আনা সত্য নয়। ও উপায়ে অবশ্য কালিদাস হওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীহর্ষ হওয়া যায়। "রত্নাবলী" মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা, অথচ সংস্কৃত-সাহিত্যের একখানি উপাদেয় নাটক। পৃথিবীর মহাপ্রাণ কবিদের স্পর্শে বহু লেখক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, এবং এই কারণেই তাঁদের অবলম্বন করেই সাহিত্যের নানা school গড়ে' ওঠে। ফরাসী এবং জর্ম্মান সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গেটের আনুগত্য স্বীকার করাতে শিলারের প্রতিভার হ্রাস হয় নি। Victor Hugo-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে Musset অ-কবির দেশে গিয়ে পড়েন নি। এবং Flaubert-এর কাছে শিক্ষানবিশী করার দরুণ Guy de Maupassant-র গল্প সাহিত্য-সমাজে উপেক্ষিত হয় নি। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও এরূপ ঘটনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে আমরা বৈষ্ণব কবিতা বলি, তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুকরণেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু তাই

বলে, জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস লোচনদাস অনন্তদাসের রচনার যে কোন মূল্য নেই, এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, পর সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য গঠিত হয় না, তাহ'লে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় সাহিত্য রচিত হয় নি। কেননা, গত-শতাব্দীর মধ্য-যুগের গল্প এবং উপন্যাস, কাব্য এবং মহাকাব্য, সবই যে সাহিত্যের অনুকরণে রচিত হয়েছিল, সে সাহিত্য আমাদের নিতান্তই পর। তা অপর দেশের, অপর জাতের, অপর ভাষায় লিখিত। এ সত্ত্বেও আমরা গতযুগের এই আহেলা বিলাতী সাহিত্যকে বাঙলা-সাহিত্য বলে আদর করি। তার কারণ এই যে, যে সাহিত্য উপর-সাহিত্য, তা অপরই হোক্ আর আপনই হোক, মানব-মনের উপর তার প্রভাব অনিবার্য্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এবং অনুসরণে যে কাব্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা নকল সাহিত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

এই নব-কবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ সকল রচনা, ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছিন্নতায়, পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সঙ্গীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও, তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনাশক্তি। মনের ভাবকে গড়ে' না তুলতে পারলে তা মুর্ত্তি-ধারণ করে না, আর যার মুর্ত্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল্ ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার

অনুরূপ দেহ দিতে হলে, শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দমিলের কাণ থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেননা সাধনা ব্যতীত কোন আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। নব-কবিরা যে, সে সাধনা করে থাকেন, তার কারণ এ ধারণা তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, লেখা জিনিষটে একটা আর্ট। নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিম্বা নবীনচন্দ্রের "অবকাশ-রঞ্জনী"র তুলনা করলে, নবযুগের কবিতা পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট-অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্য্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে, এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউ-সানের একধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয় ত পূর্ব্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে, ভাবের অভাব থেকেই ভাষার এই সব কারিগরি জন্মলাভ করে। যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য্য আছে, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমূর্ত্তি দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি একরূপ নয়। ভাব যে কাব্যের আত্মা, এবং ভাষা তার দেহ, একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোনও দার্শনিকের জানা নেই। যাঁর রসজ্ঞান আছে তাঁর কাছে এ সব তর্কের কোনও মূল্য নেই। কবিতা-রচনার আর্ট নবীন কবিদের অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে তাঁদের লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই। ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "আছিল বিস্তর

ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।”
স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার যদি ঠাট্ বাদ দেওয়া যায়, তাহ’লে
যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে তাতে ফোঁটা দেওয়াও চলে না, কেননা
সে গুঁড়া চন্দনের নয়। অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়ে
আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। নবীন কবিদের যে
ভাবসম্পদ নেই, একথা বলায় আমার বিশ্বাস, কেবলমাত্র
অন্যমনস্কতার পরিচয় দেওয়া হয়। মহাকবি ভাস বলেছেন যে
পৃথিবীতে ভাল কাজ করবার লোক সুলভ, চেনবার লোকই
দুর্ল্লভ।

মহাকাব্যের দিন যে চলে গেছে, তার প্রমাণ বর্ত্তমান
ইউরোপেও পাওয়া যায়। সে দেশে কবিতা আজও লেখা হয়ে
থাকে, কিন্তু হাতে-বহরে সে সবই ছোট। ফরাসী দেশের
বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে জীদ্ বলেন যে, গীতাঞ্জলি মুষ্টিমেয় না
হ’লে বর্ত্তমান ইউরোপ তা করযোড়ে গ্রহণ করত না। তাঁর
ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারতের চাইতে ছোট
কিছু লেখা হয়নি এবং হতে পারে না। এ কথা অবশ্য সত্য
নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন একদিকে রামায়ণ মহাভারত
আছে, অপরদিকে তেমনি দু-লাইন চার লাইন কবিতারও
ছড়াছড়ি। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যা ছিল না, সে হচ্ছে এ দুয়ের
মাঝামাঝি কোনও পদার্থ। একালে আমরা যে ব্যাস বাল্মীকির
অনুকরণ না করে, অমরু, ভর্ত্তৃহরির অনুসরণ করি, সে যুগধর্ম্মের
প্রভাবে। যে কারণে ইউরোপে আর মহাকাব্য লেখা হয় না,
সেই একই কারণে এ দেশেও মহাকাব্য লেখা স্থগিত রয়েছে।
এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং সে উক্তি
একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হতে পারে না। কিন্তু একালে

গল্প আমরা গদ্যে বলি, কেননা আমরা আবিষ্কার করেছি যে দুনিয়ার কথা দুনিয়ার লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য গদ্যের পথই প্রশস্ত। সুতরাং গল্পের উত্তরোত্তর দেহ সঙ্কুচিত হওয়াটা ক্রমোন্নতির লক্ষণ নয়। ইউরোপে আজও গদ্যে এমন এমন লেখা হয়ে থাকে, যা আকারে মহাভারতের সমান না হ'লেও, রামায়ণের তুল্যমূল্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নভেলিষ্ট Tolstoy-র এক একখানি নভেল এক একখানি মহাকাব্য বিশেষ। ও-দেশের গদ্য-সাহিত্যে যেমন একদিকে ব্যাস বাল্মীকি আছে, অপর দিকে তেমনি অমরু ভর্ত্তৃহরিরও অভাব নেই। যে ক্ষেত্রে হাজার হাজার পাতার দুচারটি গল্প জন্মলাভ করছে, সেই ক্ষেত্রেই আবার দু পাতা চার পাতার হাজার হাজার গল্প জন্মলাভ করছে—এতেই পরিচয় দেয় যে, ইউরোপের মনের ক্ষেত্র কত সরস, কত সতেজ, কত উর্ব্বর। সুতরাং আমাদের নব গদ্য-সাহিত্যে যে ছোট গল্প ছাড়া আর কিছু গজায় না, তাতে অবশ্য এ সাহিত্যের দৈন্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দীনতা ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় যতটা ধরা পড়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনায় ততটা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, গত যুগের গল্প-সাহিত্যে তারক গাঙ্গুলির "স্বর্ণলতা" ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ যুগের গল্প-লেখকেরা যে সাধারণতঃ ছোট গল্প রচনার পক্ষপাতী তার কারণ এই যে, আমাদের জীবন ও মন এতই বৈচিত্র্যহীন, এবং সে মনে ও সে জীবনে ঘটনা এত অল্পই ঘটে, এবং যা ঘটে তাও এতটা বিশেষত্বহীন যে, তার থেকে কোনও বিরাটকাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে Anna

Karenina কিম্বা Les Miserables গড়তে বসায় বাচালতার পরিচয় দেওয়া হয়—প্রতিভার নয়।

এ সমাজে যা পাওয়া যায়, এবং সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোট গল্পের খোরাক। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি যতই হোক না কেন, তারই মধ্যে হাসি-কান্নার অভিনয় নিত্য চলছে, কেননা আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করেও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোনও শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পরি নি। ভয়, আশা, উদ্যম নৈরাশ্য, ভক্তি ঘৃণা, মমতা নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা দ্বেষহিংসা, বীরত্ব কাপুরুষতা, এক-কথায় যা নিয়ে এই মানবজীবন—তা miniature-য়ে এ সমাজে সবই মেলে। সুতরাং যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের গল্প-সাহিত্যের এই নূতন পথটি খুলে দিলেন, তখন আমরা দলে দলে সোৎসাহে সেই পথে এসে পড়লুম। এ অবশ্য আপশোষের কথা নয়। এবং এর জন্যও দুঃখ করবার দরকার নেই যে, এ পথে এখন এমন বহুলোক দেখা যায়, যাদের কাজ হচ্ছে শুধু সে পথের ভিড় বাড়ানো। কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে, কোনও মহাজন-কর্ত্তৃক একটি নূতন পন্থা অবলম্বিত হলে, সেখানে চিরদিনই এমনি জনসমাগম হয়ে থাকে, তার মধ্যে দুচারজন শুধু এগিয়ে যান। এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, সে পথ বিপথ,—কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, বেশির ভাগ লোক দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। Many are called but few are chosen—বাইবেলের এ কথা হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এ যুগে কোন অসাধারণ প্রতিভা-শালী উপন্যাসকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হয়ে থাকে যা গত-শতাব্দীর কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হতে বেরত না। সুতরাং নব-সাহিত্যে যদি chosen

few থাকেন, তাহ'লে আমাদের ভগ্নোদ্যম হবার কারণ নেই।

কার্ত্তিক, ১৩২২ সন।

——

অলঙ্কারের সূত্রপাত।

—:০:—

যে দেশে কাব্য আছে সে দেশে অলঙ্কারও আছে এবং থাকা উচিত। গ্রীসে আরিষ্টটেল ছিলেন এবং এদেশে ভামহ থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত, পর পর যত আলঙ্কারিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলে একখানি ছোটখাট ক্যাটালগ তৈরি হয়।

অলঙ্কার যে কেবল প্রাচীন সাহিত্যেই ছিল তা নয়, নব-সাহিত্যেও আছে। এ দু'য়ের ভিতর যা প্রভেদ—সে নামের এবং রূপের। একালে আমরা যাঁদের Critic বলি, সেকালে তাঁদের আলঙ্কারিক বলত। অনেকের বিশ্বাস যে, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কারবার শুধু উপমা, অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক নিয়েই। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কাব্যের দোষগুণ-বিচারই সে শাস্ত্রেরও মুখ্য উদ্দেশ্য। Criticism-এর উদ্দেশ্যও তাই। তবে বর্ত্তমান ইউরোপে যে Criticism-এর একটা শাস্ত্র গড়ে তোলা হয় নি, তার কারণ সে দেশের Critic-রা ক্রমান্বয়ে এই সত্যের পরিচয় পেয়েছেন যে, সে দেশের কবিরা সমালোচকদের রাজশাসন মানেন না। সেখানে কাব্য যুগে যুগে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে; সুতরাং এক যুগের অলঙ্কার-শাস্ত্র আর-এক যুগে অর্থশূন্য এবং উপহাসাস্পদ হয়ে পড়ে। ভারত-বর্ষে প্রাচীনকালে Critic-রা তাঁদের মতামত Codify করতে যে তিলমাত্রও দ্বিধা করতেন না, তার কারণ আমাদের পূর্ব্ব-

পুরুষেরা সকল বিষয়েই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি কালিদাসের ন্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী কবিও অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। দর্শনের সঙ্গে তার টীকাভাষ্যের যে সম্বন্ধ, কাব্যের সঙ্গে অলঙ্কারের সেই একই সম্বন্ধ;—উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্চে মূল সূত্রের এবং মূল কাব্যের ব্যাখ্যা করা, বিচার করা। এবং দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্যকাররাই যেমন কালক্রমে তার গুরু হয়ে উঠেন, তেমনি কাব্যশাস্ত্রের ভাষ্যকাররাই কালক্রমে তার গুরু হয়ে উঠেন এবং কবি-সমাজ সেই গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়। মহাপ্রভু চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে বলেছিলেন যে, তিনি বেদান্ত মানেন, কিন্তু আচার্য্যকে মানেন না, অর্থাৎ উপনিষদ মানেন কিন্তু তার শাঙ্করভাষ্য মানেন না। ভগবানের অবতার ব্যতীত এত বড় কথা বলবার সাহস এদেশে সেকালে কোনও রক্তমাংসের দেহধারী মানবের ছিল না এবং কবিরা আর যাই হোননা কেন, অবতার বলে লোক-সমাজে কখনই গ্রাহ্য হন নি। সুতরাং তাঁরা বিনা আপত্তিতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হতেন।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের মনোভাব ভারতবর্ষের ঠিক উল্টো—ইংরাজি সাহিত্যিকেরা কস্মিন্‌কালেও কোনরূপ অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধীনতা স্বীকার করেন নি। জীবনে ও মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হচ্ছে ইংরাজি সভ্যতার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কিন্তু ফরাসীদের মনোভাব এ দু'য়ের মাঝামাঝি। তাঁদের বিশ্বাস যে, রচনা কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীন না হ'লে তা আর্ট হয় না এবং রচনাকে আর্ট করে তোলাই ফরাসী-লেখকদের জীবনের ব্রত। সাহিত্যের ভাষা এবং রীতি (style) সম্বন্ধে

সাহিত্যে তাঁরা একটা স্পষ্ট আদর্শ উচ্চে ধরে রাখতে চান। এই জন্যই ফরাসীবিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায় পুরাকালের সমাজ-শাসনের সকল ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেও French Academy আজও টিঁকে আছে। ফরাসী সাহিত্যের এই প্রিভি-কাউন্সিলে সমগ্র সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচার আজও হয়ে থাকে। এই পণ্ডিতমণ্ডলী প্রধানত রচনার রীতির বিচার করেন, নীতির নয়; সাহিত্যের এই ব্যবস্থাপক সভা অদ্যাবধি সাহিত্যের সুরীতি সযত্নে রক্ষা করে আসছেন;—এর ফলে, ফরাসী গদ্য যে আদর্শ গদ্য এ কথা সমগ্র ইউরোপে সর্ব্ববাদী-সম্মত। অপর পক্ষে ইংলণ্ডে, লেখা সম্বন্ধে অবাধ স্বাধীনতার ফলাফল ইংরাজি সাহিত্যে স্পষ্ট দেখা যায়। একদিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকদের হাতে ইংরাজি রচনা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, শ্রী ও শক্তি লাভ করে, অপর দিকে সাধারণ লেখক-দের হাতে সে রচনা তেমনি অসংযত শিথিল, দীর্ঘসূত্র ও গুরু-ভার হয়ে পড়ে। ইংরাজি ভাষায় সচরাচর যে ভাবে গদ্য লেখা হয় তার ভিতর বিশেষ কোন নৈপুণ্য কিম্বা গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ফরাসী গদ্যের তুলনায় প্রচলিত ইংরাজি গদ্য নিতান্ত কাঁচা। ইংলণ্ডের প্রতি বড় লেখকের রচনা-রীতি স্বতন্ত্র এবং অসামান্য। ও-দেশের গদ্য সাহিত্যে ইংরাজি-রীতি বলে' কোনও-একটি সামান্য রীতি নেই। এই আর্টহীন, অযত্নপ্রসূত সাহিত্যের প্রভাবেই বাঙলা-গদ্য এতটা ঢিলে এবং এলোমেলো হয়ে পড়েছে। এটি নিতান্তই দুঃখের বিষয়। কেননা ইংরাজি-সাহিত্যের রচনা সুশৃঙ্খল না হ'লেও ভাবের স্বাতন্ত্র্যে ও চিন্তার স্বাধীনতায় সে সাহিত্য যথেষ্ট সবল এবং সচল। ইংরাজেরা বলেন যে, তাঁরা পৃথিবীর সকল

ক্ষেত্রে bungle through করে অবশেষে জয়লাভ করেন। ইংরাজি গদ্যের বাহ্যিক অনুকরণে আমরা যা লিখি তা অকারণে বিশৃঙ্খল; কেননা আমাদের প্রাণের ভিতর এমন কোনও উদ্দাম শক্তি নেই যা আত্মপ্রকাশের জন্য আর্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য। তারপর আমাদের মনের উপর ইংরাজি-সাহিত্যের একাধিপত্য যদি না থাকত তাহ'লে আমরা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রকে একেবারেই উপেক্ষা করতুম না। এবং সে শাস্ত্রকে মান্য করতে শিখলে, আমরা সকল আলঙ্কারিকের মতে রচনার যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—বৈদর্ভীরীতি, বাঙলা লেখায় নিশ্চয়ই সেইটির চর্চ্চা করতুম। এ রীতির প্রধান গুণ—প্রসাদ-গুণ। এ রীতির রচনা—সহজ, সরল, পরিষ্কার, ও পরিচ্ছিন্ন। ভাষাকে হীরকের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, সারালো এবং ধারালো করে তোলাই এ রীতির উদ্দেশ্য। সুতরাং এ রীতিতে সব রকম বাহুল্য ও আতিশয্য—এক কথায় ভাষার ও ভাবের বাড়াবাড়ি সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ফরাসী গদ্য-বন্ধ এই বৈদর্ভী-রীতি অবলম্বন করেই পৃথিবীর আদর্শ গদ্য হয়ে উঠেছে। এবং যে কারণে ফরাসীজাতি এ রীতির পক্ষপাতী, সে কারণ আমাদের মধ্যেও বিদ্যমান। ফ্রান্সের কবি, আলঙ্কারিক, দার্শনিক প্রা সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যেহেতু ফরাসী-জাতি রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী—সে কারণ যে গুণে ল্যাটিন-সাহিত্যের বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব—সে গুণের চর্চ্চা করা ফরাসী লেখকদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ ফরাসী সাহিত্য তার স্বধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরাজ্য হারাবে। এ রাজ্য আলোর রাজ্য—ধোঁয়ার রাজ্য নয়। ফরাসীরা জাতীয় মনকে ইতালীর সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত করতে চায়,—জর্ম্মাণীর কুয়াশায়

আবৃত করতে চায় না। সাহিত্য-জগতের এই সূর্য্য-উপাসকদের নিকট কাব্যের প্রকাশ-গুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে গ্রাহ্য হয়েছে। আমরাও নিজেদের সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে' গর্ব্ব করি, যে সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে গায়ত্রী। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহ'লে প্রসাদগুণই বঙ্গ সাহিত্যের প্রধান গুণ হওয়া কর্ত্তব্য। তবে যে আমাদের মন সাহিত্যে দীপ-শিখার মত জ্বলে ওঠে না, কিন্তু নেবানো বাতির মত শুধু ধুঁয়ায়, তার একটি কারণ এই যে, আমরা বাহুল্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী। শিখার দেহ একটুখানি; ধোঁয়ার অনেকখানি; আর তা ছাড়া শিখা নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং স্পষ্ট রূপ বজায় রেখেই চারিদিকে আলো ছড়ায়—অপর পক্ষে ধোঁয়ো যত বেশি এলিয়ে যায় এবং যত বেশি আকারহীন ও অস্পষ্ট হয়ে যায় ততই তা চারিয়ে যায়।

আলো ধরে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, কেননা আলো পদার্থ নয়,—ও শুধু বিশ্বের হৃদয়ের কাঁপুনি। অপর পক্ষে ধোঁয়া যে শুধু পাওয়া যায় তাই নয়, ও বস্তু গলাধঃকরণও করা যায়।

বৈদর্ভীরীতি সাহিত্যের সাধন-রীতি-স্বরূপে গ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে যে তেমন স্বাভাবিক নয়, তার একটি বিশেষ কারণ আছে। ল্যাটিন-সাহিত্য একটিমাত্র নগরীর—রোমের সাহিত্য; সুতরাং সে সাহিত্যে একটিমাত্র রীতিই প্রাধান্যলাভ করেছিল। পৃথিবীর সকল পথ রোমে গেলেও, রোমানরা সভ্যতার একটিমাত্র পথ ধরেই চলেছিলেন, এবং ফরাসীজাতি আজ পর্য্যন্ত মনোজগতে সেই এক পথেরই পথিক। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সাহিত্য নানা যুগে, এই বিশাল ভারতবর্ষের নানা দেশে নানা আকারে, নানা

ভঙ্গীতে দেখা দিয়েছে। এক ভাষা ব্যতীত এ সাহিত্যের অপর কোনই ঐক্য নেই। বৈদিক সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও সংস্কৃত-সাহিত্য প্রথমত প্রাচীন এবং নব্য এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত। কাব্য বল, অলঙ্কার বল, দর্শন বল, সব এই দুই শ্রেণীভুক্ত। তা ছাড়া দেশভেদে, রচনারীতিরও বহুতর প্রভেদ ছিল। এই নানা রীতির মধ্যে অন্তত এমন দু'টি রীতি ছিল, যার একটি আর-একটির সম্পূর্ণ বিপরীত। দণ্ডী বলেছেন যে, যে-সকল গুণের সদ্ভাবে বৈদর্ভীরীতির সৃষ্টি হয়, সেই সকল গুণের বিপর্য্যয়েই গৌড়ীরীতির জন্ম। শুধু দণ্ডী নয়, বামনাচার্য্য প্রভৃতি সকল প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এ বিষয়ে একমত। শব্দাড়ম্বর, অনুপ্রাসের ঘনঘটা, সমাস-বাহুল্য, অপ্রসিদ্ধার্থক শব্দের প্রয়োগ, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি এই সবই হচ্ছে গৌড়ীরীতির সম্বল ও সম্পদ। এ গৌড় কোন্ গৌড় তা কারও জানা নেই, কেননা সেকালে ভারতবর্ষে পঞ্চ-গৌড় ছিল। তবু এই নামের গুণেই বাঙালী আজ গৌড়ী-রীতিকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু কৃতকার্য্য হ'তে পারছে না। এক "মেঘনাদবধ"-কার ব্যতীত অদ্যাবধি আর কেউ এ রীতিতে কৃতিত্ব লাভ করতে পারেন নি। আমরা গদ্য রচনায় যে রীতি অবলম্বন করেছি, সে হচ্ছে ইঙ্গ-গৌড়ীরীতি—কেননা ইংরাজি-গদ্যের অনুকরণ এবং অনুবাদ থেকেই বাঙলা-গদ্যের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে লেখার একটা নূতন পথ ধরবার ইচ্ছে হওয়াটা কারও কারও পক্ষে স্বাভাবিক। প্রচলিত পদ্ধতি ত্যাগ করে' নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করবার মুখে মহাতর্ক উপস্থিত হয়। আজকে বাঙলা-সাহিত্যে সেই তর্ক উঠেছে অর্থাৎ অলঙ্কারের সূত্রপাত হ'য়েছে।

(২)

"অথাতো বাক্যজিজ্ঞাসা"—এই হচ্ছে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথম সূত্র। যদিচ সে শাস্ত্রে কোথাও এ প্রশ্ন সূত্রের আকার ধারণ করে নি, তবুও কি ভাষায় কাব্য রচনা করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সকল আচার্য্যই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, কেননা রীতির সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

কোন্ ভাষায় বঙ্গ-সাহিত্য রচনা করা কর্ত্তব্য, এ প্রশ্ন আমাদের পক্ষে বিশেষ করে' জিজ্ঞাস্য, কেননা বাঙলায় মুখের ভাষা এক, বইয়ের ভাষা আর। এর উত্তরে একদল বলেন যে, যে ভাষা আমরা বই পড়ে শিখি, সেই ভাষাতেই বই লেখা কর্ত্তব্য।

ভারতচন্দ্রের মত এর ঠিক উল্টো। তিনি বলেন—

"পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় শিল্পীর এই মত আমি শিরোধার্য্য করি—কাব্য যে "রস লয়ে" এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না, তবে "রস" যে কি বস্তু সে বিষয়ে অবশ্য ভীষণ মতভেদ আছে। এস্থলে আমি রসতত্ত্বের বিচার করতে চাই নে, কেননা প্রায়ই দেখতে পাই যে, লোকে রসশাস্ত্রের আলোচনায় রসজ্ঞানের পরিচয় দেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, "পড়িয়াছি যেই মত" সেই মত "বর্ণিবার" চেষ্টা করলে রচনা প্রসাদগুণে বঞ্চিত হয়। অতএব "যাবনী মিশাল" মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা করা উচিত, এক-কথায় বৈদর্ভীরীতি অবলম্বন করাই বঙ্গ-সরস্বতীর পক্ষে শ্রেয়।

বামনাচার্য্য বলেছেন—বৈদর্ভীরীতি "সমগ্রগুণা" অর্থাৎ কাব্যের সকল গুণ এক প্রসাদগুণেরই অন্তর্ভূত। এই প্রসাদ-গুণ লাভ করতে হ'লে যে, মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক, এ কথা স্পষ্ট করে' বুঝিয়ে দিতে হ'লে, আলঙ্কারিকেরা অপরাপর যে সকল গুণের বিচার করেছেন সে সকলের উল্লেখ করা দরকার। দণ্ডীর মতে, অর্থব্যক্তি (Clarity), সমতা (Unity), কান্তি (Restraint), মাধুর্য্য (Beauty), ঔদার্য্য (Refinement), এই সকল গুণই হচ্ছে বৈদর্ভীরীতির প্রাণ। ফরাসী আলঙ্কারিকেরাও এই ক'টিই রচনার প্রধান গুণ বলে গ্রাহ্য করেন।

বলা বাহুল্য যে, যে ভাষা আমরা সব চাইতে ভাল জানি এবং যে ভাষার উপর আমাদের দখল সব চাইতে বেশি, সেই ভাষায় লিখলেই রচনায় এ সকল গুণ থাকবার সম্ভাবনা বেশি। শুধু তাই নয়—কোনও কৃত্রিম ভাষায় লিখতে গেলে, আলঙ্কা-রিকদের মতে যা দোষ বলে' গণ্য, রচনাকে সে দোষমুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। ঈষৎ অন্যমনস্ক হ'লেই সে সব দোষ রচনায় আপনি এসে পড়বে।

আমি এখানে দু'টি চারটি দোষের উল্লেখ করছি। প্রথম "অপার্থ" অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ নয় সেই অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা। তারপর "একার্থ" অর্থাৎ একই অর্থের শব্দ

একের চাইতে বেশি বার ব্যবহার করা ;—একে পুনরুক্তি দোষও বলা যেতে পারে। তার পর "সংশয়" অর্থাৎ যেখানে কোন বস্তু নিশ্চয় করে' বলবার অভিপ্রায় আছে সেখানে যদি শব্দ-প্রয়োগের দোষে সংশয় উৎপন্ন করা হয় তাহ'লে বাক্য সংশয়দোষে দুষ্ট হয়। তারপর "শব্দহীনতা" অর্থাৎ অভিধান ব্যাকরণাদির প্রতি লক্ষ্য না করে, শব্দের যদি অঙ্গ বিকৃত করে দেওয়া যায়, তাহ'লে সে শব্দ অশিষ্ট হয়ে পড়ে। বাঙালীর মুখে মুখে যে-সংস্কৃত শব্দের প্রচলন নেই, সেরূপ শব্দ ব্যবহার করতে গেলে আমাদের রচনায় শব্দহীনতা দোষ অতি সহজেই এসে পড়ে। পদে পদে যদি অভিধান এবং ব্যাকরণের পাতা উল্টোতে হয় তাহ'লে লেখককে যে কতদূর বিপন্ন হয়ে পড়তে হয়, তা সহজেই বুঝতে পারেন। যে কথা আমরা যে ভাবে মুখে বলি সে কথা ঠিক সেই ভাবে লিখলে এ বিপদ আমরা এড়িয়ে যেতে পারি, কেননা—আমরা যা বলি প্রাকৃত ব্যকরণ অনুসারে তাই শুদ্ধ। ইঙ্গ-গৌড়ীরীতির রচনাতে এ সকল দোষ পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। অপরের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের এ রীতির রচনা এ সকল দোষমুক্ত নয়। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি তাঁর প্রথম বয়েসের কাব্য সকল ইঙ্গ-গৌড়ীরীতিতে এবং সীতারাম প্রভৃতি তাঁর শেষ কাব্য-সকল বৈদর্ভীরীতিতে রচিত। দুর্গেশনন্দিনীর গদ্য বিভক্তিহীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আর সীতারামের গদ্য মাতৃভাষায় লিখিত। এ দু'য়ের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টই দেখানো যায়।

নিম্নে তাঁর রচনার দু'টি নমুনা উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি। এ দু'টির ভিতর বিষয়ের ঐক্য আছে সুতরাং ভাষার পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্ভ-বয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতি প্রশস্তও নহে, নিশীথকৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্ত ভাবপ্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড় বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড় বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার, আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত; তাহাতে 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিত' কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।"

(দুর্গেশনন্দিনী)

বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থলে প্রশ্ন করেছেন—"তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন?" উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিলোত্তমা বই পড়বার চেষ্টা করছিলেন—প্রথমে কাদম্বরী, তারপর সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তা, তারপর গীতগোবিন্দ। তিলোত্তমা এ সব কাব্য পড়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবত পড়েন নি, কেননা সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তা এবং গীতগোবিন্দ কুমারীপাঠ্য পুস্তক নয়, কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীর লেখক যে পড়েছিলেন তার পরিচয় দুর্গেশনন্দিনীর রূপ-বর্ণনাতেই পাওয়া যায়।

"তা, সেদিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন

দেখাইল? তাহ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলের গোছা! কি কলান রঙ! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদুর্লভ। গঙ্গারাম ভাবিল, 'মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জানিতেম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব'।"

(সীতারাম)

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁচাহাতের লেখার সঙ্গে তাঁর পাকাহাতের লেখার সঙ্গে তুলনা করলেই দেখা যায় যে—বঙ্কিমচন্দ্রের নজির আমাদের মতই সমর্থন করে। অর্থাৎ "সীতারামের" ভাষাই আমাদের যথার্থ আদর্শ, দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা নয়। কেননা, আমরা যদি সাহিত্যে মৌখিক ভাষা গ্রাহ্য করি, তাহ'লে আমাদের রচনা, সগুণ না হোক্, নির্দ্দোষ হ'বে। যে পথে বঙ্কিমচন্দ্রের পদস্খলন হয়েছে, সে পথে বুক ফুলিয়ে চলতে গেলে আমাদের চিৎ-পতন অনিবার্য্য। সুতরাং দুর্গেশনন্দিনীর রূপবর্ণনায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন কোন নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে, তা একটু খুলে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে "তাঁহার দেহায়তন প্রগলভবয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।" "প্রগলভ" শব্দের অর্থ দাম্ভিক, নির্লজ্জ ইত্যাদি; অতএব "প্রগলভ-বয়সী" এই যুক্ত পদের কোন অর্থ হয় না। এখানে অপার্থ দোষ ঘটেছে। "প্রগলভ" শব্দের উক্ত প্রয়োগে—"অভিধানকোষতঃ পদার্থ নিশ্চয়" এই সূত্র উপেক্ষা করা হয়েছে। তারপর "বয়সী" এই শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। বাঙলায় "সমবয়সী" হয়

কিন্তু সংস্কৃতে কোনও বয়সীই হয় না,—হ্রস্বও না, দীর্ঘও না। এস্থলে "শব্দহানি" দোষ ঘটেছে।

• তারপর দেখতে পাই যে তিলোত্তমার—

"দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল।"

"মুখাবয়ব" বলায় "অবয়ব" শব্দের প্রয়োগ শিষ্ট হয় নি। অবয়ব শব্দের অর্থ হস্তপদাদি অঙ্গ। ইরাজিতে যাকে বলে Limbs, যদি কেউ বলে যে, এস্থলে অবয়ব Features অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, তার উত্তরে আলঙ্কারিকেরা বলবেন যে, Features অর্থে Limbs ব্যবহার করায় যে দোষ হয় "আকৃতি" অর্থে "অবয়ব" ব্যবহার করায় ঠিক সেই একই দোষ হয়। যদি "অবয়বকে" অংশ অর্থে ধরা যায় তাহ'লেও রক্ষে নেই—নেই—কেননা সংস্কৃত ভাষায় "অবয়ব" হচ্ছে তাই, যা "সমুদয়" নয়। এস্থলে "সমুদয়" অর্থে অবয়ব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং "বিরুদ্ধার্থ" দোষ ঘটেছে।

তার পর তিলোত্তমার—

"ললাট...নিশিথকৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায়।"

নদীর ন্যায় তরল পদার্থের সঙ্গে কপালের মত নিরেট পদার্থের তুলনা করা আলঙ্কারিক মতে সঙ্গত নয়। বিশেষত যখন নদীর গায়ে জ্যোৎস্না পড়লে তার চঞ্চল হয়ে ওঠবারই কথা। চন্দ্রের করস্পর্শে সাগর ত একেবারে আন্দোলিত, উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আমরা অবশ্য এ নিয়ম মানিনে, কেননা ইরাজি-সাহিত্যে ও-সবই চলে। তবে "কৌমুদী"র পূর্ব্বে "নিশীথ" জুড়ে দেবার কি আবশ্যক ছিল? নিশীথের কৌমুদী হয় না,—হয় চন্দ্রের। আর নিশীথে যে "কৌমুদী' হয় অর্থাৎ দিনে জ্যোৎস্না ফোটে না, তা আমরা সবাই জানি।

অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে “নতদ্বাহুল্যম্ একত্র”। তার কারণ “শক্যতেহবস্তুবাচকস্থ বাচকবস্তাবকর্ত্তুম, ন বহুনামিতি”॥ (কাব্যালঙ্কার সূত্রানি) অর্থাৎ এক কথায় যেখানে পুরো মানে পাওয়া যায় সেখানে অনেক কথা ব্যবহার করা অনুচিত। এ-স্থলে “বাহুল্য” দোষ ঘটেছে।

তারপরে পাই—

“অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে কপোলে গণ্ডে অংসে উরসে আসিয়া পড়িয়াছে।”

নিবিড়বর্ণ বলাতে বর্ণের শুধু গাঢ়তার পরিচয় দেওয়া হয় কিন্তু বর্ণটি যে কি তা বলা হল না। এ গাঢ় বর্ণ লাল কি নীল, কালো কি সোনালি পাঠকের মনে এ সন্দেহের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অথচ লেখকের নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল পাঠককে এই কথা জানানো যে, সে রং কালো। সুতরাং এস্থলে “সংশয়” দোষ ঘটেছে।

“কুঞ্চিতালক কেশসকল” একেবারেই অগ্রাহ্য। অলক শব্দের অর্থ কুঞ্চিত কেশ। “কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ কেশ” এরূপ পদযোজনা কোন ভাষাতেই চলে না। বাঙলায় অবশ্য চুল কোঁকড়া কোঁকড়া হয় কিন্তু সংস্কৃতে কেশ কুঞ্চিত কুঞ্চিত হয় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রে এরূপ প্রয়োগ নিষেধ। বামনাচার্য্য বলেন যে “নৈক পদং দ্বি প্রযোজ্যং প্রায়েন”—উদাহরণস্বরূপে তিনি দেখিয়েছেন যে—“পয়োদ পয়োদ” অচল। দ্বিত্ব হচ্ছে বাঙলা ভাষার প্রাণ, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দেহভার। অশিষ্ট পদের স্পর্শে সংস্কৃত ভাষার গা জ্বর জ্বর করে না; তার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এস্থলে “একার্থ” “বাহুল্য” প্রভৃতি নানা দোষ ঘটেছে।

তারপর সেই "কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ কেশ সকল" এসে পড়েছে কোথায়? না "কপোলে গণ্ডে"। কপোল এবং গণ্ড অবশ্য মুখের পৃথক পৃথক "অবয়ব" নয়। যার নাম কপোল, তারই নাম গণ্ড। "একার্থ" দোষের এমন স্পষ্ট উদাহরণ বঙ্গ-সাহিত্যেও খুঁজে মেলা ভার।

তার পর ভ্রূর পরিচয় নেওয়া যাক্। তিলোত্তমার—

"ললাটতলে ভ্রযুগ সুবঙ্কিম নিবিড়বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার"—

এখানে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত নিবিড়বর্ণ, চুল থেকে ভুরুতে এসে পড়েছে। কিন্তু রংটি যে কি তা জানা গেল না। তার পর "কিঞ্চিৎ অধিক" এ দু'টি শব্দের বাকি শব্দের সঙ্গে অন্বয় হয় না;—কার চাইতে অধিক তা বলা হয় নি। "ভুরু-দু'টি যেন তুলি দিয়ে আঁকা" "কিছু বেশি সরু" উপরোক্ত বাক্য হচ্চে এই বাঙলা বাক্যের কথায়-কথায় সংস্কৃত অনুবাদ। "কিছু বেশি'র ভিতর Comparison-এর ভাব নাই। ইংরাজির "a little too thin" যেমন Positive—"কিছু বেশি"ও Positive. কিন্তু সংস্কৃতে "কিঞ্চিৎ অধিক" অপর বস্তুর অপেক্ষা রাখে।

তারপর তিলোত্তমার চোখ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"তাহাতে......কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।"

কোন্ ভাষায় কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে এইরূপ হ'তে পারে?

সুতরাং রচনার যে রীতি বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষান্তে বর্জ্জন করে-ছিলেন সে রীতি আমাদের গ্রাহ্য হতে পারে না।

এক কথায়, বাঙলা-গদ্যকে যদি সাহিত্যের নব নব রাজ্য অধিকার করতে হয়, তাহ'লে তাকে তার ধার-করা বুনিয়াদি চাল ছাড়তে হবে।

(৩)

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রীতি-বিচার ছাড়া ঔচিত্যবিচারেরও চর্চ্চা করতেন; তাঁরা কি লেখা উচিত এবং কি অনুচিত সে বিষয়ের অনেকে বিচার করে গেছেন।

বর্ত্তমানে এ দেশের সাহিত্যেও একদল ঔচিত্যবিচারক দেখা দিয়েছেন। এঁরা বলেন যে, বাঙলায় শুধু জাতীয় সাহিত্য এবং বস্তুতান্ত্রিক কাব্য রচনা করা উচিত। এঁরা আমাদের কি বিষয় লিখতে হবে এবং সে বিষয়ে কি কি কথা বলতে হবে তাও সুনির্দ্দিষ্ট করে' দিতে চান। এক কথায় এঁরা ফরমায়েস দিয়ে কাব্য তৈরি করে নিতে চান।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এরূপ অনধিকার চর্চ্চা কখনও করেন নি। তাঁরা কেবলমাত্র আর্ট হিসেবে কবির বক্তব্য কথার ঔচিত্য-বিচার করেছেন। কাব্যে অশ্লীলতা যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় এ কথা আমরাও বলি, তাঁরাও বলতেন কিন্তু এক অর্থে নয়। শ্লীলতার বিচার আমরা নীতির দিক থেকে করি, তাঁরা করতেন রুচির দিক থেকে। ফলে, সেকালে কাব্যের শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা তার বাক্যের উপর নির্ভর করত। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে অশ্লীলতার যে সকল উদাহরণ দিয়েছেন তা আমাদের কাছেও অশ্লীল এবং শ্লীলতার যা উদাহরণ দিয়েছেন তাও আমাদের কাছে সমান অশ্লীল। যে বর্ণনা থাকবার দরুণ "বিদ্যাসুন্দর" বঙ্গ-সাহিত্যে পতিত হয়েছে, সেই সব বর্ণনা থাকা

সত্ত্বেও কুমারসম্ভবের উত্তরভাগ সংস্কৃত-সাহিত্যে অতি উচ্চ আসন লাভ করেছে। আমাদের রুচিবিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে কাব্যের অর্থ—তাঁদের ছিল বাক্য। আমি অবশ্য এ কালের মনকে সে কালে ফিরে যেতে বলিনে, কেননা সে ফেরা, সভ্যতা হতে অসভ্যতায় ফেরা হবে। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত সম্পূর্ণ ভুল নয়। সভ্যতা জিনিষটে অনেকটা ভাষার কথা। আমাদের সুরুচি আজও যে ভাষাগত, তার প্রমাণ শিক্ষিত লোকে আজও "গীত-গোবিন্দ" পড়ে' মুগ্ধ হন; ও-কাব্য সাদা-বাঙলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় কি?

আলঙ্কারিকদের ঔচিত্য-জ্ঞানের বিষয় যে কি, তার স্পষ্ট পরিচয় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের একটি কথায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, পায়ের বাঁকমল যদি গলায় পরা যায় তাহ'লে কণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি হয় না বরং যদি কিছু বৃদ্ধি হয় ত সে শ্বাসরোধের সম্ভাবনা। কোন্ কথা কোথায় বসে, কোন্ উপমা কিসে লাগে, কোথায় কোন্ রসের অবতারণা করা উচিত—এই সবই ছিল তাঁদের আলোচ্য বিষয়। তাঁরা সরস্বতীকে দেবী-স্বরূপে জানতেন এবং মানতেন বলে তাঁকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করবার বৃথা চেষ্টা করেন নি। তাঁরা এ জ্ঞান কখনও হারান নি যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজ-গঠন এবং সাহিত্য-গঠনের উপায় এক হতে পারে না, কেননা এ দু'য়ের উপাদনও স্বতন্ত্র, উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র; এ সত্য আমরা দু'বেলা ভুলে যাই। আধা-খেঁচড়া ইংরাজি শিক্ষার ফলে, আমাদের মনে এই অদ্ভুত ধারণা জন্মেছে যে, যাঁর কোনও বিষয়ে বিশেষ অধিকার নেই তাঁর সকল বিষয়েই সমান অধিকার

আছে—অন্তত সমালোচনা করবার। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অবশ্য আত্মীয়তা আছে, শুধু তাই নয়, মনোজগতের সঙ্গে জড়জগতেরও কুটুম্বিতা আছে; কিন্তু যে শাস্ত্রের হাতে এ সকল সম্বন্ধ নির্ণয় করবার ভার, তা হয় দর্শন, নয় বিজ্ঞান; —অলঙ্কার নয়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার এ তাবৎ বঙ্গ-সাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপে স্বীকৃত হয় নি। এ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হ'লে অলঙ্কার তার সীমা অতিক্রম করতে, তার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়। একটু অসতর্ক হলেই অলঙ্কার দর্শনে গড়িয়ে পড়ে এবং ছড়িয়ে যায়। আজ আমি সে বিপদ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করব, কেননা দর্শনের পথে যাওয়ার অর্থ প্রায়ই আলোক থেকে অন্ধকারে যাওয়া। প্রমাণ-স্বরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আজকাল দেখতে পাই অনেক সমালোচক একটি মাত্র সূত্র নিয়ে নব সাহিত্য-দর্শন গড়বার চেষ্টা করছেন। সে হচ্ছে এই যে, কাব্যের উদ্দেশ্য "সত্য শিব সুন্দরের" মিলন করা। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এ সূত্র নেই, কেননা, প্রাচীন আচার্য্যদের জ্ঞানে, এ ত্রিগুণের আধার স্বয়ং ভগবান—কোনো কাব্য নয়। এ সূত্র আমরা বিলেত থেকে আমদানি করেছি। The true, the good and the beautiful-এর গায়ে আমরা সংস্কৃত ছাপ মেরে তা স্বদেশী মাল বলে চালাবার চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য যে, এই সূত্র ধরে কোনো কাব্যে প্রবেশ করা যায় না, কেননা পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত মতভেদ, যত কলহ, যত তর্ক সবই হচ্ছে ঐ তিনটি কথার অর্থ নিয়ে। শুধু তাই নয়, এই তিনটি কথারও পরস্পরের ভিতর ঘোর জ্ঞাতি-শত্রুতা বিদ্যমান। একজন যেই বলেন যে, এই সত্য, অমনি দশজনে চেঁচিয়ে ওঠেন

যে, তা শিব নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখতে পাই যে, যুগে যুগে এই শিবের দোহাই দিয়ে মানুষে সত্যকে পরাভূত করতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর বেচারির ত কথাই নেই, শিব ত তার উপর চিরদিনই খড়্গহস্ত। কমলাকান্ত বলেছেন যে, কোকিল সুন্দরের সাক্ষাৎ পেলে অমনি বলে ওঠে কু-উ। এবং তিনি এই বাচাল পক্ষীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে—

"যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্পস্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল, তখনই ডাকিয়া বলিও কু-উ।"

একালের সমালোচকেরা যে কমলাকান্তের উপদেশ অনুসারে চলেন তার প্রমাণ এই যে, যেই কেউ বলেন, অমুক কাব্যে সৌন্দর্য্য আছে, অমনি সাহিত্য-শাসকেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করে ওঠেন যে, তাতে বস্তুতন্ত্রতা নেই অর্থাৎ সত্য নেই এবং তাতে জাতীয়তা নেই অর্থাৎ শিব নেই। এই সমালোচকদের বৃদ্ধ শিব বহুকাল ইংরাজি-সাহিত্যের উপর উপদ্রব করে, সম্প্রতি সে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাঙলা-সাহিত্যের স্কন্ধে ভর করেছে। এঁরা ভুলে যান যে, আমাদের কাব্য জাতীয় কি বিজাতীয় তার বিচারক বিদেশীয়েরা। তার পর বস্তুর রূপ সমাজের দিক থেকে অর্থাৎ জীবনের দিক থেকে দেখলে এক-রকম দেখায়—আর কাব্যের দিক থেকে অর্থাৎ মনের দিক থেকে দেখলে আর-এক রকম দেখায়।

যেমন বৈজ্ঞানিকেরা এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে' সত্যের আবিষ্কার করেন, তেমনি শিল্পীরাও এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে' সুন্দরের সৃষ্টি করেন। যেমন জ্ঞানশাস্ত্রের একমাত্র জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এ তত্ত্ব সত্য কি না, তেমনি অলঙ্কার-

শাস্ত্রের একমাত্র জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, এ রচনা সুন্দর কি না। Truth for truth এবং Art for art প্রভৃতি বাক্য যে সহজে আমাদের মনে ধরে না তার কারণ, সাংসারিক জীবনযাত্রার জন্য হিতাহিত জ্ঞানের আমাদের যেমন দৈনিক প্রয়োজন আছে সত্যের যথার্থ জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যের সম্যক অনুভূতির তাদৃশ প্রয়োজন নেই। পৃথিবী সূর্য্যের দিকে ঘুরছে, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করা যায় কিন্তু বাড়ীর চারিদিকে চোর ঘুরছে এ বিষয়ে উদাসীন থেকে এক রাতও নিশ্চিন্তে কাটাবার যো নেই। আর যা সুন্দর তা যে ঘরকন্নার কোনও কাজে লাগে না তা সকলেই জানেন। ছবি আমরা দেওয়ালেই টাঙিয়ে রাখি। Kant বলেন, সৌন্দর্য্য হচ্ছে সেই বস্তু, যাতে মানুষের কোনরূপ স্বার্থ নেই। অতএব তা আত্মার অমূল্য ধন। পৃথিবীতে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য যে জন্মগ্রহণ করছে এবং অমরতা লাভ করছে, তার কারণ সংসার মানুষের সমগ্র মনটা গ্রাস করে ফেলতে পারে নি এবং পারে না। আমাদের মন যে-অংশে অসাংসারিক, সত্য এবং সুন্দর সেই-অংশেরই বিষয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্যের আনন্দ “বৈষয়িক আনন্দ” নয়, ও হচ্ছে “লোকোত্তরোহহ্লাদ”। যার মন যত অসাংসারিক তার মন সত্য সুন্দরের সন্ধান তত পায়। বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে, যে মন জন্মাবধি সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন সেই মাটি-থেকে-আলগা মন থেকেই দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সামাজিক লাভ লোকসানের দিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্যের মূল্য যে এত বেশি, তার কারণ কেবলমাত্র সাংসারিক মনের সাহায্যে সমাজের হয় ত স্থিতিরক্ষা করা যেতে পারে,

কিন্তু উন্নতি সাধন করা যায় না। যে দেশে সাহিত্য নেই সে দেশে সমাজ থাকতে পারে কিন্তু সভ্যতা নেই। এ সত্যের সাক্ষাৎকারের জন্য অতিদূর দ্বীপান্তরে যাবার দরকার নেই, এই ছোটনাগপুরে তা নিত্য প্রত্যক্ষ। কিন্তু মানবসামাজ একমাত্র প্রাক্তন সংস্কারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকতে পারে না। যেমন মানুষকে সামাজিক করে তোলবার জন্যে নীতিশিক্ষার দরকার, তেমনি মানুষের মনে সত্য এবং সুন্দরের জ্ঞান উদ্রেক করবার জন্যও শাস্ত্রের আবশ্যক। অলঙ্কারশাস্ত্র কাব্যসম্বন্ধে এই শিক্ষা দেবার ভার হাতে নিয়েছে। সুতরাং সংস্কৃত এবং ফরাসী অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের রূপেরই বিচার হয়ে থাকে; গুণের পৃথক বিচার হয় না। কেননা কাব্যরাজ্যে রূপ আর গুণ একই বস্তু। এবং কাব্যের রূপের জ্ঞান লাভ করবার জন্য তার গঠনের পরিচয় নেওয়া দরকার, সে গঠন ভাবেরই হোক্, আর ভাষারই হোক্। প্রাণী ছাড়া যেমন আমরা প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাই নে, তেমনি সুন্দর ছাড়া আমরা সৌন্দর্য্যেরও সাক্ষাৎ পাই নে। সুতরাং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার অর্থ আমাদের মনোভাবকে সাকার এবং সুগঠিত করা। আর্টিষ্টের নিকট সৃজনীশক্তির অর্থ কি, সে বিষয়ে বিখ্যাত ফরাসী-লেখক Roman Rolland-এর মত নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্চি। আপনারা সকলেই জানেন যে ইনি এবার Nobel Prize লাভ করেছেন—

"The effort necessary to dominate and concentrate one's passion into a beautiful and clear form."

অলঙ্কারশাস্ত্রের এ যুগে সাহিত্য শাসন করবার সামর্থ্য নেই, কেন না এ যুগে সাহিত্যের বিচারালয় দেওয়ানি আদালত—

ফৌজদারি নয়। বর্ত্তমানে অলঙ্কারের আইন, সাহিত্যের কার্য্যবিধি আইন,—দণ্ডবিধি আইন নয়। যদি আজকের দিনে অলঙ্কারের কোনও সার্থকতা থাকে ত সে এই কারণে, যে এ শাস্ত্র পাঠকদের কাব্যের beautiful and clear form চিনতে এবং লেখকদের passion dominate and concentrate করতে কিঞ্চিৎ সাহায্য করতে পারে।

সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যে যে অলঙ্কারের সূত্রপাত হয়েছে এ আমি সাহিত্যের সুলক্ষণ মনে করি। এ সব আলোচনার ফলে, আমরা কাব্য রচনা করতে শিখি আর না শিখি, এই আত্মসংযমটুকু শিক্ষা করব যে, আমরা কামারের দোকানে আর দইয়ের ফরমায়েস দেব না; যদিচ Metchnikoff-এর প্রসাদে আমরা সকলেই জানি যে, দইয়ের মত স্বাস্থ্যকর পদার্থ এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আমাদের এ ভয় পাবার দরকার নেই যে, সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করাতে কাব্য সত্য এবং শিবভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যমাত্রই মানবপ্রকৃতির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, অতএব তা অশিব নয়। পৃথিবীতে মিথ্যাই হচ্ছে একমাত্র অমঙ্গলকর বস্তু। নানাপ্রকার সামাজিক মতামত কালের প্রবাহে কিছুদিনের জন্য উপরে ভেসে উঠবে এবং সে-দিনের আলোয় চিকমিক করবে, তারপর চিরদিনের মত বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা, দান্তের Divina Comedia, Shakespeare-এর Hamlet এবং Goethe-র Faust—আবাহমান কাল দাঁড়িয়ে থাকবে, কেননা এ সকল কাব্য

সত্যের অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আলোকে মণ্ডিত।

সুতরাং বাঙলার উদীয়মান আলঙ্কারিকদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হন যে, অলঙ্কার কাব্যের পিঠ-পিঠ আসে এবং উভয়ের ভিতর পিঠে পিঠে ভাইয়ের সম্বন্ধ থাকলেও অলঙ্কার কনিষ্ঠ এবং কাব্য জ্যেষ্ঠ। সাহিত্যের কোন কোন অবস্থায় অলঙ্কার জ্যেষ্ঠের পদবী গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও জ্যেষ্ঠতাত হয়ে উঠবার অধিকারে সে একেবারেই বঞ্চিত।

অগ্রহায়ণ, ১৩২২ সন।

আর্য্যধর্ম্মের সহিত বাহ্যধর্ম্মের যোগাযোগ।

—॰৯॰—

সম্প্রতি আমাদের মাসিকপত্রে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি নিয়ে একটি তর্ক উপস্থিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ও-দুটি ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে; শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, তা নয়। এ সমস্যার মীমাংসা করা আমার সাধ্যাতীত। তবে এ অলোচনায় যোগদান করবার অধিকারে ইংরাজি শিক্ষিত লোকেরাও বঞ্চিত নন, কেননা যাকে আমরা হিন্দুসভ্যতা বলি তা কোন অংশে আর্য্য, আর কোন অংশে অনার্য্য এ কথা জানবার কৌতূহল বিশেষ করে আমাদেরই আছে।

বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় যাকে আর্য্যধর্ম্ম বলেন তাকে বৈদিক ধর্ম্ম বলাই শ্রেয়। কেননা, আর্য্য বলতে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাকতে পারে এবং আছে। আসলে শাস্ত্রীমহাশয় "বৈদিক-ধর্ম্ম"-অর্থেই "আর্য্যধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করেছেন; তিনি আর্য্যমতকে বারাবর বেদপন্থীদের মত বলেই উল্লেখ করে গেছেন। "বেদপন্থী" শব্দটিও আমি বর্জ্জন করা আবশ্যক মনে করি, কেননা বেদের শতপথ থাকতে পারে, সুতরাং, সকল বেদপন্থীরা চাই-কি একমত নাও হতে পারেন; অপর পক্ষে, বেদ শব্দের অর্থ যে কি সে-বিষয়ে মীমাংসক এবং বৈদান্তিক উভয়েই একমত। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন—

"ব্রাহ্মণ সহিত ঋক সাম যজুঃকে বেদ কহা যায়। এস্থলে "অগ্নিমীলেঽগ্নির্বৈ দেবানামবম" ইত্যাদি এবং "সংসমিত্যুবসেঽথ মহাব্রতম্" ইত্যন্ত বাক্যসমূহ এবং তাহার অবয়বভূত সকল বাক্যের প্রতিই বেদ শব্দ প্রয়োগ করা হয়।"

বেদ যে কেবল শব্দসমূহ এ বিষয়ে মেধাতিথির সঙ্গে শঙ্কর একমত। তিনি বলেছেন—

"উপনিষদ্ বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরাবিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ। —অর্থাৎ উপনিষদ-বেদ্য যে অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে—"পরাবিদ্যা" বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদশব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই শব্দসমূহ মাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে।"

সুতরাং জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদমূলক কি না—তাই হচ্ছে এস্থলে যথার্থ আলোচনার বিষয়। এ বিষয়ে পুরাকালে বহু তর্ক করা হয়েছে, সে তর্কের ফল সেকালে কি দাঁড়িয়েছিল মেধাতিথির মনুভাষ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায় :—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ" ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সূত্রে মেধাতিথি বলেন—

"শাক্যভোজক ক্ষপণকাদি ধর্ম্ম বেদমূলক নহে, কেননা ইহারা বেদ যে অপ্রামাণ্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ-বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্মৃতিতে বেদপাঠ নিষিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও বৌদ্ধ-প্রভৃতি ধর্ম্মের বেদমূলত্ব সম্ভব কিনা তাহা বিচার করা যাউক। যেস্থলে এক বস্তুর সহিত অপর কোন বস্তুর সম্বন্ধ দূরাপেত সে স্থলে একের মূল যে অপর এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। তদ্ব্যতীত এ সকল ধর্ম্মের স্মৃতিপরম্পরায় মূলান্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু প্রভৃতির মুগপত্তি

এবং দুর্গতিও ত আমি দিব্যচক্ষে নিত্যই দেখিতে পাই। ভোজক পঞ্চ-রাত্রিক নির্গ্রন্থ অর্থবাদ পাশুপত প্রভৃতি বাহ্য ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বসিদ্ধান্ত-প্রণেতৃ মহাপুরুষদিগকে কিম্বা দেবতাবিশেষকে সেই সেই সিদ্ধান্তের অর্থের প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া মনে করে। এবং বেদমূলক ধর্ম্মকে মান্য করে না। কেবল তাহাই নয়, তাহারা প্রত্যক্ষ-বেদে যে সকল বিরোধ দৃষ্ট হয় বিশেষ করিয়া তাহাই উপদেশ দেয়।"

শুধু বৌদ্ধ জৈন নয়, বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি বেদবাহ্য ধর্ম্মসকল যে বেদমূলক নয় এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় এবং মেধাতিথি একমত। এবং আমার বিশ্বাস এই মতই ভারতবর্ষের সনাতন মত।

এর উত্তরে হয়ত অনেকে বলবেন যে, এ-মত ধর্ম্মশাস্ত্রকার-গণের সাম্প্রদায়িক মত, সুতরাং তাঁদের কথা ঐতিহাসিক সত্য-স্বরূপে গ্রাহ্য নয়। এ আপত্তি কিন্তু জাতির বাহ্য ইতিহাস সম্বন্ধেই খাটে, মানসিক ইতিহাস সম্বন্ধে নয়। কোন বাহ্য ঘটনার সত্যাসত্য অবশ্য কোনও ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা সম্প্রদায়-বিশেষের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না এবং তা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ধর্ম্মমতসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মতই মুখ্যত গ্রাহ্য। এরূপ স্থলে স্মৃতিপরম্পরাকে উপেক্ষা করায় ঐতিহাসিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না।

(২)

যেক্ষেত্রে একই শব্দ একজন এক অর্থে ব্যবহার করেন এবং আর-একজন আর-এক অর্থে ব্যবহার করেন সে ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্কের কোনও শেষ নেই। হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সকল আলোচনা যে প্রায়ই কথার কথা হয়ে ওঠে তার কারণ,—

আমরা ধর্ম্ম শব্দ তিনটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। Religion, Morality এবং Law—এ তিনের প্রতিই আমরা নির্ব্বিচারে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করি। এ তিনের মধ্যে অবশ্য যোগাযোগ আছে। ধর্ম্ম অবশ্য এই ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেই দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে একে-তিন, তিনে-এক হলেও এ তিনটির পার্থক্য বিস্মৃত হলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল বিচার পণ্ড হয়। সুতরাং বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম বেদমূলক কি না তা নির্ণয় করতে হলে ধর্ম্মশাস্ত্রে "ধর্ম্ম" শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা আবশ্যক।

আমরা যাকে religion বলি সে অর্থে ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এ শাস্ত্র মুখ্যত law এবং গৌণত morality-র শাস্ত্র।

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত॥"

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকের মেধাতিথি এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন :—

"এস্থলে সাক্ষাদ্ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ধর্ম্মশব্দ অষ্টকাদি* অনুষ্ঠান বচন। বাহ্যদর্শীরা কিন্তু ভস্মকপাল ধারণ করাকেও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহাই নিবর্ত্তন করিবার জন্য "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ" ইত্যাদি বিশেষণ পদ ধর্ম্মসম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধু ব্যক্তিরা হিতের প্রাপ্তি এবং অহিতের পরিহারের জন্য যত্নবান হইয়া থাকেন। হিতাহিত ত দৃষ্ট এবং অপ্রসিদ্ধ। অদৃষ্ট হিতাহিতই বিধিপ্রতিষেধের দ্বারা লক্ষিত হয়। যাহারা সেই (বৈদিক) অনুষ্ঠানের বাহ্য তাহাদিগকেই অসাধু কহা যায়। "ধর্ম্ম" শব্দের প্রতি যে "নিত্য" বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার

* বৈদিক শ্রাদ্ধবিশেষ।

কারণ ইতর ধর্ম্মের ন্যায় অষ্টকাদি ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যতদিন সংসার থাকিবে ততদিন এই ধর্ম্মও থাকিবে। অপর পক্ষে বাহ্যধর্ম্মসকল মূর্খ এবং দুঃশীল পুরুষদিগের কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়া কিছু দিনের জন্য অবসর লাভ করে, তাহার পর অন্তর্হিত হয়। ইহার কারণ, ব্যামোহ যুগসহস্রানুবর্ত্তী হইতে পারে না। সম্যক জ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও তৎক্ষয়ে পুনর্ব্বার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। সম্যকজ্ঞানের নির্ম্মলতার কোনরূপ ছেদ সম্ভাবনা নাই।—"অদ্বেষরাগিভিঃ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বাহ্যধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শান হইয়াছে। "রাগদ্বেষ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা লোভাদি প্রবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। লোভ হইতেই মন্ত্রতন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ভোগোপযোগী আত্মচেষ্টার দ্বারা জীবনধারণ করিতে অসমর্থ তাহারাই লিঙ্গধারণাদির দ্বারা জীবনধারণ করে। এই কারণেই বলা হইয়াছে ভস্মকপালধারণ, নগ্নতা, কাষায় বাস ধারণ এ সকল বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদের জীবিকামাত্র।"

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈদিকধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, মানবের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধন করা। মেধাতিথি সংক্ষেপে ধর্ম্মের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন —"যাবতা ধর্ম্মোঽত্র বক্তব্যতয়া প্রতিজ্ঞাতঃ স চ বিধি প্রতিষেধ লক্ষণঃ।" অর্থাৎ Do এবং Do'nt নিয়েই এ ধর্ম্মের কারবার, এককথায় এ ধর্ম্মের অর্থ Law এবং Morality.

অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, Religion হিসেবে বাহ্যধর্ম্মসকল বেদমূলক নয়। বৈদিক অনুষ্ঠানের অদৃষ্ট ফলে বিশ্বাসই সে ধর্ম্মের Sacred অংশ এবং সে অংশ, সকল বাহ্যধর্ম্ম সমান পরিহার করেছিল। শুধু তাই নয়, বাহ্য-ধর্ম্মাবলম্বীদের স্বর্গলাভ করবার প্রবৃত্তিও ছিল না। বৈদিকধর্ম্ম সামাজিক মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে ধর্ম্ম মুখ্যত

Social,—Spiritual নয়। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, উপনিষদ বেদ নয়, শ্রুতি। এমন কি, স্মার্ত্তমতে উপনিষদ যে বেদবাহ্য একথা স্বয়ং শঙ্করও স্বীকার করেছেন। সুতরাং বাহ্যধর্ম্মের মূল বেদান্ত কিনা সে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি, সুতরাং, এস্থলে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। শাস্ত্রীমহাশয় কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থাৎ স্মৃতির প্রমাণ দেখিয়েছেন; সুতরাং, জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সে শাস্ত্রের কাছে Law এবং Morality বিষয়ে কতটা ঋণী সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

(৩)

ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে মেধাতিথি বলেছেন "ইহতু সাক্ষাদ্ধর্ম্ম উপদিশ্যতে"। সাক্ষাদ্ধর্ম্মের অর্থ,—যে-সকল বিধি-নিষেধের দ্বারা মানবসমাজ শাসিত এবং চালিত হয়। শাস্ত্র (Law) এবং আচার (Custom) হচ্ছে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ দেহ। ইংরাজের আইন এবং স্বসমাজের আচার—এ যুগে আমাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম। আত্মার সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় সম্বন্ধে মতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, কোন কালে কোন দেশে সমাজ-রক্ষার সকল ব্যবস্থা বিলকুল উল্‌টে যায় না।

ইউরোপ খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু রোমের আইন ত্যাগ করে নি। অদ্যাবধি রোমের সমাজ-শাসন (Civil Law) এবং নিজ নিজ দেশের আচারের (Common Law) উপরেই ইউরোপের প্রতি দেশের সাক্ষাদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতির সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও নূতন শাস্ত্র গড়বার

প্রয়োজন ছিল না। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহ্যধর্ম্ম-সকল প্রবৃত্তিমূলক নয়, নিবৃত্তিমূলক। সংসার-ত্যাগই সে সকল ধর্ম্মের পরম পুরুষার্থ। অর্থকাম নয়, মোক্ষলাভ করাই ছিল সে সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য। এরূপ ধর্ম্মমত থেকে কর্ম্মজীবনের কোনও নূতন ব্যবস্থা জন্মলাভ করতে পারে না। মেধাতিথি বলেন যে, যদি নিষ্কামধর্ম্মই সত্য হয় তাহলে "ইদং আপতিতং ন কিঞ্চিৎ কেনচিৎকর্ত্তব্যং সর্ব্বৈস্তূষ্ণীং ভূতৈঃ স্থাতব্যম"। সুতরাং বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের কোনও স্বতন্ত্র ব্যবহারশাস্ত্র থাকবার কথা নয় এবং সম্ভবত নেই।

(৪)

একশ্রেণীর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে Morality-র কোনও কথা নেই; সে শাস্ত্রে যা আছে তা শুধু Law. অপর পক্ষে এই মতে বৌদ্ধশাস্ত্রে যা আছে তা শুধু Morality. এরূপ মত প্রচার করায় অবশ্য নিতান্ত এক-দেশদর্শীতার পরিচয় দেওয়া হয়। Morality-র সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠালাভ করা যেমন অসম্ভব, কেবলমাত্র Morality-র উপর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করাও তেমনি অসম্ভব। যদি কেবলমাত্র হিতবাদের উপর ধর্ম্মস্থাপন করা সম্ভবপর হত তাহলে Mill এবং Comte-ও পৃথিবীতে নূতন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতে পারতেন, এবং বিশ্বমানবের সেবাধর্ম্ম এবং অনুশীলনের ধর্ম্ম প্রভৃতি আঁতুড়ে মারা যেত না। অপর পক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে Morality নেই এ কথা বলায় Law-এর সঙ্গে Morality-র সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয়

দেওয়া হয়। মেধাতিথি বলেন যে "স্মার্ত্তবৈদিকয়োর্নিতং ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরম্।" স্মৃতির সঙ্গে বেদের যে সম্বন্ধ, Law-এর সঙ্গে Morality-রও সেই সম্বন্ধ।

অর্থাৎ এ দুই পরস্পর একান্ত জড়িত। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে, এ দুটি বস্তু পৃথক করা হয়নি তার কারণ এ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া নয়, আদেশ দেওয়া। তৎ-সত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে যে সকল শীলের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সে সকলের উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে। এর থেকে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় প্রমাণ করতে চান যে, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম হ'তে উৎপন্ন। বাহ্যধর্ম্ম এবং বৈদিকধর্ম্মের এই শীলগত ঐক্য থেকে তার একটি যে অপর-আর-একটি থেকে উৎপন্ন এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। নচেৎ এ অনুমানও সঙ্গত যে, মানবধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল হ'তে উৎপন্ন; কেননা চুরি করা, হিংসা করা, পরদার গমন করা, মিথ্যা কথা বলা এবং পরদ্রব্যে লোভ করা মনুর মতেও অধর্ম্ম, Moses-এর মতেও অধর্ম্ম। এ প্রকার যুক্তি অনুসরণ করলে বরং এই সত্যে উপস্থিত হতে হয় যে, বৈদিকধর্ম্ম বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম হতে উৎপন্ন, কেননা কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রসকল বুদ্ধের জন্মের পরবর্ত্তী কালে লিখিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস যে, এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কোনও ধর্ম্ম অপর-কোনও ধর্ম্মের নিকট ঋণী নয়। এই ধর্ম্মজ্ঞান ভারত-বর্ষের উত্তরাপথের প্রাচীন সভ্যতার অন্বয়াগত সম্পত্তি। এবং এই কারণেই ধর্ম্মশাস্ত্রে Moral Laws-কে সামান্য-ধর্ম্ম বলে' উল্লেখ করা হয়েছে। "চুরি করো না"—এ নিষেধ বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিচারে সকলের পক্ষে সমান প্রযোজ্য। অপর পক্ষে

বেদাধ্যয়ন করো এবং বেদাধ্যয়ন করো না—এ দুটি হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এবং বিশেষ নিষেধ। অতএব বৈদিক বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের শীল যে একই আর্য্য মনোভাব হতে উৎপন্ন হয়েছে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

(৫)

বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় আরও বলেন যে—

"বেদপন্থীদের জ্ঞানদর্শন আচারব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা রীতিনীতি মূল করিয়া বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় ধর্ম্মেরই সন্ন্যাসিগণের বিধিনিষেধ প্রণীত হইয়াছে"—

এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যে সভ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে গার্হস্থ্য এবং আরণ্যক উভয় ধর্ম্মেরই স্থান ছিল। বাহ্যধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন সন্ন্যাসধর্ম্ম, এবং বেদধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন গার্হস্থ্যধর্ম্ম। শুনতে পাই কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার গার্হস্থ্য ব্যতীত অপর কোনও আশ্রম অঙ্গীকার করেন না। এর উত্তরে মেধাতিথি বলেন যে, অপর তিনটি আশ্রমকে গার্হস্থ্যের বিকল্পস্বরূপেই গ্রাহ্য করা হয়। সে যাই হোক মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায় যদি লুপ্ত হয়ে যেত, তাহলেও সে শাস্ত্রের যে কোনরূপ অঙ্গহানি হত না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উভয়ের প্রস্থানভূমি এক হ'লেও, কর্ম্ম-মার্গে এবং ত্যাগমার্গে প্রভেদ বিস্তর, সুতরাং বেদধর্ম্ম এবং বাহ্যধর্ম্ম যে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠেছিল, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সুতরাং, এর একটি হতে অপরটির উদ্ভবের কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ হবে না।

এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মূল আর যেখানেই নিহিত থাক, বেদে নেই। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা বেদকে কি অর্থে স্মৃতির মূলস্বরূপে স্বীকার করেন তাও একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

(৬)

"মূল" শব্দ দ্ব্যর্থবাচক। ধর্ম্মের মূল কোথায় এ প্রশ্ন ঐতিহাসিকও জিজ্ঞাসা করেন, দার্শনিকও জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু এ উভয়ের জিজ্ঞাস্য-বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐতিহাসিক, ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করেন দেশকালের অতিরিক্ত কোনও পদার্থে। কোনও একটি বিশেষ ধর্ম্ম কোন্ যুগে কোন্ দেশে কোন্ জাতির অন্তরে আবির্ভূত হয়েছিল, কোন্ পূর্ব্বমত হতে তা উদ্ভূত—এই হচ্ছে ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাস্য বিষয়, অপর পক্ষে ধর্ম্মের মূল মানবের হৃদয়ে কি সমাজে, আগমে কি আপ্তবাকে নিহিত—এই হচ্ছে দার্শনিকের জিজ্ঞাস্য বিষয়।

শাস্ত্রীমহাশয়েরা আজ যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন, সে হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রশ্ন এবং শাস্ত্রকারেরা যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে হচ্ছে দার্শনিকের প্রশ্ন।

খৃষ্টধর্ম্মের মূল যে বাইবেল, এ ত ঐতিহাসিক সত্য। এ সত্য যার খুসি তিনিই যখন খুসি তখনই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু স্মৃতি যে বেদমূলক, তা উক্ত জাতীয় সত্য নয়। কেননা প্রত্যক্ষ-বেদে যে, সে মূল দৃষ্ট হয় না এ কথা মীমাংসকেরাও স্বীকার করেন। এ কথা স্বীকার করতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না, কেননা তাঁদের মতে ধর্ম্মের মূল কস্মিনকালেও প্রত্যক্ষ হতে পারে না। মেধাতিথি বলেন,—

"পূর্ব্বপক্ষের মতে অনমুভূত বস্তুর স্মরণ উপপত্তি হয় না। কোনরূপ প্রমাণের দ্বারা অনুভব না করিয়াও মনুপ্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কবিগণ যেরূপ কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে কথাবস্তু উৎপাদন করিয়া কহিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিত যদি না স্মৃতিতে কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হইত। অনুষ্ঠানার্থই কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হয়। এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যিনি নিজের ইচ্ছা এবং নিজের বুদ্ধির সাহায্যে ব্যবহারিক অনুষ্ঠান সকল নির্ম্মাণ করিতে পারেন। আর যদি ইহাই হয় যে, ভ্রান্ত অনুষ্ঠান সকল সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যাবৎ সংসার তাবৎ একের ভ্রান্তি জগৎকে ভ্রান্ত করিয়া রাখিবে। এ কল্পনা অলৌকিকী। অতএব মনু প্রভৃতির শাস্ত্র যে বেদমূলক, সে বিষয়ে ভ্রান্তির কোন অবসর নাই। মন্বাদি, ধর্ম্মের যে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। ইন্দ্রিয়ের সহিত পদার্থের সন্নিকর্ষজ যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ধর্ম্ম কখনও ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে না, কেননা তাহা কর্ত্তব্যতা-স্বভাব। সেই কারণে বেদকে কর্ত্তব্যতা-স্মরণের অনুরূপ কারণ-স্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সে বেদ অনুমানের দ্বারাই মনু প্রভৃতির উপলব্ধ হইয়াছিল। বেদের যে শাখা স্মার্ত্ত ধর্ম্মের আশ্রয় সে শাখা ইদানীং উৎসন্ন হইয়াছে।"

সুতরাং, দেখা গেল যে, মীমাংসকদের মতে বেদ যে স্মৃতির মূল এও কল্পনামাত্র। তা ছাড়া বেদকে সামান্য-ধর্ম্মের (morality) মূলস্বরূপেই কল্পনা করা হয়েছে, বিশেষ ধর্ম্মের নয়। মেধাতিথি বলেন,—"বিশেষনির্দ্ধারণে তু ন কিঞ্চিৎ প্রমাণং ন চ প্রয়োজনম্"।

অতএব, বেদে ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে শুধু বাহ্যধর্ম্মের নয়, বৈদিক ধর্ম্মেরও বিশেষত্ব উপেক্ষা করা হয়। বস্তুর বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান।

কাজেই, এ সকল ধর্ম্মের ভিতর যা সামান্য কেবলমাত্র তার প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে আমাদের অতীতের জ্ঞান এক পদও অগ্রসর হয় না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বেদ এবং বাহ্যধর্ম্মের সমন্বয় করা অতি গর্হিত কার্য্য বলে মনে করতেন। ধর্ম্মের সঙ্গে বেদান্তের, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈষ্ণবের, শৈবের সঙ্গে বৌদ্ধের এবং চার্ব্বাকের সঙ্গে মীমাংসকের সমন্বয় করা এ যুগের ধর্ম্ম। সে কালের ধর্ম্ম, বিরোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাগযজ্ঞাদির প্রতি বাহ্যধর্ম্মের যেরূপ অশ্রদ্ধা ছিল, চৈত্য-বন্দনাদির প্রতি বেদধর্ম্মের তদপেক্ষা বেশি অশ্রদ্ধা ছিল। অনেকের বিশ্বাস যে ভগবদ্গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করা হয়েছিল কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরোধর্ম্ম ভয়াবহ"—এ হচ্ছে গীতারই বচন। গীতাকারের মতে সমাজের পক্ষে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির চাইতে আর বেশি বিপত্তি নেই। অসবর্ণ বিবাহ কি সমাজে কি মনোরাজ্যে ব্রাহ্মণদের মতে সমান জঘন্য ও হেয় ছিল। সুতরাং পুরাকালে কোনও সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী জন্মগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণেরা বেণ রাজার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রতিও ঠিক সেই ব্যবহার করতেন। তবে যে প্রাচীন ভারতের সকল ধর্ম্ম মিলেমিশে খিঁচুড়ি পাকিয়ে নবীন হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে, তার কারণ পূর্ব্বাচার্য্যেরা সহস্র চেষ্টাতেও যেমন আর্য্য-অনার্য্যজাতির রক্তের মিশ্রণ বন্ধ করতে পারেন নি, তেমনি বেদও বাহ্য ধর্ম্মের মিশ্রণও বন্ধ করতে পারেন নি।

সুতরাং, দেখা গেল যে বেদপন্থীরা যে কারণে স্বধর্ম্মের বেদমূলত্ব স্বীকার করেন—সে হচ্ছে theoretical,—histori-

cal নয়। তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন যে, এ মূল "ন স্থিতি হেতুতয়া বৃক্ষস্যেব।"

আমরা যা খুঁজি তা হচ্ছে ধর্ম্মবৃক্ষের শিকড়। সে শিকড় সেকালে যখন বেদধর্ম্মে খুঁজে পাওয়া যায় নি তখন একালে যে পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনা অতি অল্প।

মেধাতিথি বলেছেন—"বাহ্যধর্ম্ম সকলের স্মৃতিপরম্পরায় মূলান্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়"—কিন্তু সেই অপর মূল সকল যে কি, তা তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি, তবে তাঁর কথার ভাবে বোঝা যায় যে তিনি বাহ্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-পুরুষদেরই নিজ নিজ ধর্ম্মমতের মূলস্বরূপে গ্রাহ্য করেছিলেন।

আমরা তাঁদের পিছনেও যাইতে চাই, এবং বুদ্ধ প্রভৃতির মত আর্য্যমত কি না বিশেষ করে জানতে চাই।

আর্য্য শব্দ যদি Aryan শব্দের প্রতিবাক্য হয়, তাহলে বৌদ্ধ জৈন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও আর্য্যধর্ম্ম বলে স্বীকার করবার পক্ষে আমি কোনরূপ বাধা দেখতে পাই নে। Aryan শব্দ জাতি-বাচক এবং অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে অর্থে সমগ্র ইউরোপ আর্য্য, সে অর্থে বুদ্ধ মহাবীর বাসুদেবও আর্য্য। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন শাক্যকুলে, মহাবীর জ্ঞাতৃক কুলে, এবং বাসুদেব যদুকুলে। এ সকল কুলই (clan) আর্য্যকুল। এ সত্য বেদপন্থীরাও স্বীকার করেছেন, কেননা তাঁরা এঁদের ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দ্বিজ বলেই উল্লেখ করেন। তবে যে তাঁরা এঁদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বাহ্যধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন তার কারণ এই যে, যে আর্য্যকুল হতে বৈদিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সে একটি স্বতন্ত্র কুল।

সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই দেব নদীর অভ্যন্তরে যে দেশ অবস্থিত তার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এবং তৎপার্শ্বস্থিত কুরু-ক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল এবং শূরসেন এই চারিটি ব্রহ্মর্ষিদেশ। ভারতবর্ষের এই ভূভাগে যে আর্য্যকুল বাস করতেন, সেই কুলেরই পারম্পর্য্য-ক্রমাগত যে আচার, শাস্ত্রকারদের মতে তাই সদাচার। এই আর্য্যদের কুলাচারই শাস্ত্রমতে আর্য্যধর্ম্ম। এ অর্থে অবশ্য বৌদ্ধ জৈন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম নয়, কেননা বৃষ্ণিকুল, জ্ঞাতৃককুল এবং শাক্যকুলের বাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং ব্রহ্মর্ষিদেশের বহির্ভূত দেশ। কিন্তু সে সকল দেশ ত শাস্ত্র-মতে আর্য্যদেশ। মনু বলেন, যে দেশের পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত সেই সমগ্র দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। মেধাতিথি বলেন যে "আর্য্যা বর্ত্তন্তে তত্র" "এবং ম্লেচ্ছেরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও সে দেশে চিরস্থায়ী হইতে পারে না"—এই কারণেই এ দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। তাঁর মতে দেশের নাম থেকে জাতির নাম হয় না, জাতির নাম থেকেই দেশের নাম-করণ হয়।

ভারতবর্ষের উত্তরাপথে, যে-সকল আর্য্যকুল বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে পরস্পরের ভাষার যেমন ঐক্য ছিল, মনোভাবেরও তেমনি ঐক্য ছিল। এঁরাই ভারতবর্ষের আর্য্যসভ্যতা স্থাপন করেন, এবং সেই আর্য্যসভ্যতাই এ-দেশের সকল প্রাচীন ধর্ম্ম-মতের মূল। এই সকল বিভিন্নকুলের আধ্যাত্মিক মনোভাবের যে পার্থক্য ছিল সম্ভবত সেই পার্থক্য হতেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়েছে। বুদ্ধ মহাবীর প্রভৃতি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সকলের মূল যে তাঁদের নিজ নিজ কুলধর্ম্মে নিহিত ছিল এরূপ অনুমান করবার বৈধ কারণ আছে। এই উভয় ধর্ম্ম

মতে শাক্যসিংহের পূর্ব্বে অপর বুদ্ধ এবং মহাবীরের পূর্ব্বে অপর তীর্থঙ্কর ছিল। এতেই প্রমাণ হয় যে, এ-সকল ধর্ম্মমত অতি প্রাচীন ধর্ম্মমত, বুদ্ধাদির হাতে তা শুধু সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। যে আর্য্যকুল আদিতে ব্রহ্মাবর্ত্তেই উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁরা স্বীয় কুলধর্ম্মকেই আর্য্যধর্ম্ম বলে প্রচার করেছিলেন। আর্য্য শব্দের এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শাক্য ক্ষপণকাদির ধর্ম্ম অবশ্য বাহ্যধর্ম্ম কিন্তু সে সকল ধর্ম্মমত Non-Aryan নয়।

(৭)

একদলের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাক্যসাত্বতাদি কুল আর্য্যবংশীয় নয়। কিন্তু এ মত যে সত্য তার কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। এস্থলে Ethnology নামক উপ-বিজ্ঞানের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, Ethnologist-দের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবত পরে দাঁতে গিয়ে ঠেকবে। যাঁরা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় করতেন তাঁদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যে স্বল্প ছিল—এ সত্য Ethnologist-রাই প্রমাণ করেছেন। এখন এঁদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েচে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয় ততদিন এঁরা শাক্য-সিংহের জাতি নির্ণয় করতে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা হয় নি। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে মহাবীর, বাসুদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতিকে আর্য্য বলে গ্রাহ্য করতে বাধ্য। এঁদের প্রবর্ত্তিত

ধর্ম্মমত সকল আর যেখান থেকেই হোক, শূদ্রবুদ্ধি অর্থাৎ ক্ষুদ্র-বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয় নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এ-হিসেবে সত্য যে, বাহ্যধর্ম্ম সকল বৈদিকধর্ম্ম হতে উৎপন্ন হয় নি; অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের মতও এই হিসেবে সত্য যে, এ সকল ধর্ম্মমত Non-Aryan নয়। এর চাইতে বেশি কিছু জোর করে বলা চলে না।

মাঘ, ১৩২২ সন।

আর্য্যসভ্যতার সহিত বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ

—:o:—

ভারতবর্ষের উত্তরাপথের প্রাচীনসভ্যতা মূলত এবং মুখ্যত যে আর্য্যসভ্যতা, আমি আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তাই প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছি। এবং এ কথাও সর্ব্বলোকবিদিত যে, আমরা নিজেদের সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী-স্বরূপে গণ্য মান্য এবং ধন্য মনে করি। আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা সব ঐ আর্য্য-শব্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা কি-অর্থে এবং কি-পরিমাণে আর্য্যধর্ম্মী, সে বিষয়ে আমাদের মনে একটি যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা থাকা, আমি বাঙালীর পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করি। আর্য্য এবং বাহ্যধর্ম্মসকলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার অনধিকার-চর্চ্চা করবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের স্বধর্ম্মের উৎপত্তি-নির্ণয় করা।

বাঙালীজাতি আর্য্যজাতি কি না, তাই নিয়ে দেখতে পাই পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা মতভেদ আছে। আমরা আর্য্যবংশীয় কি না সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে এবং সে সন্দেহের বৈধ কারণও আছে। কি প্রাচীন শাস্ত্রমতে কি অর্ব্বাচীন বৈজ্ঞানিক মতে বাঙালী যে আর্য্যজাতি বলে গণ্য নয়, এ-কথা সকলেই জানেন। শাস্ত্রমতে এক দ্বিজ ব্যতীত অপর কেউ বংশমর্য্যাদা হিসেবে আর্য্যত্বের দাবী করতে পারেন না এবং বাঙালীজাতির মধ্যে দ্বিজের সংখ্যা যে কত অল্প তা বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে। অপর পক্ষে ethnologists-দের মতে হাজারে

ন-শ-নিরানব্বই জন বাঙালী দ্রাবিড়-মোগল-বংশীয়। কিন্তু এর থেকে বাঙালীর আর্য্যত্ব অপ্রমাণ হয় না। কেননা নৃতত্ত্ববিদেরা অদ্যাবধি এমন কোনও মাপকাঠি নির্ম্মাণ করতে পারেন নি যার সাহায্যে কোনও জাতির বংশনির্ণয় করা যেতে পারে। অপর পক্ষে ভাষার প্রমাণ যদি গ্রাহ্য হয় তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাঙালীজাতি মূলত আর্য্যজাতি। বাঙলা-ভাষা যে আর্য্যভাষা এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। বর্ত্তমান বাঙালী-জাতির যে অনার্য্যদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে, এ সত্য অস্বীকার করা যায় না এবং তা অস্বীকার করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। কেননা ভারতবর্ষে এমন কোনও জাতি নেই, যাদের শিরায় অনার্য্য-রক্তের লেশমাত্রও নেই। এ কালের দ্বিজমাত্রেই যে খাঁটি আর্য্য এবং অ-দ্বিজ মাত্রেই যে খাঁটি অনার্য্য এরূপ বিশ্বাসের মূলে কোনও বৈধ কারণ নেই। পুরাকালে বহু আর্য্য যে দ্বিজত্ব-ভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং বহু অনার্য্য যে দ্বিজত্ব-লাভ করেছিলেন সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। সত্য কথা এই যে, আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা সামাজিক হিসেবে যে যাই হই, শারীরিক হিসাবে সবাই বর্ণসঙ্কর।

এ সত্ত্বেও আমরা যে আর্য্যসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী এবং আমাদের স্বধর্ম্ম যে আর্য্যধর্ম্ম এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। সভ্যতা হচ্ছে মনের বস্তু। সুতরাং এ কথা যদি সত্যও হয় যে, প্রাচীন আর্য্যদের সঙ্গে বাঙালীর রক্তের সম্পর্ক এক পাই, তাহলেও আর্য্যসভ্যতার সঙ্গে বাঙালী-হিন্দুর মনের সম্পর্ক পোনোরো-আনা-তিন-পাই। অতএব আমাদের পক্ষে আর্য্যত্বের দাবী করা অসঙ্গত নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জাতীয় মানবই হন, তাঁরা আর্য্যভাষা আর্য্যধর্ম্ম, আর্য্যআচার

এবং আর্য্যজ্ঞানের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং আমরা দেহে না হলেও মনে আর্য্যজাতির বংশধর। এ সত্যের উপর কোনও ethnologist হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

আমরা আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী এ কথা সত্য হলেও উক্ত সত্বে আমরা যা লাভ করেছি তার মূল্য কত তাও একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। আর্য্যসভ্যতা ভারতবর্ষে 'ফেল' করেছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমগ্র ভারতবর্ষে একটি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করতে পারেন নি—Legal হিসাবেও নয়, spiritual হিসেবেও নয়। এক মোটামুটি শীল-গত ঐক্য ছাড়া তাঁরা অপর কোনও বিষয়ে ভারতবাসীদের ঐক্যসাধন করতে পারেন নি। বৈদিক orthodoxy-র সঙ্গে বাহ্য heresy-র সংঘর্ষের ফলে, এদেশে কোনও একটি গোটা আর্য্যধর্ম্ম গড়ে ওঠে নি;—নানা খণ্ড বিখণ্ডে তা বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এবং সেই সকল খণ্ডধর্ম্ম অনার্য্য আচার, অনার্য্য মনোভাবকে নিজের অন্তর্ভূত করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এক কথায় ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার evolution নয়, dissolution-এর দায় আমাদের উপরে এসে বর্ত্তেছে। আমরা যা পেয়েছি তা পূর্ণ সভ্যতা নয়—চূর্ণ সভ্যতা। ভারতবাসী এখন অগণ্য সম্প্রদায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে এবং আচারে বিচারে এই সকল খণ্ডসমাজ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ফলে কে যে হিন্দু, তা আমরা জানি, অথচ হিন্দুত্বের সামান্য লক্ষণ এবং ধর্ম্ম যে কি তা কেউ বলতে পারেন না। অর্থাৎ ইংরাজি লজিকের ভাষায় বলতে হলে, হিন্দু শব্দের denotation আছে connotation নেই। এই অনৈক্যের মধ্যে কোথাও একটা ঐক্য আবিষ্কার করবার আকাঙ্ক্ষাও আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তিবশত,

যে-ঐক্য বর্ত্তমানে নেই সেই-ঐক্য আমরা ভারতবর্ষের অতীতে অনুসন্ধান করি। কিন্তু এ অনুসন্ধান নিষ্ফল; কেননা সে-কালেও ভারতবাসীরা আর্য্যে অনার্য্যে জড়িয়ে একটি বিরাট পুরুষ হয়ে উঠতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, এদেশে অতীতে শান্তি ছিল না; যা ছিল তা হচ্ছে লড়াই। দেশে দেশে, রাজায় রাজায়, জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, যুগে যুগে যে লড়াই চলেছিল, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন, প্রশস্তি প্রভৃতি একবাক্য এই-কথারই সাক্ষ্য দেয়। সেকালে বাহুবল বলো, বুদ্ধিবল বলো সকলই পরস্পরের হিংসার কার্য্যে অপব্যয় করা হয়েছে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এ কথা হচ্ছে ভারতবর্ষের পীড়িত ব্যথিত হৃদয়ের কাতরোক্তি। কিন্তু এ কথার উপর একটি জাতীয় সভ্যতা গড়ে তোলা যায় না, কেননা এ শুধু নিষেধ বাক্য। বিশ্বের অন্তরে একটি অনাদি অনন্ত "হাঁ"র চেহারা না দেখলে মানুষ বাড়া দূরে থাক, বাঁচতেও পারে না। সুতরাং বৈদিক-ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতার প্রতিবাদ স্বরূপে বৌদ্ধ জৈন চার্ব্বাক প্রভৃতি মতের সার্থকতা আছে, কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের শক্তিতে তা বঞ্চিত; কেননা ও-সকল ধর্ম্ম বিশ্বের অন্তরে শুধু একটি অনাদি অনন্ত "না"র মূর্ত্তি দেখতে পায়। নাস্তিকতা শূন্যবাদ স্যাদ্-বাদ প্রভৃতি, heresy হিসেবেই, মানব-সমাজের দেহ ও মনের পক্ষে বলকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। কিন্তু ভারতবর্ষের কপালের দোষে তার এমন দিনও গিয়েছে যখন এই ঔষধই তার পথ্য হয়ে উঠেছিল।

সে যাই হোক, জাতীয়সভ্যতা গঠন করবার শক্তি একমাত্র

বৈদিকধর্ম্মেই ছিল, কেননা, সে ধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব এবং রাজসিক। Religion, Morality এবং Law বৈদিকধর্ম্মে এ তিনের কোনটিই উপেক্ষিত হয় নি। এ ধর্ম্ম-মতে ব্যক্তি এবং সমাজ, ইহলোক এবং পরলোক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষে এক-ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র এই ধর্ম্মেরই ছিল। তবে যে, বৈদিক-আর্য্যেরা আর্য্যসভ্যতার ঐক্যস্থাপন করতে অক্ষম হয়েছিলেন, তার একটি কারণ, তাঁদের অভিজাত্যের অহঙ্কার; আর-একটি —তাঁদের জ্ঞাতিবিরোধ। ভারতবর্ষের মানসিক রাজ্যেও কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। কি দৈহিক কি মানসিক উভয় বলেই আর্য্যেরা অনার্য্যদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং অনার্য্যদের উপর নিজেদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভুত্ব-স্থাপন করা এঁদের পক্ষে অতিসহজ ছিল। এর ফলে সাংসারিক এবং মানসিক—এ উভয়ক্ষেত্রেই একাধিপত্য করবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর এঁদের মনে এত প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, কোন-রূপ বাহ্যআচার কিম্বা বাহ্যমতের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করা এঁদের ধাতে ছিল না। বৈদিক-ধর্ম্ম দ্বিজ-সর্ব্বস্ব এবং ব্রাহ্মণ-প্রধান। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রের ত কথাই নেই, বেদান্তের জ্ঞানেও শূদ্রের অধিকার নেই। এ ধর্ম্মের সঙ্গে বাহ্যধর্ম্ম সকলের সর্ব্ব-প্রধান প্রভেদ এই যে, সে-সকল ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের স্থান নেই এবং তাতে শূদ্র যবন সকলেরি অধিকার ছিল। সুতরাং বেদধর্ম্ম এবং বাহ্যধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু হয়ে উঠেছিল। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এই দুই শত্রুপক্ষের যুগ যুগান্তরের লড়ালড়িই ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতার অধঃপতনের প্রথম কারণ।

তার পর, এই বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তরেও এমন বিরোধ ছিল যে, তার সমন্বয় করে তাকে এক-ধর্ম্মে পরিণত করাও সেকালে সম্ভবপর হয় নি। এই বিরোধের কারণ এই যে, এ ধর্ম্ম অপৌরুষেয়; অর্থাৎ নানান মুনির নানান মতের নামই শ্রুতি। কোনও বিশেষ পুরুষকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে মতের ঐক্য থাকে, কেননা তা এক ব্যক্তিরই মত। প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ-ধর্ম্মে কর্ম্ম এবং জ্ঞান পরস্পর পৃথক হয়ে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গ অবলম্বন করলে। আত্মা গমন করলেন অরণ্যে, আর দেহ পড়ে থাকল গৃহে। এর ফলে জীবন আত্মা-হীন এবং আত্মা নির্জীব হয়ে পড়ল! দেহ ও আত্মা একবার পৃথক হয়ে গেলে তাদের পুনর্ব্বার সমন্বয় করা মানুষের সাধ্যের অতীত। বেদপন্থীরা এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা কখনও করেন নি। বরং তাঁরা নিজের নিজের কোট বাজায় রাখবার জন্য নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতের মীমাংসা করতেই ব্যস্ত ছিলেন। এ মীমাংসার উদ্দেশ্য—স্বপক্ষের বিরোধের সমন্বয় করা। কর্ম্ম এবং জ্ঞান, এ উভয় কাণ্ডেই নেতি নেতি করে মীমাংসা করে' হয়েছিল। ফলে ইতি দাঁড়াল এই যে—ব্রহ্মবাদ শূন্যবাদের কোঠায় এবং মন্ত্রাত্মক দেবতাবাদ নাস্তিকতার কোঠায় গিয়ে পড়ল; অর্থাৎ একদিকে থাকল--ভক্তিহীন ক্রিয়াহীন জ্ঞান, আর-একদিকে থাকল—জ্ঞানহীন ভক্তিহীন ক্রিয়া। এ জ্ঞান এবং এ ক্রিয়া দুই-ই চলৎ-শক্তি রহিত; কেননা এর ভিতর ভক্তি নেই অর্থাৎ মানব হৃদয় নেই, অতএব রক্তের চলাচল নেই। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের আর্য্যসভ্যতার গতি স্থগিত হয়ে যাবার অপর কারণ।

সুতরাং আমরা উত্তরাধিকারী-সত্ত্বে যা লাভ করেছি তা হচ্ছে

আর্য্যসভ্যতার ভাঙা ঘর। সেই ঘরে কায়-ক্লেশে মনের সুখে বাস করাতে আর্য্য-মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয় না। আমরা যদি বৈদিক আর্য্যদের আত্মার উত্তরাধিকারী হতুম তাহলে সভ্যতার যে-ঘর মাথা-ভারি হওয়ার দরুণ অর্দ্ধেক না উঠতেই ভেঙ্গে পড়েছে, সেই-ঘর আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করতুম, এবং তার জন্য দরকার—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের জীবনে সমন্বয় করা,—দর্শনে নয়। মীমাংসা-দর্শনের পথ সব চোরাগলি, তার ভিতর একবার প্রবেশ করলে, মীমাংসকেরা যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তার থেকে এক-পা'ও বেশি অগ্রসর হবার যো নেই,—জীবনে ফিরে আসবারও কোনও উপায় নেই। বৈদিক এবং বাহ্যধর্ম্ম সকলের সমন্বয় খালি এক ক্ষেত্রে হতে পারে এবং সে ক্ষেত্রের ইংরাজি নাম metaphysical nihilism.

আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মসকলের নবীন-সমন্বয়কারীরা আশা করি এই কথাটি মনে রাখবেন।

ফাল্গুন, ১৩২২ সন।

ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ-পরিচয়।

(রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত)

—:০:—

আমি আপনাদের সুমুখে ফরাসী-সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে প্রস্তুত হয়েছি, এ সংবাদ শুনে আমার কোন শুভার্থী বন্ধু অতিশয় ব্যতিব্যস্তভাবে আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন যে, "তুমি ফরাসী-সাহিত্য সম্বন্ধে এত কম জানো যে, আমি ভেবে পাচ্ছিনে কি ভরসায় তুমি এ কাজ করতে উদ্যত হয়েছ ?" আমি উত্তর করি, "এই ভরসায় যে, আমার শ্রোতৃমণ্ডলী এ বিষয়ে আমার চাইতেও কম জানেন।"

এ কথা স্বীকার করতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, ফরাসী-সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি যৎসামান্য ; কেননা সে সাহিত্য এত বিপুল ও এত বিস্তৃত যে, তার সম্যক পরিচয় লাভ করতে একটি পূরো জীবন কেটে যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হতে আরম্ভ করে অদ্যাবধি এই ন'শ' বৎসর ধ'রে ফরাসীজাতি অবিরাম সাহিত্য সৃষ্টি করে' আসছে। সুতরাং ফরাসী-সরস্বতীর ভাণ্ডারে যে ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রয়েছে, তার আদ্যোপান্ত পরিচয় নেবার সুযোগ এবং অবসর আমার জীবনে ঘটে নি। এর যে অংশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, সে হ'চ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্য। প্রাচীন ফরাসী-সাহিত্যের উদ্যানে আমি শুধু পল্লব গ্রহণ করেছি। কিন্তু এই

স্বল্পপরিচয়ের ফলেই আমার মনে ফরাসী-সভ্যতার প্রতি একটি আন্তরিক অনুরাগ জন্মলাভ করেছে। সে সাহিত্যের এমন একটি মোহিনীশক্তি আছে যে, যিনিই তার চর্চ্চা করেন তাঁরই মন ফরাসী-সভ্যতার প্রতি একান্ত অনুকূল হয়। যিনিই ফরাসী-সাহিত্য ভালবাসেন তিনিই ফরাসীজাতির সুখের সুখী ব্যথার ব্যাথী হ'য়ে ওঠেন। আজকের দিনে ফ্রান্স তার জাতীয় জীবনের অণু পরমাণুতে যে অত্যাচারের-বেদনা অনুভব ক'রছে, আমরাও তার অংশীদার। জর্ম্মানীর দেহবলের নিকট ফ্রান্সের আত্মবল, জর্ম্মানীর যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়, যদি এই যুদ্ধে ফরাসীসভ্যতা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়, তাহ'লে ইউরোপের মনোজগতের আলো নিবে যাবে। কি গুণে ফ্রান্স অপর জাতির ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ ক'রতে পারে, সে বিষয়ে সুবিখ্যাত মার্কিন নভেলিষ্ট Henry James-এর কথা নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"Our heroic friend sums up for us, in other words, and has always summed up, the life of the mind and the life of the senses alike, taken together, in the most irrepressible freedom of either, and, after that fashion, positively lives for us, carries on experience for us. * *

She is sole and single in this, that she takes charge of those of the interests of man which most dispose him to fraternise with himself, to pervade all his possibilities and to taste all his faculties, and in consequence to find and to make

the earth a friendlier, an easier, and specially a more various sojourn. * *

She has gardened where the soil of humanity has been most grateful and the aspect, so to call it, most toward the sun, and there at the high and yet mild and fortunate centre, she has grown the precious, intimate, the nourishing, finishing things that she has inexhaustively scattered abroad.

এই কথাগুলি যেমন সুন্দর তেমনি সত্য।

ইহ-জীবনে আমাদের দেহমনের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। এই সত্যের উপরই ফরাসী-সাহিত্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। ফরাসীজাতি চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়েও দেয় নি, অকিঞ্চিৎকর বলে'ও উপেক্ষা করে নি; সুতরাং ফরাসী-সাহিত্যের ভিতর Science এবং Art এর একত্রে সাক্ষাৎলাভ করা যায়। Henry James বলেছেন যে, ফরাসীজাতি বিশেষ ক'রে সেই সকল মনোভাবের অনুশীলন করেছেন, যাতে করে' মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা জন্মায়। এই গুণেই ফরাসী-সভ্যতা পরকে আপন করতে পারে। ফরাসী-সাহিত্য প্রধানত মানবমনের সাধারণ ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলেই তা সর্ব্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্ব্বলোক-প্রিয়। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ফরাসী-সভ্যতার এই বীজমন্ত্র

* The Book of France, Macmillan & Co. (1915).

কোনও ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আপনারা সকলেই জানেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সকল ফরাসী দার্শনিক বিশ্বমৈত্রীর বার্ত্তা ঘোষণা করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই নাস্তিক ছিলেন। মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরেই ফরাসী-মনোভাব প্রতিষ্ঠিত, এবং সে মনোভাব প্রধানত ফরাসী-সাহিত্যই গঠিত ক'রে তুলেছে। Henry James বলেছেন যে, ফরাসী-মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, ফরাসী-মন স্বভাবতই তা দেখতে চায় না; এর ফলে যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট, যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়, সে মনোভাবের, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসী-সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যায় না। সরস্বতীদর্শনের কাল, ফরাসী-কবিদের মতে গোধুলি-লগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসী-সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপর পক্ষে এই আলোক-প্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই। আমরা "স্পষ্টভাষী" শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, সে অর্থে এ সাহিত্য স্পষ্টভাষী নয়। যিনি দিবারাত্র অপরকে অপ্রিয় কথা বলতে ব্যস্ত, এদেশে আমরা তাঁকেই স্পষ্টবক্তা বলি,—ভাষায় যাকে বলে ঠোঁটকাটা। ফরাসী-সাহিত্য কিন্তু ঠোঁটকাটা-সাহিত্য নয়। ফরাসীজাতির ক্ষাত্রধর্ম্ম জগৎবিখ্যাত। ফরাসী লেখকেরা বাকযুদ্ধেও সভ্যতার আইন-কানুন মেনে চলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরা ধর্ম্মযুদ্ধের পক্ষপাতী। ফরাসীজাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণ হাসির যে কি মর্ম্মভেদী

শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুকাটব্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক। যার হাতে তরবারি আছে, সে লগুড় ব্যবহার করে না। Voltaire-এর হাসির যে বিশ্বজয়ী শক্তিছিল, তার তুলনায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল Jeremiah-র উচ্চবাচ্য যে ব্যর্থ, এ সত্য পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে।

ফরাসী-সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিম্বা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার করে' বলাই হচ্চে ফরাসী-সাহিত্যের ধর্ম্ম। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, ফরাসী-সাহিত্যের ভিতর Science এবং Art, দুই-ই আছে। ফরাসী-মনের এই প্রসাদ-গুণপ্রিয়তার ফলে, সে দেশের দর্শন বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ফলিয়ে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসী-লেখকেরাই দিতে পারেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চ্চাতেও ফরাসী-পণ্ডিতদের সামাজিক-বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না। প্রকৃত দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য সত্য আবিষ্কার করতে ব্রতী হন না। মানবজাতির নিকট সত্য প্রকাশ ও প্রচার করাই তাঁর সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা' পরিষ্কার করে' অপরকে দেখিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া, যা' জটিল তাকে সরল করা, যা' কঠিন তাকে সহজ করা, তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এক কথায় scientist-এর পক্ষে artist, জ্ঞানীর পক্ষে গুণী হওয়া আবশ্যক। জর্ম্মান-পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা ক'রলেই দেখা যায় ফরাসী-পণ্ডিতেরা কত শ্রেষ্ঠ গুণী। জর্ম্মান

পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম করে' যা' প্রস্তুত করেন তা' অধিকাংশ সময়ে বিদ্যার গ্যাস বই আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে ফরাসী-পণ্ডিতেরা মানবজাতির চোখের সুমুখে যা ধরে দেন, সে হচ্ছে গ্যাসের আলো। বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক Bergson-এর গ্রন্থসকলের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, সে সকল গ্রন্থ কাব্য হিসাবেও সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে। Bergson-এর দর্শন অতি কঠিন, কিন্তু তাঁর রচনা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি উজ্জ্বল। দার্শনিক জগতের এই অদ্বিতীয় শিল্পীর হাতে গদ্য রচনা অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। মণিকার যেমন রত্নের সঙ্গে রত্নের যোজনা করেন, Bergson-ও তেমনি পদের সঙ্গে পদের যোজনা করেন। চিন্তারাজ্যের এই ঐন্দ্রজালিকের লেখনীর মুখে বশীকরণ মন্ত্র আছে। এই স্বচ্ছতা, এই উজ্জ্বলতার বলেই ফরাসী-সাহিত্য যুগে যুগে ইউরোপের অপরাপর সাহিত্যের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার করেছে। আলোর ধর্ম্ম এই যে, তা দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে এবং সকল দেশকেই নিজের কিরণে উদ্ভাসিত করে' তোলে। এই কারণেই আমি পূর্ব্বে বলেছি, ফরাসী-সভ্যতার নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের মনোজগতের আলো নিবে যাবে।

(২)

এ স্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, "ফরাসী-সভ্যতার অধঃপতন হ'লেও তার পূর্ব্ব কীর্ত্তি সবই বিশ্বমানবের জন্য সঞ্চিত থাকবে; অতএব সে সভ্যতার বিনাশে পৃথিবীর এমন কি ক্ষতি হবে"? এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব, "এতে

পৃথিবীর যে ক্ষতি হবে তা' ইউরোপের অপর কোনও জাতি পূরণ করতে পারবে না"। এ মতের স্বপক্ষে হেনরি-জেমস্-এর আর একটি কথা উদ্ধৃত করে' দিচ্চি। তিনি বলেন যে, ফরাসী-ইতিহাস ও ফরাসী-সাহিত্য বিশ্ব-মানবকে এ আশা ক'রতে শিখিয়েছে যে, ফরাসী-সভ্যতা যুগে যুগে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, এবং এ আশা ভঙ্গ করলে ফ্রান্সের পক্ষে মানবজাতির নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাঁর নিজের কথা এই—

"And we have all so taken them from her so expected them from her as our right, to the point that she would have seemed positively to fail of a passed pledge to help us to happiness if she had disappointed us, this has been because of her treating us to the impression of genius as no nation since the Greeks has treated the watching world and because of our feeling that genius at that intensity is infallible."

সম্প্রতি কোনও কোনও জর্ম্মান-প্রফেসার বর্ত্তমান জর্ম্মান-জাতির পক্ষ থেকে প্রাচীন গ্রীক জাতির genius-এর উত্তরাধিকারের দাবী করেছেন; কিন্তু এ দাবী উক্ত জর্ম্মান-প্রফেসার সম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোন জাতিই মঞ্জুর করেন নি। অপর পক্ষে ফরাসীজাতির genius যে অদম্য, Von Bulow প্রভৃতি জর্ম্মান রাজমন্ত্রীরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

Genius শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য হ'চ্ছে প্রতিভা। কিন্তু এই প্রতিভা শব্দের অর্থ নিয়ে বিষম মতভেদ আছে। সংস্কৃত

আলঙ্কারিকদের মতে প্রতিভার অর্থ নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। এ অর্থে ফরাসীজাতি যে অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী, তার প্রমাণের জন্য বেশি দূর যাবার দরকার নেই। গত শত বৎসরের ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে নি। এই একশ' বৎসরের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স বারম্বার পীড়িত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, অথচ এই অশান্তি, এই উপদ্রবের ভিতরও, ফ্রান্স মানবজীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Pasteur এবং দর্শনের ক্ষেত্রে Bergson যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। আর সাহিত্য ক্ষেত্রে Hugo এবং Musset, Gautier এবং Verlaine প্রমুখ কবির, Renan এবং Taine প্রমুখ সমালোচকের, Stendhal এবং Balzac, Flaubert এবং Maupassant, Loti এবং Anatole France প্রমুখ উপন্যাসকারের, Rostand এবং Brieux প্রমুখ নাটককারের নাম ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে কার নিকট অবিদিত? এঁরা সকলেই কাব্যজগতের নব পথের পথিক—নব বস্তুর স্রষ্টা। এবং এঁদের রচিত সাহিত্য যতই নতুন হোক—এক ফ্রান্স ব্যতীত অপর কোনও দেশে তা' রচিত হ'তে পারত না, কেননা এ সকল কাব্যকথা আলোচনার ভিতর থেকে একমাত্র ফরাসী প্রতিভাই ফুটে উঠেছে। এ সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন হলেও বিজাতীয় নয়, পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগের ফরাসী-সহিত্যের সঙ্গে এর রক্তের যোগ আছে। ফরাসী-প্রতিভা যে কি পরিমাণে অদম্য,—দর্শনে বিজ্ঞানে, কাব্যে সাহিত্যে এই সকল নব কীর্ত্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অপর

পক্ষে জর্ম্মানীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা কি দেখতে পাই? ঊনবিংশ শতাব্দী, সাংসারিক হিসাবে, জর্ম্মানীর সত্য যুগ। এই শত বৎসরের মধ্যে জর্ম্মানী বাণিজ্যে ও সাম্রাজ্যে, বাহুবলে ও অর্থবলে অসাধারণ অভ্যুদয় লাভ করেছে। কিন্তু এই অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার কবি-প্রতিভা, তার দার্শনিক-বুদ্ধি অন্তর্হিত হ'য়েছে। গেটে, শিলার, কাণ্ট, হেগেলের বংশ লোপ পেয়েছে। সে দেশে এখন যা' আছে সে হ'চ্ছে ষষ্টি-সহস্র বালখিল্য প্রফেসার। এরা সকলেই জ্ঞানরাজ্যের মুটে মজুর —কেউ রাজা মহারাজা নয়।

(৩)

ফরাসী-সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম্মটি যে কি, আজকে এ সভায় আমি সংক্ষেপে তারই পরিচয় দিতে চাই।

বর্ত্তমান ইউরোপের দুটি সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য হ'চ্ছে ইংরাজি ও ফরাসী। ইউরোপের অপর কোন দেশের সাহিত্য, ঐশ্বর্য্যে ও গৌরবে, এই দুই সাহিত্যের সমকক্ষ নয়।

ইংরাজি-সাহিত্যের সহিত আমাদের সকলেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং ইংরাজি-সাহিত্যের সহিত ফরাসী-সাহিত্যের পার্থক্যের পরিচয় লাভ ক'রতে পারলে আমরা ফরাসী-সাহিত্যের বিশেষত্বের সন্ধান পাব।

এক কথায় বলতে গেলে ইংরাজি-সাহিত্য Romantic এবং ফরাসী-সাহিত্য Realistic.

Realism এবং Romanticism বলতে ঠিক যে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে সাহিত্য-সমাজে বহুকালাবধি বহু তর্কবিতর্ক

চলে আসছে। কিছুদিন হল বাঙলা-সাহিত্যেও সে আলোচনা সুরু হয়েছে।

আজকের এ প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নেই, তবে সাহিত্যের এ দুই মার্গের মোটামুটি লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়।

Romantic-সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ এই যে তা subjective। রোমাণ্টিক কবি প্রধানত নিজের হৃদয়ের কথাই বলেন, নিজের সুখ দুঃখ, নিজের আশা নৈরাশ্য, নিজের বিশ্বাস সংশয়—এই সকলই হ'চ্ছে তাঁর কাব্যের উপাদান ও সম্বল। শুধু তাই নয়, খাঁটি রোমাণ্টিকের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব হচ্ছে জগতের সার সত্য। বাঙলার সর্ব্বপ্রথম কবি চণ্ডিদাসের কবিতা আগাগোড়া subjective, অপর পক্ষে সংস্কৃত কবিতা আগাগোড়া objective,—এক ভর্ত্তৃহরি ভিন্ন অপর কোনও সংস্কৃত কবি মানবহৃদয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে "অহং জানামি" এ কথা বলেন নি। সংস্কৃতের ন্যায় ফরাসী-সাহিত্যও প্রধানত objective, বাহ্যঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই ফরাসী-সাহিত্যের আসল কারবার; এক কথায় ফরাসীজাতির দিব্য-দৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। সে চোখ মানুষের ভিতর বাহির দুই সমান দেখতে পায়।

Romantic সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সে সাহিত্য আধ্যাত্মিক। আমাদের দর্শনে সত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—এক ব্যবহারিক আর এক তদতিরিক্ত। ফরাসী-সাহিত্যে এই ব্যবহারিক সত্যেরই আলোচনা ও চর্চ্চা হয়ে থাকে। যা' ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর যা' বুদ্ধির অগম্য—ফরাসী-সাহিত্যে তার বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। The

proper study of mankind is man—এই হ'চ্ছে ফরাসী-মনের মূল কথা। সুতরাং মানবসমাজ, মানবমন ও মানব-চরিত্রের জ্ঞানলাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসী-সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জ্ঞানলাভ ক'রতে হ'লে সামাজিক মানবের আচারব্যবহার লক্ষ্য করতে হয়, এবং সেই সঙ্গে সেই আচার ব্যবহারের আবরণ খুলে ফেলে তার আসল মনের পরিচয় নিতে হয়—তা'ও আবার সমগ্রভাবে নয়, বিশ্লেষণ করে', পরীক্ষা করে'। বৈজ্ঞানিক যে-ভাবে যে-পদ্ধতি অনুসরণ করে' জড়-বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করেন, ফরাসী-সাহিত্যিকেরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে', মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন। তাঁরা মানবজাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—মানবের কার্য্য কারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার করতে চান। এই কারণে Mol'ére-এর নাটক ফরাসী প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন। Moliére ধর্ম্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্ত্তি পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে খাড়া করে দিয়েছেন! কিন্তু এ সকল মূর্ত্তি দেখে মানুষের মনে ভয় হয় না, হাসি পায়। মানুষের ভিতর যা' কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই Moliére-এর চোখে পড়েছে, আর যা' তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন।

ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের তুলনা করলেই এ উভয়ের প্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষিত হবে। Shakespeare-এর Richard III, Iago প্রভৃতির পরিচয়ে দর্শকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। Shy-

lock আমাদের মনে যুগপৎ করুণা ও ঘৃণার উদ্রেক করে, King Lear-এর পাগলামি আমাদের মনকে বেদনা দেয়। Ariel আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ফরাসী কবিরা শুধু হাস্য ও করুণ, বীর ও মধুর রসের চর্চ্চা করেন। ইংরাজ-কবিদের ন্যায় তাঁরা ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত রসের রসিক ন'ন। ফরাসীজাতির ভিতর কোনও Shakespeare জন্মায় নি ও জন্মাতে পারে না। পাগল, প্রেমিক ও কবি যে একজাত, এ কথা কোনও ফরাসী-কবি বলেনও নি—স্বীকারও করেন নি। কেননা তাঁরা তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ও মার্জ্জিত বুদ্ধির উপরেই চিরকাল নির্ভর করে এসেছেন। ফরাসী-জাতির দেহে কিম্বা মনে কোনও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিনকালেও তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এই কারণে ফরাসী কবিতা ইংরাজি কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত। সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না।

(৪)

অপর পক্ষে এই সচেতন সচেষ্ট মনের উপর নির্ভর করায় ফরাসী-গদ্যসাহিত্য যে শক্তি ও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে ইংরাজি-গদ্যসাহিত্যে সে শক্তি সে তীক্ষ্ণতা নেই। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের মন সামাজিক, সুতরাং ব্যবহারিক সত্যের সঙ্গেই তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। সেই পরিচিত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলে' মানবমনের নিকট ফরাসী-সাহিত্য এত সহজ-বোধ্য, এত বহুমূল্য। ইংরাজি কবিতা মানুষের মনকে

উত্তেজিত, উদ্দীপিত করে, সে-মনকে জ্ঞানবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করিয়ে কল্পনার স্বপ্ন-রাজ্যে নিয়ে যায়—কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। সে কবিতার মোহ আমাদের মনকে চিরদিনের মত অভিভূত করে রাখতে পারে না, আমরা আবার এই মাটির পৃথিবীতে দিনের আলোয় ফিরে আসি। এ কবিতার রেশ যে মনের উপর থেকে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং তার ফলে আমাদের হৃদয়মন যুগপৎ গভীরতা ও উদারতা লাভ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ সামাজিক মনই আমাদের চিরদিনের মন, আর ঐ বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের চিরজীবনের সহায়। ফরাসী-সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য মানুষকে দেবতা হিসাবে নয়—মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করে। অতএব সে সাহিত্য আমাদের মনে মানুষের প্রতি ভক্তির না হোক প্রীতির উদ্রেক করে—কেন না তার চর্চ্চায় আমরা স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে শিখি, এবং সেই সঙ্গে আমরা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হামবড়ামি, মানসিক আলস্য ও জড়তা, হয় পরিহার করতে নয় গোপন করতে শিখি। ফরাসী-সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়—সুসভ্য করে তোলে। ফরাসী-সাহিত্য সকল প্রকার মিথ্যার সকল প্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসী-মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা সে সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ। এই কারণেই ফরাসী-প্রতিভা, ইতিহাসে, জীবন চরিতে, সামাজিক উপন্যাসে এত ফুটে উঠেছে। এবং এই একই কারণে ফরাসী-সমালোচকদের তুল্য সমালোচক পৃথিবীর অপর কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করে নি। এবং ফরাসী-সমালোচনার বিষয় কেবলমাত্র সাহিত্য নয় সমগ্র মানবজীবন। ধর্ম্মনীতি,

রাজনীতি, সমাজ, সভ্যতা এ সকলই ফরাসীজাতির হস্তে যুগে যুগে পরীক্ষিত হয়ে আসছে।

অনেকের ধারণা যে Zola-র নভেলই হচ্ছে ফরাসী Realism-এর চূড়ান্ত উদাহরণ। এ কথা সত্য যে, সত্যের অনুসন্ধানে মনোরাজ্যের হেন দেশ নেই, যেখানে ফরাসী-লেখকেরা যেতে প্রস্তুত নন, সে দেশ যতই অপ্রীতিকর ও যতই অসুন্দর হোক এবং সত্যের খাতিরে হেন কথা নেই, যা তাঁরা বলতে প্রস্তুত নন, সে কথা যতই অপ্রিয় যতই অবক্তব্য হোক, কিন্তু আমি Realism শব্দ Zola-র অনুমত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করি নি। লোকে সচরাচর যাকে Idealism বলে থাকে তাও আমরা ব্যবহৃত Realism শব্দের অন্তর্ভূত। মানব মন, মানব জীবনের উপর আলো ফেলে যা দেখা যায় তাই হচ্ছে ফরাসী-সাহিত্যের বিষয়। বলা বাহুল্য, সে আলোয় অনেক সুন্দর অনেক কুৎসিৎ অনেক মহৎ অনেক ইতর মনোভাব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। যা হেয় তাও যেমন সত্য, যা উপাদেয় তাও তেমনি সত্য। এর ভিতর কোন শ্রেণীর সত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা লেখকের ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং Idealism এবং Realism সাহিত্যে সাহিত্যে পাশাপাশি দেখা দেয়। ফরাসী লেখকেরা মানবের অন্তরে এমন এক একটি মূল প্রবৃত্তির আবিষ্কার করতে চান, অপর প্রবৃত্তিগুলি যার বিবাদী সম্বাদী অনুবাদী সুর মাত্র। সুতরাং একই মনোভাব থেকে ফরাসী-সাহিত্যে মানবের Idealistic এবং Realistic উভয় চিত্রই অঙ্কিত হ'য়ে থাকে। প্রাচীন ফরাসী-সহিত্যে মানব সমাজের Idealistic চিত্র বিরল নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাবে Zola প্রভৃতি Realist গণ

যে অতিমাত্রায় কদর্য্যতার চর্চ্চা করেন, সে কতকটা Victor Hugo প্রভৃতি Romantic লেখকদের প্রতিবাদ স্বরূপে। আর এক কথা, আমার সহিত যত ফরাসী লেখকের পরিচয় আছে, আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে এক Zola-র গ্রন্থই বিশেষরূপে ফরাসী-ধর্ম্মে বঞ্চিত। Zola-র রচনায় ফরাসী-সুলভ লিপি-চাতুর্য্য নেই। Zola-র মন সূর্য্যকরোজ্জ্বল নয়—সে মন নিশাচর। Zola মানুষকে দেবতা হিসেবে দেখেন নি, মানব হিসেবেও দেখেন নি—তাঁর চোখে আমরা সকলেই ছদ্মবেশী দানব।—প্রকৃত পক্ষে Zola ফরাসী লেখক নন, তিনি ছিলেন জাতিতে Italian.

(৫)

ফরাসী-সাহিত্যের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হ'চ্ছে, তার আর্ট। ফরাসী-সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন—

The one high principal which through so many generations, has guided like a star the writers of France, is the principle of deliberation, of intention, of a conscious search for ordered beauty, an unwavering, an indomitable pursuit of the endless glories of art.—*

---

* Landmarks in French Literature,
G. L. Strachey,
Home University Library.

এই আর্টের গুণেই ফরাসী রচনা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার ক’রে আছে।

এক কথায় এ আর্ট Romantic নয় Classical, কি কি গুণের কি কি লক্ষণের সদ্ভাবে রচনা আর্ট হয়, সে বিষয়ে ফরাসীজাতির মত নিম্নে বিবৃত করছি। ফরাসী রচনার রীতির পরিচয় দেবার পূর্ব্বে ফরাসী-ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক—কেননা ভাষার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এত ঘনিষ্ঠ যে একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, সকল দেশের জাতীয়সাহিত্যের রূপগুণ সেই দেশের ভাষার শক্তির উপর নির্ভর করে। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয়সাহিত্য রচিত হবার বহু পূর্ব্বে জাতীয়ভাষা গঠিত হয়। যুগ যুগান্তরের আত্ম-প্রকাশের চেষ্টার ফলে একটি জাতীয়ভাষা গড়ে ওঠে এবং সেই ভাষার অঙ্গে জাতীয় মনের ছাপ থেকে যায় এবং তার অন্তরে জাতীয় চরিত্র বিধিবদ্ধ হয়ে থাকে।

বাঙলা-ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত-ভাষার যে সম্বন্ধ, ল্যাটিন-ভাষার সঙ্গে ফরাসী-ভাষার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ ফরাসী ল্যাটিনের অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত। ফরাসী ভাষার শব্দ সমূহ ল্যাটিন হতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় যাকে তদ্ভব বলে, ফরাসী অভিধানের প্রায় সকল শব্দই সেই শ্রেণীভুক্ত—এ সকলই ল্যাটিনের তদ্ভব। এ ভাষায় দেশী এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা এত অল্প যে তা নগণ্য স্বরূপে ধরা যেতে পারে। ফরাসী-ভাষা মূলত এক হওয়ার দরুণ, এ ভাষার ভিতর এমন একটি ঐক্য ও সমতা আছে যা রচনার একটি বিশেষ রীতি গড়ে’ তোলার পক্ষে একান্ত অনুকূল। ইংরাজিভাষা

ঠিক এর বিপরীত। Anglo-Saxon এবং Norman French এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে বর্ত্তমান ইংরাজি ভাষার উৎপত্তি। এর ফলে সে ভাষার অন্তরে বৈচিত্র্য আছে, সমতা নেই। ইংরাজি রচনার যে, কোনও একটি বিশিষ্ট রীতি নেই, ইংরাজি ভাষার বর্ণ-সঙ্করতা তার অন্যতম কারণ। ইংরাজি লেখকেরা যে প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারে রচনার স্বতন্ত্র রীতি গড়ে' নিতে পারেন, তার প্রচুর এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ এক উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি-সাহিত্য হ'তে পাওয়া যায়। Carlyle এবং Newman, Ruskin এবং Mathew Arnold, Thackeray এবং Meredith, Wordsworth এবং Shelley, Tennyson এবং Browning—একই যুগে এই সকল বিভিন্নপন্থী লেখকের আবির্ভাব এক ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোন দেশে সম্ভব হ'ত না। উনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের Romantic এবং Realistic লেখকদের রচনার ভিতর এরূপ জাতিগত প্রভেদ নেই। ফরাসী-ভাষায় এরূপ বৈচিত্র্যের অবসর নেই। সুতরাং ফরাসী লেখকেরা যুগে যুগে রচনার বৈচিত্র্য নয়,—ঐক্যসাধন করে'—একটি আদর্শ রীতি গড়ে' তোলবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করেছেন, এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছেন। এই যুগ-যুগান্তরের সাধনার ফলে অধিকাংশ ফরাসী শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ ভাষার ব্যবহারে অশিক্ষিত পটুত্ব লাভ করবার জো নেই। আমাদের দেশের বাঁধা ঠাটের বাঁধা রাগিণীর মত, এ ভাষা গুণীব্যক্তির হাতেই পূর্ণ শ্রীলাভ করে, এবং তার মূর্ত্তি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। একটি বেপর্দ্দায় হাত পড়লে সুর যেমন আগাগোড়া বেসুরো হয়ে যায়, তেমনি একটি

অসঙ্গত কথার সংস্পর্শে ফরাসী রচনা আগাগোড়া অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। পরিমিত শব্দে স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করবার পক্ষে এ ভাষা যতটা অনুকূল, হৃদয়ের গভীর ও অস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নয়। এর ফলে গদ্য রচনার পক্ষে ফরাসী হচ্ছে ইউরোপের আদর্শ ভাষা।

ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু কেবলমাত্র উপাদানের গুণে কোন শিল্পই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না, যদি না তা' শিল্পীর হাতে পড়ে। আর তা' ছাড়া অন্যান্য শিল্পের উপাদানের সঙ্গে সাহিত্যের উপাদানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

পাষাণ কি ধাতু, বর্ণ কি স্বর, আমরা বাইরে থেকে যা' পাই তাই আমাদের গ্রাহ্য করে' নিতে হয়, কেননা ও-সকল বাহ্য জগতের বস্তু; আমরা তা' সৃষ্টি করি নি,—অতএব আমরা তার ধাতও বদলে দিতে পারি নে। কিন্তু ভাষা হ'চ্ছে আমাদেরই সৃষ্টি। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষদের নিকট যে ভাষা আমরা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ করি, তার অল্পবিস্তর রূপান্তর করা আমাদের সাধ্যের অতীত নয়। আমরা যা প'ড়ে পাই তা' চৌদ্দ আনা, তাকে ষোল আনা করা না করা, সে আমাদের হাত। বর্ত্তমান ফরাসী-ভাষা এবং প্রাচীন ফরাসী-ভাষা, এই দুই মূলত এক হলেও, এ দুইয়ের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। যুগের পর যুগের ফরাসী লেখকদের যত্নে ও চেষ্টায় এ ভাষা জাতীয় মনোভাব প্রকাশের এমন উপযোগী যন্ত্র হয়ে উঠেছে। ফরাসী ভাষার এ evolution আপনি হয় নি—এ উন্নতি, এ পরিণতির ভিতর ফরাসীজাতির সুবুদ্ধি ও সুরুচি, যত্ন ও অধ্যবসায়, এ সকলেরই সমান পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬)

যেদিন থেকে ফরাসীজাতির ধারণা হল যে, সাহিত্য রচনা করা একটি আর্ট, সেই দিন থেকে ফরাসী লেখকেরা কিসে রচনা সুগঠিত হয়, সে বিষয়েও পূরো লক্ষ্য রেখে আসছেন। কি যে আর্ট, আর কি যে আর্ট নয়, সে বিষয়ে অদ্যাবধি বহু মতভেদ আছে। সৌন্দর্য্যের অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দার্শনিক তর্কের আর শেষ নেই। তবে আমাদের সহজ মন এবং সাদা চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে, আমরা দেখতে পাই যে, আমরা যাকে বস্তুর রূপ বলি, তা' অনেক পরিমাণে তার আকারের উপর নির্ভর করে। অন্তত আমরা বাঙালীরা যা' কদাকার তাকে সুন্দর বলি নে। মানব মনের এই সহজ প্রকৃতির উপরেই ফরাসীজাতির রচনার আর্ট প্রতিষ্ঠিত। কিসে রচনার অঙ্গসৌষ্ঠব হয়, সে বিষয়ে ফরাসী মনীষীরা বহুবিচার করে' গেছেন, এবং সেই চিন্তা সেই বিচারের ফলে ফরাসী রচনা এত সাকার, এত পরিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে।

আমি প্রথমেই বলেছি যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ফরাসী-সাহিত্য জন্মলাভ করে। প্রথম তিন শত বৎসরের ফরাসী-সাহিত্য আর্টহীন; কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশিদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী যেমন আর্টহীন,—Roman de Roland, Roman de Rose প্রভৃতি ফ্রান্সের জাতীয় মহাকাব্যও সেইরূপ আর্টহীন। এই যুগের লেখকদের শব্দের নির্ব্বাচন ও পদের যোজনার প্রতি কোনই লক্ষ্য ছিল না।

তারপর খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতব্দীতে ফরাসীজাতি যখন প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যের পরিচয় লাভ করলে, তখন হতে লেখা জিনিষটে যে একটি আর্ট, এ বিষয়ে ফরাসী কবি এবং

ফরাসী গদ্য লেখকেরা সজ্ঞান হয়ে উঠল। এই Classic সাহিত্যের আদর্শ ফরাসী লেখকদের নিকট একমাত্র আদর্শ হয়ে উঠল এবং এই কারণেই Classicism হচ্ছে সে সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম।

(৭)

দুই উপায়ে ভাষার রূপান্তর করা যায়—এক, শব্দের যোগের দ্বারা, আর এক, বিয়োগের দ্বারা। ফরাসী লেখকেরা বর্জ্জনের সাহায্যেই ভাষার সংস্কার করেন। খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে Malherbe নামক জনৈক কবি এই ভাষা-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি প্যারি নগরীর মৌখিক ভাষাই সাহিত্য রচনার আদর্শভাষা স্বরূপে গণ্য করেন। কেননা সে ভাষার ভিতর এমন একটি ঐক্য, সমতা, প্রসাদগুণ এবং ভদ্রতা ছিল, যা' কোনও প্রাদেশিক ভাষার অন্তরে ছিল না। এই কারণে সাহিত্য হ'তে প্রাদেশিক শব্দসকল বহিষ্কৃত করে' দেওয়াই তাঁর মতে হ'ল ভাষা সংস্কারের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উপায়। Malherbe-এর মতে একদিকে যেমন প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহারে কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়, অপরদিকে সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও তেমনি কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়। এক কথায়, গ্রাম্যতা ও পাণ্ডিত্য—এই দুইই কাব্যের ভাষায় সমান বর্জ্জনীয়। কেননা সে যুগের ফ্রান্সের ভদ্র-সমাজের মতে, নিরক্ষর লোকের ভাষা ও পুঁথিগত বিদ্যার ভাষা, দুই সমান ইতর বলে' গণ্য হ'ত। দুয়ের ভিতর পার্থক্য এই যে, এর একটি লজ্জার, অপরটি হাস্যের উদ্রেক করে। এই মত

ফ্রান্সের লেখক সামাজে গ্রাহ্য হয়েছিল, কেননা তাঁদের মতে প্রাচীন ফরাসী-সাহিত্যের ভাষা এক ভাষা নয়—একটা যোড়া-তাড়া-দেওয়া ভাষা। এর ফলে Rabelais প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের পাঁচরঙা ভাষার পরিবর্ত্তে ফরাসী গদ্যের ভাষা একরঙা হয়ে উঠল।

উপাদান নির্ব্বাচন হচ্ছে শিল্পীর প্রথম কাজ, কিন্তু সেই উপাদানে মূর্ত্তি গঠন করাই তাঁর আসল কাজ। সুতরাং Malherbe-প্রমুখ সমালোচকেরা পদনির্ব্বাচনের ন্যায় পদ-যোজনার প্রতিও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা পদের সঙ্গে পদের যোজনা করে' বাক্য গঠন করি এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যোজনা করে' একটি কবিতা কিম্বা প্রবন্ধ রচনা করি। সুতরাং বাক্য এবং রচনা যাতে সুগঠিত হয়, সে বিষয়ে ফরাসী লেখকেরা এই যুগ থেকে আরম্ভ করে' অদ্যাবধি সমান মনোনিবেশ করে' আসছেন। এ গঠনে যাতে রেখার সুষমা থাকে, সামঞ্জস্য থাকে, রচনার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত হয়, এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ হয়, যাতে করে' একটি রচনা পূর্ণাবয়ব, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সমগ্র হয়ে ওঠে—এই হচ্ছে ফ্রান্সের সাহিত্য-শিল্পীর যুগযুগের সাধনার ধন। রচনার দেহে সুগঠিত করবার জন্য সকল প্রকার বাহুল্য বর্জ্জন করা আবশ্যক। যাঁরা রাগ আলাপ করেন, চিকারির ঝন্‌ঝনানি তাঁদের কানে অসহ্য। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে Beaulieu নামক বিখ্যাত সমালোচক বিশেষ করে' রচনার অমার্জ্জনীয় দোষের সম্বন্ধে সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। ভাষার কৃত্রিমতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার প্রভৃতি রচনার দোষের

প্রতি তিনি চিরজীবন ধরে' এমন তীক্ষ্ণ, এমন অজস্র বাণ বর্ষণ করেছিলেন যে, ফরাসী-সাহিত্য হতে সকল প্রকার অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধ পাণ্ডিত্য চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হয়েছে।

রচনাকে শব্দাড়ম্বরে গৌরবান্বিত, শব্দালঙ্কারে ঐশ্বর্য্যবান, পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগে মর্য্যাদাপন্ন, এবং বাচালতায় সমৃদ্ধি-শালী করবার লোভ সম্বরণ করা যে কি কঠিন, তা' লেখক মাত্রেই জানেন! ফরাসী লেখকেরা এই সংযম নিজেরা অভ্যাস করেন, এবং অপরকে অভ্যাস করতে শিক্ষা দেন। পূর্ব্বোক্ত ফরাসী আলঙ্কারিক কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সাহিত্যের ত্যাগমার্গ ফরাসী লেখকেরা যে কেন অবলম্বন করেছিলেন, তার একটু বিশেষ কারণ আছে। Pascal, La Bruyère, Bossuet, Fénèlon, Racine, Molière প্রভৃতি সে যুগের ফ্রান্সের প্রথম শ্রেণীর গদ্যপদ্য লেখক মাত্রেই Malherbe কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং Beaulieu কর্ত্তৃক পরিস্কৃত রচনার এই নব পথ অবলম্বন করেই সাহিত্য-জগতে অমর হয়েছেন। এঁরা যে বিনা আপত্তিতে এই নব আলঙ্কারিক মত গ্রাহ্য করেছিলেন, তার কারণ তাঁরা যে সকল মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, রচনার এই নবপদ্ধতি সে মনোভাব প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। সে যুগের ফরাসী মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় Descartes-এর দর্শনে পাওয়া যায়। সেই দর্শনে ফরাসী প্রতিভা তার আত্মজ্ঞান লাভ করে। আপনারা অনেকেই জানেন যে, যে আইডিয়া সুস্পষ্ট, পরিচ্ছিন্ন ও সুনির্দ্দিষ্ট, তাই হচ্ছে ডেকার্টের মতে সত্যের পরিচায়ক। অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের জাগ্রত বুদ্ধির আয়ত্ত্বাধীন, এবং যা ন্যায়শাস্ত্র-বিরুদ্ধ

নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। এবং Descartes-এর মতে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই এই শ্রেণীর সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ফরাসী লেখকেরা, মানবমনের ও মানব-চরিত্রের সেই সত্য আবিষ্কার করতে এবং প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা' জ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্ট হবে, যা' ন্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এক কথায়, তাঁরা Reason-কে দেবতা করে' তুলেছিলেন, এবং reasonable মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যে সুসংযত, সুসংহত এবং সুশৃঙ্খল ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? Reasonable মনোভাব reasonable ভাষায় ব্যক্ত করার দরুণ ফরাসী Classical লেখকেরা য়ুরোপের সাহিত্য-সমাজে সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণেই সে সাহিত্যের প্রভাব সমগ্র য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, এবং সকল জাতির মন বশীভূত করে। দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে Reason-এর কোনও ভেদ হয় না, ও-বস্তু সর্ব্বলোকমান্য। ঐ হচ্ছে মনের একমাত্র ক্ষেত্র, যেখানে সকল মনের মিলন হতে পারে। মানুষ যদি সমবুদ্ধি হয়, তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সাহানুভূতি জন্মাতে বাধ্য। এই কারণেই হেন্‌রি জেম্‌স্ বলেন যে, ফরাসী জাতি "lives for us"। এমন কি, Romantic England-ও এক শতাব্দীর জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে' এই ফরাসী-সাহিত্যের অধীনতা স্বীকার করেন। Addison এবং Pope, Locke এবং Hume, Gibbon এবং Goldsmith, সকলেই সাহিত্যের এই ফরাসী রীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর classicism, ফরাসী classicism-এর অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু নয়।

ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত এই রীতি একাধিপত্য করে। Voltaire-এর হাতে ফরাসী ভাষা এত লঘু আর এত তীক্ষ্ণ, এত চোস্ত এবং এত সাফ হয়ে উঠেছিল যে, তারপর সে রীতির আর ক্রমোন্নতি হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। Voltaire-এর ভাষাই তার চূড়ান্ত পরিণতি। ভাষার ধার এর চাইতে বাড়াতে গেলে, যে পরিমাণ শান দিয়ে তার দেহ ক্ষয় করতে হয়, তা'তে ভাষার দেহত্যাগ করতে হয়।

(৮)

অপর সকল গুণকে উপেক্ষা করে', একটিমাত্র গুণের অতিমাত্রায় চর্চ্চা করলে, কালক্রমে তা' দোষ হয়ে দাঁড়ায়। এই সুমার্জ্জিত ভাষা মানুষের চিন্তাপ্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, মানব হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আকুলতা, আশা ভয়, সংশয় বিশ্বাস প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশের জন্য তেমনি অনুপযুক্ত। ক্রমান্বয়ে ইতর গণ্যে শব্দের পর শব্দ বর্জ্জন করে' এ ভাষা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ ভাষায় কোনরূপ ছবি আঁকা অসম্ভব। কেননা, যে শব্দের গায়ে রং আছে, সে শব্দ এ সাহিত্যিক ভাষা হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল। যে শব্দের বস্তুর সঙ্গে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট, সেই শব্দই এ সাহিত্যে গ্রাহ্য হত। কিন্তু যে-শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি আছে, অর্থাৎ যার অর্থের অপেক্ষা অনুরণন (suggestiveness) প্রবল, সে-শব্দ এ সাহিত্যে উপেক্ষিত হত। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের পূর্ব্বসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ব্ব সাহিত্যের রীতিনীতিও মর্য্যাদাভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর

প্রথমভাগে নবীন ফ্রান্সে reason তার দেবত্ব হারিয়ে বসেছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের নূতন সাহিত্য Classicism-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে' সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই সাহিত্যই Romantic বলে' পরিচিত। Chateaubriand-এর প্রবর্ত্তক, এবং Victor Hugo-এর নায়ক। Classicism এর ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই এ সাহিত্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব। Reason-এর পরিবর্ত্তে কল্পনা, বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, ভাষা প্রয়োগে কৃপণতার পরিবর্ত্তে অজস্রতা,—Romantic সাহিত্যে এই সবই প্রাধান্য লাভ করেছিল। Romantic লেখকেরা, ইতর বলে' কোন শব্দকেই বর্জ্জন করেন নি,—এঁদের প্রসাদে একদিকে শত শত উপেক্ষিত, পতিত ও বিস্মৃত শব্দ, অপরদিকে শিল্পবিজ্ঞান হ'তে সংগৃহীত শত শত পারিভাষিক শব্দ সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করলে। আমাদের নব্য আলঙ্কারিক মতে—

"ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ।"—

রুদ্রট-ধৃত বচন।

ফরাসী নব্য আলঙ্কারিকদেরও এই একই মত। এর ফলে সাহিত্যের ভাষা আবার শব্দসম্পদে বিপুল ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠল। এই নতুন ভাষা হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, বাহিরের দৃশ্য অঙ্কনের জন্য তেমনি উপযোগী। এ Romantic সাহিত্য কিন্তু আসলে উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্য নয়। Victor Hugo, Musset প্রমুখ লেখকেরা মুখে অবাধ স্বাধীনতা প্রচার করলেও, কাজে আর্টের অধীনতা হতে মুক্ত

হন নি। এমন কি কোন কোন সমালোচকের মতে Victor Hugo ফরাসী-সাহিত্যের একজন অপূর্ব্ব শিল্পী। তাঁর প্রতি ছত্রে কারিগরের হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী Romanticism অনেকটা বস্তুগত। এক কথায় Hugo প্রমুখ কবিরা শুধু ভাষার পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করেছিলেন, কেননা Romantic মনোভাব এ জাতির মনে কখনই সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারে নি। মানুষের সমগ্র মন তার বুদ্ধির চাইতে ঢের বড়, এবং যুক্তিতর্কের অপেক্ষা অনুভূতি ঢের বেশি নির্ভরযোগ্য, এই বিশ্বাসের উপরই যথার্থ Romantic সাহিত্য দাঁড়িয়ে থাকে। এই দৃষ্ট বিশ্বের পিছনে একটি অদৃষ্ট বিশ্ব আছে, মানবমনের এমন একটি ধর্ম্ম আছে, যার গুণে এই নিগূঢ় বিশ্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়—এই হচ্ছে Romantic দর্শনের মূল কথা। আর যে বস্তু যুক্তিতর্কের সাহায্যে জানা যায় না, তা' যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে জানানো যায় না—তাই রোমানটিক কবিরা নিজে যা' অনুভব করেছেন, অপরকে তা' অনুভব করাতে চান। এ স্থলে ভাষার অর্থের চাইতে তার ইঙ্গিতের মূল্য ঢের বেশি।

ফরাসী রোমানটিক সাহিত্যের ভাষার প্রলেপ তুলে ফেললে দেখা যায় যে, তার ভিতরে Romanticism-এর খাঁটি মাল নেই।

Romanticism ফারাসী জাতির ধাতুগত নয়। সুতরাং ফরাসী মনের উপর এ জোর-করা সাহিত্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হল না। এই Romanticism-এর প্রতিবাদ স্বরূপেই France-এর নব realism জন্মগ্রহণ করে। কল্পনার পরিবর্ত্তে reason ফরাসী-সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরাসী

realist-রা তাদের জাতীয় বুদ্ধির অনুসরণ করে’ আবার সত্যের সন্ধানে বহির্গত হয়েছিল। এবং সে সত্য কুৎসিতই হোক আর বীভৎসই হোক, ফরাসী realist-রা তার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। Romantic দল ফরাসী সাহিত্যকে যা’ দান করে’ গিয়েছে, সে হচ্ছে অগাধ শব্দসম্পদ,—realist দের নেতা Flaubert সেই নূতন উপাদান নিয়েই পুরাতন রীতিতে সাহিত্য গঠন করেছেন। এর ফলে Flaubert এবং তাঁর শিষ্য Maupassant-র ন্যায় শিল্পী জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।

যে বিরাট সৌন্দর্য্যে মানুষের মনকে স্তম্ভিত, অভিভূত করে,—যে সৌন্দর্য্য অতিজগতের আলো ও ছায়ায় রচিত—সে সৌন্দর্য্য ইংরাজী-সাহিত্যে আছে, ফরাসী-সাহিত্যে নেই। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য্যে ফরাসী-সাহিত্য অতুলনীয়।

আমি ফরাসী-সাহিত্যের চর্চ্চায় যে আনন্দ লাভ করেছি, সে আনন্দের ভাগ আপনাদের দিতে পারলুম না, সুতরাং সে সাহিত্য হতে যে শিক্ষা লাভ করেছি তারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি যদি তাতে কৃতকার্য্য হয়ে থাকি, তাহলেই আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

(৯)

আমি চাই যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে ফরাসী-সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা হয়। আমার বিশ্বাস সে চর্চ্চার ফলে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

আমি বলেছি যে ইংরাজি-সাহিত্য মুখ্যত romantic, এবং ফরাসী-সাহিত্য মুখ্যত realistic। যে দুটি বিভিন্ন মনোভাব

থেকে এই দু'টি পৃথক চরিত্রের সাহিত্য জন্মলাভ করে—প্রতি জাতির মনে সে উভয়েরি স্থান আছে। কোন্ জাতি এর মধ্যে কোন্‌টির উপর ঝোঁক দেন, তার উপরেই জাতীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর করে।

প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের বাঙলা-সাহিত্যে দেখতে পাই দু'টি পৃথক ধারা বরাবর পাশাপাশি চলে' এসেছে—একটি সম্পূর্ণ subjective, অপরটি সম্পূর্ণ objective, যে বাঙালীজাতির মন থেকে বৈষ্ণব পদাবলী জন্মলাভ করেছে, সেই বাঙালীজাতির মন থেকেই কবিকঙ্কন চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল জন্মলাভ করেছে। সুতরাং Romantic এবং Realistic উভয় সাহিত্যই আমাদের হৃদয় মন সমান স্পর্শ করতে পারে। ইংরাজি-সাহিত্য যেমন আমাদের মনের একটি দিক ফুটিয়ে তুলেছে, আমাদের মনের আর একটি দিক আছে যা' ফরাসী-সাহিত্য তেমনি ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে যে কি সুফল জন্মেছে তা' সকলেই জানেন; কিন্তু সেই সঙ্গে যে কি কুফল জন্মেছে তা' সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়।

সঙ্গীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না—এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরাজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ। কেননা যে জাতির classics হচ্ছে সংস্কৃত, সে জাতির পক্ষে রচনার আর্ট সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া স্বাভাবিক নয়।

একটি ইংরাজ লেখক বলেছেন:—

"The amateur is very rare in French literature—as rare as he is common in our own"—*

ইংরাজি সাহিত্যের এই amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে' যা'হোক একটা-কিছু লিখে-ফেলার ভিতর কোনরূপ আয়াস নেই, কোনরূপ আত্মসংযম নেই।

ফরাসী-সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুই-ই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়, কেননা সংযম ব্যতীত, কি মনোজগতে, কি কর্ম্মজগতে, কোন বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ করা যায় না। সংস্কৃতে একটি কথা আছে যে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং"। রচনা সম্বন্ধে এই কৌশল লাভ করতে হলে, লেখকদের পক্ষে যোগ অভ্যাস করা দরকার, অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কোথাও বা হঠযোগ, কোথাও বা রাজযোগ। বাহুল্য আর ঐশ্বর্য্য, স্ফীতি আর শক্তি যে এক বস্তু নয়—এ সত্য ফরাসী-সাহিত্য মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

তারপর সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়েও উক্ত সাহিত্য আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, ভাষা সাহিত্যের উপাদান; কিন্তু এ কথা শুধু আংশিক ভাবে সত্য। আসল সত্য এই যে, লেখকদের নিকট ভাষা একাধারে উপাদন ও যন্ত্র। আমাদের দেশে সর্ব্ব শ্রেণীর শিল্পীরা বৎসরে অন্তত একবার যন্ত্র-পূজা করে' থাকে—একমাত্র একালের সাহিত্য-শিল্পীরাই তাঁদের যন্ত্রকে পূজা করা দূরে থাক, মেজে ঘসে পরিষ্কারও করেন না।

* G. L. Strachey.

ফরাসী-সাহিত্য আমাদের এই যন্ত্রকে লঘু করতে, তীক্ষ্ণ করতে শেখায়। এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা আমার বিশ্বাস বাঙলার সঙ্গে ফরাসী-ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলত এক, এবং বিদেশী শব্দে তা' ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসী-ভাষার গতি ও স্ফূর্ত্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ, জর্ম্মানের ন্যায় স্থূলকায়, গুরুভার, শ্লীপদ ও গজেন্দ্র-গামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকুল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসী-সাহিত্যের একটি masterpiece বলে' গণ্য হত।

আমরা যে ভাষায় এখন সাহিত্য রচনা করি, সে ভারত-চন্দ্রের ভাষা নয়, ইতিমধ্যে ইংরাজী-সাহিত্যের অনুকরণে আমরা সে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছি, অর্থাৎ তার গায়ে একরাশ মুখস্থকরা শব্দ চাপিয়ে তার ভার বৃদ্ধি করেছি—তার গতি মন্দ করেছি। ফরাসী সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের মনে বসে' গেলে আমরা আবার বহুসংখ্যক পণ্ডিতি শব্দকে সসম্মানে বিদায় করব, এবং তার পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক তথাকথিত ইতর শব্দকে সাহিত্যে বরণ করে' নেব। কেননা এই কৃত্রিম ভাষার চাপে আমাদের জাতীয় প্রতিভা মাথা তুলতে পারছে না।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩ সন।

সালতামামি।

—৹৹৹—

দেখতে দেখতে আর একটা বছর কেটে গেল; কিন্তু আমরা যেখানে ছিলুম, বোধহয় ঠিক সেইখানেই আছি। যদি কোনও দিকে কিছু বদল হয়ে থাকে ত সে এত আস্তে, এত সন্তর্পণে যে, সে পরিবর্ত্তন আমাদের চোখে পড়ে নি। জাতীয় জীবনে একটা চোখে-আঙ্গুল-দেওয়া ঘটনা না ঘট্‌লে, লোকের মনে হয় কিছুই ঘটে নি। মুখে যিনিই যা বলুন, সকলেই জানেন যে, জীবনেরও একটা স্রোত আছে; এবং যদি কোনও জাতির ভিতর সে স্রোত মরে এসে সমাজকে মরা গাঙ্গে পরিণত করে, তাহলে সে দৃশ্য দেখে মানুষে স্বতই মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

বছরের পর বছর মানবসমাজকে অল্পবিস্তর বাড়তেই হবে, প্রকৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে অবশ্য এমন কোনও বিধি নেই;—বরং সত্য-কথা এই যে, প্রকৃতির রাজ্যে, অর্থাৎ জড়জগতে, কোনও কিছু এগোয় না। এই ব্রহ্মাণ্ডে ছোটবড় যতরকম মৃৎপিণ্ড আছে, তাদের সবারই গতি আছে,—কিন্তু উন্নতি নেই। আমাদের এই পৃথিবীটে গত তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ যোজন ঘুরে, ঠিক যেখানে ছিল সেইখানেই ফিরে এসেছে। আকাশের গ্রহতারার এই চক্রাকারে ভ্রমণটা দাঁড়িয়ে থাকারই সামিল। আমরা কিন্তু প্রকৃতির হাতে গড়া হলেও, তার ধাতে গড়া নই। আমাদের মন বলে যে, জীবনের গতির একটা লক্ষ্য আছে; তাই আমরা ধরে নিই যে, জীবনের গতি একটা সরল রেখা ধরে

চলে—আর তার একটা অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান আছে। সে স্থানটা কারও মতে সুমুখের দিকে, কারও মতে উপরের দিকে —ও দুই-ই এক কথা। কেননা উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খাওয়াটা জীবনের ধর্ম্ম নয়।

প্রকৃতির চলনধরণের সঙ্গে প্রাণের হালচালের আর একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। প্রকৃতি চলে এক চালে, এক তালে, তার ভিতর ঠা দুন নেই, তাল-ফেরতা নেই। এই তিনশ' পঁয়ষট্টি দিনের ভিতর পৃথিবী প্রতিদিন ঠিক এক মাত্রায়, এক মাপে চলেছেন,—সে মাপের একচুলও এদিক ওদিক হয় নি। জীবনের চাল কিন্তু কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির গতির কোনও বিরাম নেই, কোনও বিশ্রাম নেই। প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তের জন্যও জিরতে জানেন না,—আমরা জানি। তাই আমরা ফাঁক পেলেই এ ক্ষমতার অপব্যবহার করি।

এই সব কারণে নববর্ষের প্রথম দিনে, মানুষের মনে নব আশার উদয় হয়। সে আশা অবশ্য অধিকাংশ স্থলে পূর্ণ হয় না ;—তবুও বছরের শেষ দিনে আমরা যখন বছরের কারবারের হিসেব নিকেশ করতে বসি, তখন যদি দেখি যে আমাদের নতুন খাতায় শূন্যের জের টেনে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমাদের পক্ষে মনমরা হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

গত এক বৎসরের ভিতর, আমাদের জাতীয় জীবনের জমার অঙ্ক যদি এক পয়সাও বেড়ে থাকে ত সে অলক্ষিতে বেড়েছে। প্রথমত আমাদের সমাজ অপরিবর্ত্তনীয়, দ্বিতীয়ত আমাদের ব্যবসাবাণিজ্যের বালাই নেই। সুতরাং আমাদের সমাজের পূর্ণতা আর আমাদের গৃহের শূন্যতা সমানই রয়ে গেছে। বাকী

রইল এক সাহিত্য, আর এক রাজনীতি। এ দুই ক্ষেত্রেও গত বৎসরে আমরা কোনও নূতন কৃতীত্বের পরিচয় দিই নি।

এদানিক আমরা লিখছি বেশি, কিন্তু বিশেষ কিছু লিখছি নে। আমাদের সাহিত্যগগনে নূতন কোনও নক্ষত্রের উদয় হয় নি, এ অন্ধকারের গায়ে যে-সব আলোর ছিটেফোঁটা এখানে ওখানে দেখা যায়—সে সব জোনাকির। বর্ত্তমান সাহিত্যরাজ্যে আমাদের যে কোনও কৃতীত্ব নেই—তা আমরা সকলেই জানি। আমরা যে তা জানি তার প্রমাণ, এ বিষয়ে আমরা শুধু অপরের কৃতীত্বের বিচার করতেই ব্যস্ত।

একজন নামী ইংরাজ লেখক বলেছেন যে, সাহিত্যরাজ্যে দুটি যুগ আছে। সে রাজ্যে নাকি সৃষ্টির যুগ আর সমালোচনার যুগ দিন রাত্তিরের মত পালায় পালায় যায় আর আসে। এ নিয়ম যে নৈসর্গিক, তার কোনও প্রমাণ নেই। মানুষের মনকেও যে পৃথিবীর দেহের মত প্রকৃতির নিয়মে ক্রমাগত ওলটপালট হতে হবে—এ কথা আমি মানি নে; কেননা মানুষের অন্তরে ইচ্ছাশক্তি আছে, প্রকৃতির অন্তরে নেই। তবুও তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে, সাহিত্যরাজ্যের একটা যুগ আছে যখন মানুষে সাহিত্য গড়ে, এবং তার পরের যুগে মানুষে সেই সাহিত্য পড়ে; কেননা সমালোচনার যুগেও, একমাত্র যুগধর্ম্মের বলে, সাহিত্য না পড়ে তার চর্চ্চা করা অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমানের সমালোচকদের লেখা পড়ে, তাঁরা যে কেউ কিছু পড়েন, তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা যথার্থ সাহিত্য, তার ধর্ম্মই হচ্ছে যে, তা নানা লোকের মনে নানারকমে ঘা দেবে। সুতরাং সমালোচনাটা যখন একঘেয়ে হয়ে ওঠে, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সমালোচকদের হয় পরের লেখার সঙ্গে, নয়

নিজের মনের সঙ্গে পরিচয় নেই। বর্ত্তমানের এই সমালোচনা-সাহিত্য খতিয়ে নিলে তুটি মোটা কথা পাওয়া যায়,—এক বঙ্কিমচন্দ্রের স্তুতিবাদ, আর এক রবীন্দ্রনাথের নিন্দাবাদ। কথা মুখে মুখে বেড়ে যায়, এবং এক পুনরাবৃত্তির গুণে এই নিন্দা-প্রশংসা একটা হট্টগোলে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে কে কার উপর টেক্কা দিতে পারেন, সমালোচকদের মধ্যে এই নিয়েই যা রেষারেষী। আমাদের সাহিত্য-আদালতে এখন জজ নেই—সব জুরি। এবং জুরির বিচারটা অবশ্য সরস্বতীর পক্ষে সুবিচার নয়। বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আসন যে কত উচ্চ, তা আমরা সকলেই জানি,—কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের সাহিত্যের ইভলিউসান বন্ধ হয়ে গিয়েছে—সমালোচকদের এ কথা আমরা মানিনে। বাঙলার প্রথম লেখক যে তাঁর শেষ লেখক—এ ত নৈরাশ্যের উক্তি। শুনতে পাই এই নিন্দাপ্রশংসার মূলে আছে জাতীয় অহংজ্ঞান ও পরজ্ঞান, আর সেই সঙ্গে আছে হিতবুদ্ধি ভূতবুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব থাকতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের নিন্দার ভিতর যা আদপেই নেই—সে হচ্ছে জ্ঞান ও বুদ্ধি। আমার মনে হয়, এই নিন্দাপ্রশংসার মূলকারণ এই যে—রবীন্দ্রনাথ আজও ইহলোকে আছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র নেই। আমরা জীবনকে আজও শ্রদ্ধা করতে শিখি নি।

তারপর রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়ে পড়েছি। এ যুগে বাঙলায় যেমন কোনও বড় লেখক জন্মান নি, তেমনি কোনও বড় বক্তারও আবির্ভাব হয় নি। এটা কম আপশোষের কথা নয়। এতদিন আমরা গলার জোরেই ভারতবর্ষের রাজ-নীতির আসর জমিয়ে রেখেছিলুম। কংগ্রেসে ও কাউনসিলে আমরাই ছিলুম মূল গায়েন,—বম্বে, মাদ্রাজ, পশ্চিম, পাঞ্জাব

এতদিন শুধু আমাদেরই দোহার দিয়ে এসেছে। আমরা যে ধূয়ো ধরিয়ে দিয়েছি—দেশসুদ্ধ লোক তাই ধরেছে। আমরাই বাকী ভারতবর্ষকে উঁচুগলায় কথা কইতে শিখিয়েছি; নব-যুগের মুখপাত্র হওয়াটা বাঙালীর পক্ষে একটা কম গৌরবের কথা নয়। চেঁচিয়ে চিন্তা করাই হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতার ধর্ম্ম। কিন্তু আজকের দিনে বাঙলা দেশে সভাজাগানো বক্তা কোথায়? যে দেশে রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, লালমোহন ঘোষ, কালী ব্যানার্জি প্রভৃতির জন্ম, সেই দেশে আজ উচ্চবাচ্য করতে হলে—"মরাহাতি লাখ টাকা" বলে সেই সেকালের সুরেন্দ্রনাথকেই আবার আসরে নামাই; কেননা এ যুগের কণ্ঠ-স্বর এত ক্ষীণ যে, তা দেশের কানে পৌঁছয় না। এককালে প্রবাদ ছিল যে, বম্বেওয়ালারা রাজদরবারে যেতেন হাতে নিয়ে অঙ্ক, আর বাঙালীরা শঙ্খ। সেখানে শঙ্খধ্বনি শুধু বাঙালীতেই করতে পারত। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের হাতের শঙ্খ খসে পড়েছে, অথচ তার বদলে অঙ্কও আসে নি। সে দরবারে এখন মুখে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখরক্ষা করছেন,—শর্ম্মা শাস্ত্রী প্রভৃতি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণ।

এই সব দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের জাতীয় মনটা আজ-কাল ঝিমিয়ে পড়েছে। আর সে মন যে ঝিমিয়েই পড়েছে, তার প্রমাণ—আমাদের মনের গায়ে কেউ হাত দিলে আমরা অমনি চমকে উঠি, তারপরে চোখ রগড়ে লাল করে, যা মুখে আসে তাই বলি, আর সেই কথার নাম দিই জাতীয়-সাহিত্য। কিন্তু এ সব দেখে শুনেও আমি আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইনে। আমার বিশ্বাস বাঙালীজাতি এ যুগে নীরবে নিজের অন্তরে নবশক্তি সঞ্চয় করছে, নবপ্রাণে অনু-

প্রাণিত হচ্ছে। লৌকিক সাহিত্যেই যে জাতীয়-জীবনের যথার্থ বিকাশ—এ কথা আমি মানি নে। একটা বড়গোছের পরি-বর্ত্তনের মুখে, জাতীয় মন স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়, তখন তা রীতিনীতির পরিচিত শামুকের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকতে চায়। যে অতীত আমাদের সমাজ-তরীর পাল হওয়া উচিত, সেই অতীতকে যে আমরা তার নোঙর করতে চাচ্ছি, তার কারণ—আমাদের জাতীয়-জীবনের প্রবাহ ক্রমে যে প্রসারতা লাভ করবে, কল্পনার চোখে তার দুকুল-হারানো চেহারা দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়েছি। তাই আমরা মাঝগাঙ্গে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত থাকবার বৃথা চেষ্টা করছি।

পৃথিবীর কোন জাতই এ যুগে ঘরের কোণে আলগোছ হয়ে থেকে নিজের জাত বাঁচানো দূরে থাক, জানও বাঁচাতে পারবে না। আজকের দিনে পৃথিবীর অনেক জাতিই পরস্পর হতে বিভিন্ন হলেও, কোন দেশই অপর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিছুদিন থেকে পৃথিবীর নানা দেশের ভিতর ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে, পরস্পরের বন্ধনটা ক্রমশ ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হয়ে আসছিল, এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঈর্ষ্যার মাত্রাটাও বেড়ে চলেছিল। এই পৃথিবীজোড়া বিরাট যুদ্ধটার মূলে ছিল—এই জাতিতে জাতিতে দেহের সংস্পর্শ ও মনের অমিল। এবং মানব সভ্যতার এই মহা সমস্যার মীমাংসাটাও এই মহাযুদ্ধেই হবে।

মানবের ভবিষ্যৎ সভ্যতার উপর এই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, সে বিষয়ে ইউরোপে বহুলোকে বহু মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়েছে যে, লোকের আশা তাদের ইচ্ছাকে অনুসরণ করেছে। যাঁর মতে সমাজের যেরূপ পরিবর্ত্তন

হওয়া বাঞ্ছনীয়, তিনি তাঁর কল্পনার চক্ষে ভবিষ্যতের পটে সমাজের সেই নবমূর্ত্তি দেখেছেন। মানুষের পক্ষে এই সর্ব্বনাশের অন্তরে একটা সর্ব্বসিদ্ধির রাজ্যের আবিষ্কার করাও নিতান্ত স্বাভাবিক এবং একেবারে অবৈধ নয়। এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে গেল, অথচ মানবসমাজ যেখানে যেমন ছিল, ঠিক সেখানে তেমনি থাকবে—এ কথা মনে করাও অসম্ভব। এত নরবলিদানেও দেবতা যদি মানুষের উপর প্রসন্ন না হন, তাহলে মানব-জাতির মরাই শ্রেয় ;—অথচ মানুষে বাঁচতেই চায়, মরতে চায় না।

এ যুদ্ধের ফল যে অপূর্ব্ব হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তবে সে ফল, সুফল কি কুফল হবে, সেই নিয়েই ত যত ভাবনা। প্রথম থেকেই আমার ধারণা ছিল যে, এ যুদ্ধে মানুষের মনের কি পরিবর্ত্তন হয়, তার উপরই তার ভবিষ্যৎ সামাজিক ফলাফল নির্ভর করবে। এবং ঘরে বসে কেউ আন্দাজ করতে পারেন না যে, মানুষের মন কোন্ অবস্থায় কোন্ দিকে যাবে—বিশেষত সে অবস্থাটা যদি একেবারে বিপর্য্যস্ত অবস্থা হয়।

জার্ম্মাণী যে মানব-সমাজে ন্যায়ের অপেক্ষা বলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই খড়্গহস্ত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই ; কেননা গত চল্লিশ বৎসর ধরে জার্ম্মাণী এই বলের সাধনা তার নবধর্ম্ম করে তুলেছে, এবং তার গুরুপুরোহিতেও সমগ্র জাতটাকে এই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। এই নবধর্ম্ম দেবদানবের ধর্ম্ম হতে পারে, কিন্তু মানবের নয়। সুতরাং জার্ম্মাণী হারুক আর জিতুক—এই অমানব বা অতিমানব ধর্ম্ম অপর মানবের মনের উপর কতদূর প্রভুত্ব লাভ করবে—সেইটেই ছিল আসল জানবার বিষয়।

জার্ম্মাণীর উপর জয়লাভ করতে হলে, জার্ম্মাণ মনোভাব আয়ত্ত করা ও জার্ম্মাণ রীতিনীতি অবলম্বন করা যে আবশ্যক—এমন কথা গত দু' বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সকল দেশেই শোনা গেছে। সুতরাং কোন কোন সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোক যেমন মরবার আগে নিজের রোগ অস্ত্রচিকিৎসককে দান করে যান, জার্ম্মাণীও যে মৃত্যুর মুখে তার নৈতিক রোগ সমগ্র ইউরোপকে দিয়ে যাবে, এ ভয় পাবার কারণ ছিল।

কিন্তু এখন ভরসা করে বলা যেতে পারে যে, সে বিপদের ভয় কেটে গেছে। রুসিয়ার Czardom হতে মুক্তিলাভ, এবং আমেরিকার এই যুদ্ধে যোগদানই প্রমাণ যে, মানবের স্বাধীনতা যে-সভ্যতার মূলমন্ত্র, সে সভ্যতার জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ এ আশা করা অসঙ্গত হবে না যে, মানুষে তার এ যুগের পাপের, আসছে যুগে প্রায়শ্চিত্ত করবে,—এবং ভবিষ্যতে পরস্পরের প্রতি হিংসার পরিবর্ত্তে পরস্পরের প্রতি মৈত্রীই হবে বিশ্ব-মানবের নব-সভ্যতার অটল ভিত্তি। অতঃপর মানুষে যে শান্তির জন্য লালায়িত হবে, তার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে মৈত্রীর ধর্ম্ম প্রচার করতে হবে, এবং ভবিষ্যৎ সাহিত্যের বলবীর্য্য এই নব-ধর্ম্মের প্রচারেই নিয়োজিত হবে।

এই নব সভ্যতার অংশীদার হবার অধিকারও সকল জাতিরই থাকবে, কেননা এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব অল্পবিস্তর সকল জাতিরই ঘাড়ে পড়বে। কায়মনোবাক্যে যে জাতি এই আদর্শের সাধনা না করবে, সে জাতি বিশ্বমানব-সমাজে পতিত হয়ে থাকবে,—এবং সে সাধনার প্রথম পদ হচ্ছে দেশরক্ষার জন্য মানুষের আত্মোৎসর্গ। কেননা ভবিষ্যতের এই ঈপ্সিত শান্ত সভ্যতা গড়ে তোলবার জন্যে মানুষের বাহুবল

ও ধর্ম্মবল দুয়েরই প্রয়োজন হবে। বলহীন ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মহীন বলের হাতে কিছুই গড়ে ওঠে না—সব ভেঙ্গে পড়ে। ভারতবর্ষে এই নবযুগের নবব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য সর্ব্বপ্রথম বাঙালী যুবকই স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়েছে; সুতরাং বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। ইতিমধ্যে বিজ্ঞেরা মাথা নাড়বেন, কিন্তু সেই শিরোকম্পন দেখে ইতস্তত করবে শুধু তারা, যাদের আত্মশক্তিতে আস্থা নেই। যদি কেউ বলেন এ আশা দুরাশা মাত্র, এবং এ দুরাশা শুধু কল্পনাপ্রসূত, তার উত্তরে আমরা বলি যে, কল্পনা করবার এবং সংকল্প করবার শক্তিই মানুষের যথার্থ আত্মশক্তি ; আশায় বুকবাঁধা ও কোমর বাঁধার নামই পুরুষকার : আমাদের সকল ভাবনার সকল সাধনার শেষ ফল দৈবাধীন। এই সত্য মেনে নিয়েও, মানুষকে যুগে যুগে মানবজীবনটাকে মনের মত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। এ দায় জীবনের দায়, এবং জীবনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় মানুষে শুধু নিজেই ফাঁকি পড়ে।

চৈত্র, ১৩২৩ সন।

প্রাণের কথা।

——◦❋◦——

(ভবানীপুর সাহিত্য-সমিতিতে কথিত)

এরকম সভার সভাপতির প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে প্রবন্ধ-পাঠকের গুণগান করা, কিন্তু সে কর্ত্তব্য পালন করা আমার পক্ষে উচিত হবে কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ ছিল। প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমার বন্ধু এবং সাহিত্যিক বন্ধু। বন্ধুর মুখে বন্ধুর প্রশংসা একালে ভদ্রসমাজে অভদ্রতা বলেই গণ্য। ইংরাজীতে যাকে বলে mutual admiration, সে ব্যাপারটি আমরা নিতান্ত হাস্যকর মনে করি; অথচ এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য যে, গুণানুরাগ উভয়পাক্ষিক না হলে, কি প্রণয় কি বন্ধুত্ব কোনটিই স্থায়ী হয় না। সে যাই হোক্, বন্ধুস্তুতি সাহিত্য-সমাজে যে নিষিদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং যেহেতু আমি বর্ত্তমান সাহিত্য-সমাজের নানারূপ নিয়মভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হয়ে আছি, সে-কারণ আবার একটা নূতন অপরাধে অভিযুক্ত হতে অপ্রবৃত্তি হওয়াটা আমার পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রবন্ধটি শুনে, আমি প্রবন্ধ-লেখকের আর কিছুর না হোক্, সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারছি নে। প্রবন্ধ-পাঠক মহাশয় যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তা যুগপৎ সৎসাহস ও দুঃসাহস। এ পৃথিবীতে মানুষের পক্ষে যা সব চাইতে মূল্যবান অথচ দুর্ব্বোধ্য—অর্থাৎ জীবন,—ঘটক মহাশয়

তারই উপর হস্তক্ষেপ করেছেন। এ অবশ্য দুঃসাহসের কাজ।

ঘটক মহাশয়ের প্রবন্ধের সার কথা এই যে, উপনিষদের সময় থেকে সুরু করে অদ্যাবধি, নানা দেশের নানা দার্শনিক ও নানা বৈজ্ঞানিক, জীবনসমস্যার আলোচনা করেছেন,—কিন্তু কেউ তার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারেন নি। আজ পর্য্যন্ত জীবনের এমন ভাষ্য কেউ করতে পারেন নি, যার উপর আর টীকাটীপ্পনি চলে না।

আমার মনে হয় দর্শনবিজ্ঞানের এ নিষ্ফলতার কারণও স্পষ্ট। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করবার পক্ষে প্রতি লোকের পক্ষে যে বাধা, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই একই বাধা রয়েছে। জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করবে মৃত্যু। মৃত্যুর অপর পারে আছে,—হয় অনন্ত জীবন, নয় অনন্ত মরণ, হয় অমরত্ব নয় নির্ব্বাণ। এর কোন অবস্থাতেই জীবনের আর কোনই সমস্যা থাকবে না। যদি আমরা অমরত্ব লাভ করি, তাহলে জীবন সম্বন্ধে আমাদের জানবার আর কিছু বাকি থাকবে না;—অপর পক্ষে যদি নির্ব্বাণ লাভ করি ত জানবার কেউ থাকবে না। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, সমগ্র মানবজাতি না-মরাতক এ সমস্যার শেষ মীমাংসা করতে পারবে না। আর যদি কোনদিন পারে, তাহলে সেই দিনই মানব-জাতির মৃত্যু হবে;—কেননা তখন আমাদের আর কিছু জানবার কিম্বা করবার জিনিস অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের পক্ষে সর্ব্বজ্ঞ হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল নিষ্ক্রিয় হওয়া, অর্থাৎ মৃত হওয়া; কেননা প্রাণ বিশেষ্যও নয়, বিশেষণও নয়—ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া মাত্র।

জীবনটা একটা রহস্য বলেই মানুষের বেঁচে সুখ। কিন্তু তাই বলে এ রহস্যের মর্ম্ম উদঘাটন করবার চেষ্টা যে পাগলামি নয় তার প্রমাণ, মানুষ যুগে যুগে এ চেষ্টা করে এসেছে, এবং শতবার বিফল হয়েও অদ্যাবধি সে চেষ্টা থেকে বিরত হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে যা সব চেয়ে বড় জিনিস, তা জানবার ও বোঝবার প্রবৃত্তি মানুষের মন থেকে যেদিন চলে যাবে, সেদিন মানুষ আবার পশুত্ব লাভ করবে। জীবনের যাহয় একটা অর্থ স্থির করে না নিলে, মানুষে জীবন-যাপন করতেই পারে না। এবং এ পদার্থের কে কি অর্থ করেন, তার উপর তাঁর জীবনের মূল্য নির্ভর করে। এ কথা ব্যক্তির পক্ষেও যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। দর্শন বিজ্ঞান জীবনের ঠিক অর্থ বার করতে পারুক আর না পারুক, এ সম্বন্ধে অনেক ভুল বিশ্বাস নষ্ট করতে পারে। এও বড় কম লাভের কথা নয়। সত্য না জানলেও মানুষের তেমন ক্ষতি নেই—মিথ্যাকে সত্য বলে ভুল করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং প্রবন্ধলেখক এ আলোচনার পুনরুত্থাপন করে সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়েছেন।

(২)

সতীশ বাবু তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন—এ বিষয়ে যে নানা মুনির নানা মত আছে শুধু তাই নয়, একই রকমের মত নানা যুগে নানা আকারে দেখা দেয়। দর্শন বিজ্ঞানের কাছে জীবনের সমস্যাটা কি, সেইটে বুঝলে—সে সমস্যার মীমাংসাটাও যে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। জীবন পদার্থটিকে আমরা সকলেই চিনি,

কেননা সেটিকে নিয়ে আমাদের নিত্য কারবার করতে হয়। কিন্তু তার আদি ও অন্ত আমাদের প্রত্যক্ষ নয়। সহজ জ্ঞানের কাছে যা অপ্রত্যক্ষ, অনুমান প্রমাণের দ্বারা তারই জ্ঞান লাভ করা হচ্ছে দর্শন বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। জীবনের আদি অন্ত আমরা জানি নে, এই কথাটাকে ঘুরিয়ে দু' রকম ভাবে বলা যায়। এক জীবনের আদিতে আছে জন্ম আর অন্তে মৃত্যু—আর এক, জীবন অনাদি ও অনন্ত। জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক-তত্ত্ব হয় এর এক পক্ষ নয় আর এক পক্ষভুক্ত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য এ দুয়ের কোন মীমাংসাতেই আমাদের জ্ঞান কিছুমাত্র এগোয় না; অর্থাৎ এ দুই তত্ত্বের যেটাই গ্রাহ্য করো না, যা আমাদের জানা তা সমান জানাই থেকে যায়, আর যা অজানা তাও সমান অজানা থেকে যায়। সুতরাং এরকম মীমাংসাতে যাঁদের মনস্তুষ্টি হয় না, তাঁরা প্রথমে জীবনের উৎপত্তি ও পরে তার পরিণতির সন্ধানে অগ্রসর হন। মোটামুটি ধরতে গেলে, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান করে বিজ্ঞান, আর পরিণতির সন্ধান করে দর্শন।

একথা আমরা সকলেই জানি যে, আমাদের দেহও আছে মনও আছে, আর এ দুয়ের যোগসূত্রের নাম প্রাণ। সুতরাং কেউ প্রমাণ করতে চান যে, প্রাণ দেহের বিকার; আর কেউ বা প্রমাণ করতে চান যে, প্রাণ আত্মার বিকার। অর্থাৎ কারও মতে প্রাণ মূলত আধিভৌতিক, কারও মতে আধ্যাত্মিক। সুতরাং সকল দেশে সকল যুগে জড়বাদ ও আত্মবাদ পাশাপাশি দেখা দেয়,—কালের গুণে কখনো এ মত, কখনো ও-মত প্রবল হয়ে ওঠে; সে মতের গুণে নয়—যুগের গুণে। আমার বিশ্বাস একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ

মূলে একই মত। কেননা উভয় মতেই এমন একটি নিত্য ও স্থির পদার্থের স্থাপনা করা হয়, যার আসলে কোনও স্থিরতা নেই।

অবশ্য এ দুই ছাড়া একটা তৃতীয় এবং মধ্য পন্থাও আছে,—সে হচ্ছে প্রাণের স্বতন্ত্র সত্ত্বা গ্রাহ্য করা। এই মাধ্যমিক মতের নাম Vitalism, এবং আমি নিজে এই মধ্যমতাবলম্বী। আমার বিশ্বাস অ-প্রাণ হতে প্রাণের উৎপত্তি প্রমাণ করবার সকল চেষ্টা বিফল হয়েছে। এর থেকে এ অনুমান করাও অসঙ্গত হবে না যে, প্রাণ কখনো অ-প্রাণে পরিণত হবে না। তারপর জড়, জীবন ও চৈতন্যের অন্তর্ভূত যদি এক-তত্ত্ব বার করতেই হয়, তাহলে প্রাণকেই জগতের মূল পদার্থ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে আমরা বলতে পারি,—জড় হচ্ছে প্রাণের বিরাম, ও চৈতন্য তার পরিণাম। অর্থাৎ জড় প্রাণের সুপ্ত অবস্থা, আর চৈতন্য তার জাগ্রত অবস্থা। এ পৃথিবীতে জড় জীব ও চৈতন্যের সমন্বয় একমাত্র মানুষেই হয়েছে। আমরা সকলেই জানি আমাদের দেহও আছে, প্রাণও আছে, মনও আছে। প্রাণকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে এক লম্ফে দেহ থেকে আত্মায় অরোহণ করা যেমন সম্ভব, দর্শনের পক্ষেও এক লম্ফে আত্মা থেকে দেহে অবরোহণ করাও তেমনি সম্ভব। জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হেকেল এবং জর্ম্মাণ দার্শনিক হেগেলের দর্শন আলোচনা করলে দেখা যায় যে, জড়বাদী পরমাণুর অন্তরে গোপনে জ্ঞান অনুপ্রবিষ্ট করে দেন এবং জ্ঞানবাদী জ্ঞানের অন্তরে গোপনে গতি সঞ্চারিত করে দেন। তারপর বাজিকর যেমন খালি মুঠোর ভিতর থেকে টাকা বার করে, এঁরাও তেমনি জড় থেকে মন এবং মন থেকে জড় বার করেন। এ সব দার্শনিক হাতসাফাইয়ের কাজ।

আমাদের চোখে যে এঁদের বুজ্‌রুকি এক নজরে ধরা পড়ে না তার কারণ, সাজানো কথার মন্ত্রশক্তির বলে এঁরা আমাদের নজরবন্দী করে রেখে দেন। তবে দেহ মনের প্রত্যক্ষ যোগ-সূত্রটি ছিন্ন করে, মানুষে বুদ্ধিসূত্রে যে নূতন যোগ সাধন করে, তা টেঁকসই হয় না। দর্শন বিজ্ঞানের মনগড়া এই মধ্যপদলোপী সমাস চিরকালই দ্বন্দ্বসমাসে পরিণত হয়।

(৩)

প্রাণের এই স্বাতন্ত্র্য অবশ্য সকলে স্বীকার করেন না। শুধু তাই নয়, Vitalism কথাটাও অনেকের কাছে কর্ণশূল। এর কারণও স্পষ্ট। Vital force নামক একটি স্বতন্ত্র শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ—প্রাণের উৎপত্তির সন্ধান ত্যাগ করা। এ জগতের সকল পদার্থ সকল ব্যাপারই যখন জড়জগতের কতকগুলি ছোটবড় নিয়মের অধীন, তখন একমাত্র প্রাণই যে স্বাধীন, এ কথা বিনা পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। আপাত দৃষ্টিতে যা বিভিন্ন, মূলত তা যে অভিন্ন, এই সত্য প্রমাণ করাই বিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাণ যে জড়শক্তিরই একটি বিশেষ পরিণাম, এটা প্রমাণ না করতে পারলে বিজ্ঞানের অঙ্কে একটা মস্ত বড় ফাঁক থেকে যায়। গত শতাব্দীতে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সমাজে এই ফাঁক বোজাবার বহু চেষ্টা হয়েছে; কিন্তু সুখের বিষয়ই বলুন আর দুঃখের বিষয়ই বলুন, সে চেষ্টা অদ্যাবধি সফল হয়নি। প্রাণ জড়জগতে লীন হতে কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পঞ্চভূতে মিলিয়ে যাওয়ার অর্থ যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হওয়া, এ কথা কে না জানে?

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে ইউরোপ যা প্রমাণ করতে পারে নি, বাঙলা তা করেছে; অর্থাৎ তাঁর মতে আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু হাতেকলমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার বিশ্বাস, আমাদের দেশের সর্ব্বাগ্রগণ্য বিজ্ঞানাচার্য্য এ কথা কোথায়ও বলেন নি যে, জড়ে ও জীবে কোনও প্রভেদ নেই। আমার ধারণা, তিনি প্রাণের উৎপত্তি নয়, তার অভিব্যক্তি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা যাক্। মানুষমাত্রই জানে যে, যেমন মানুষের ও পশুর প্রাণ আছে, তেমনি উদ্ভিদেরও প্রাণ আছে। এমন কি, ছোট ছেলেরাও জানে যে, গাছপালা জন্মায় ও মরে। সুতরাং মানুষ পশু ও উদ্ভিদ যে গুণে সমধর্ম্মী—সেই গুণের পরিচয় নেবার চেষ্টা বহুকাল থেকে চলে আসছে। ইতিপূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, assimilation এবং reproduction—এই দুই গুণে তিন শ্রেণীর প্রাণীই সমধর্ম্মী। অর্থাৎ এতদিন আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তিই ছিল প্রাণের Least Common Multiple—একালের স্কুলের বাঙলায় যাকে বলে "লসাগু"।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন যে, এ দুই ছাড়া আরও অনেক বিষয়ে প্রাণীমাত্রেই সমধর্ম্মী। তিনি যে সত্যের আবিষ্কার করেছেন সে হচ্ছে এই যে, প্রাণীমাত্রেই একই ব্যথার ব্যথী। উদ্ভিদের শিরায় উপশিরায় বিদ্যুৎ সঞ্চার করে দিলে, ও-বস্তু আমাদের মতই সাড়া দেয়, অর্থাৎ তার দেহে স্বেদ কম্প মূর্চ্ছা বেপথু প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ সব ফুটে ওঠে। এক কথায়, আচার্য্য বসু উদ্ভিদ জগতেও হৃদয়ের আবিষ্কার করেছেন,—পূর্ব্বাচার্য্যেরা উদর ও মিথুনত্বের সন্ধান নিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন।

বসু মহাশয় প্রাণের "লসাগু"তে সন্তুষ্ট না থেকে, তার "গসাগু" অর্থাৎ Greatest Common Measure-এর আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছেন। যখন উদ্ভিদের হৃদয় আবিষ্কৃত হয়েছে, তখন সম্ভবত কালে তার মস্তিষ্কও আবিষ্কৃত হবে। কিন্তু তাতে জড় ও জীবের ভেদ নষ্ট হবে না, কেননা জড়পদার্থের যখন উদরই নেই, তখন তার অন্তরে হৃদয় মস্তিষ্কাদি থাকবার কোনই সম্ভাবনা নেই। যে বস্তুর দেহে অন্নময় কোষ নেই, তার অন্তরে মনোময় কোষের দর্শনলাভ তাঁরাই করতে পারেন, যাঁদের চোখে আকাশকুসুম ধরা পড়ে।

(৪)

আমি বৈজ্ঞানিকও নই, দার্শনিকও নই; সুতরাং এতক্ষণ যে অনধিকার চর্চ্চা করলুম, তার ভিতর চাই কি কিছু সার নাও থাকতে পারে। কিন্তু জীবন জিনিসটে দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের একচেটে নয়, ও-বস্তু আমাদের দেহেও আছে। সুতরাং প্রাণের সমস্যার মীমাংসা আমাদেরও করতে হবে,—আর কিছুর জন্য না হোক, শুধু প্রাণধারণ করবার জন্য। আমাদের পক্ষে বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্চে প্রাণের মূল্য, সুতরাং আমাদের সমস্যা হচ্চে বৈজ্ঞানিক দার্শনিকের সমস্যার ঠিক বিপরীত। প্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর অভেদ জ্ঞান নয়, ভেদজ্ঞানের উপরেই আমাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত। কেননা যে গুণে প্রাণী-জগতে মানুষ অসামান্য— সেই গুণেই সে মানুষ।

উদ্ভিদ ও পশুর সঙ্গে কোন্ কোন্ গুণে ও লক্ষণে আমরা সমধর্ম্মী, সে জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানবজীবনের মূল্য

নির্দ্ধারণ করতে পারি নে, কোন্ কোন্ ধর্ম্মে আমরা ও দুই শ্রেণীর প্রাণী হতে বিভিন্ন, সেই বিশেষ জ্ঞানই আমাদের জীবন-যাত্রার প্রধান সহায়; এবং এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য আমাদের কোনরূপ অনুমান প্রমাণের দরকার নেই—প্রত্যক্ষই যথেষ্ট।

আমরা চোখ মেল্‌লেই দেখতে পাই যে, উদ্ভিদ মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে আছে, তার চলৎশক্তি নেই। এক কথায় উদ্ভিদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে স্থিতি।

তারপর দেখতে পাই, পশুরা সর্ব্বত্র বিচরণ করে বেড়াচ্ছে—অর্থাৎ তাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম হচ্ছে গতি।

তারপর আসে মানুষ। যেহেতু আমরা পশু, সে-কারণ আমাদের গতি ত আছেই, তার উপর আমাদের ভিতর মন নামক একটি পদার্থ আছে, যা পশুর নেই। এক কথায় আমাদের প্রত্যক্ষ বিশেষ ধর্ম্ম হচ্ছে মতি।

এ প্রভেদটার অন্তরে রয়েছে প্রাণের মুক্তির ধারাবাহিক ইতিহাস। উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে গণ্ডীবদ্ধ, অর্থাৎ উদ্ভিদ হচ্ছে বদ্ধজীব। পশু মাটির বন্ধন থেকে মুক্ত, কিন্তু নৈসর্গিক স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অর্থাৎ পশু বদ্ধমুক্ত জীব। আমরা দেহ ও মনে না মাটির না স্বভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, অতএব এ পৃথিবীতে আমরাই একমাত্র মুক্ত জীব।

সুতরাং মনুষ্যত্ব রক্ষা করবার অর্থ হচ্ছে—আমাদের দেহ ও মনের এই মুক্তভাব রক্ষা। আমাদের সকল চিন্তা সকল সাধনার ঐ একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে জীবন যত মুক্ত, সে জীবন তত মূল্যবান। কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে, মানুষের পক্ষে প্রাণী-জগতে পশ্চাৎপদ হওয়া সহজ। প্রাণের প্রতি মূর্ত্ত অবস্থারই এমন সব বিশেষ সুবিধা ও

অসুবিধা আছে যা, তার অপর মূর্ত্ত অবস্থার নেই। উদ্ভিদ নিশ্চল, অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না যোগায় ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে শুকিয়ে মরতে বাধ্য। এই তার অসুবিধা। অপর পক্ষে তার সুবিধা এই যে, তাকে আহার সংগ্রহ করবার জন্য কোনরূপ পরিশ্রম করতে হয় না, সে আলো বাতাস মাটি জল থেকে নিজের আহার অক্লেশে প্রস্তুত করে নিতে পারে। পশুর গতি আছে, অতএব সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পূর্ণ অধীন নয়—সে এক দেশ ছেড়ে আর এক দেশে চলে যেতে পারে। এইটুকু তার সুবিধা। কিন্তু তার অসুবিধা এই যে, সে নিজগুণে জড়জগৎ থেকে নিজের খাবার তৈরি করে নিতে পারে না, তাকে তৈরি-খাবার অতিকষ্টে সংগ্রহ করে জীবন-ধারণ করতে হয়। পোষমানা জানোয়ারের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র, সে উদ্ভিদেরই সামিল—কেননা সে শিকড়বদ্ধ না হোক, শিকলবদ্ধ।

মানুষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার অধীন হতে বাধ্য নয়; সে স্থান ত্যাগ করতেও পারে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বদল করেও নিতে পারে। এ কালের ভাষায় যাকে "বেস্টনী" বলে, মানুষের পক্ষে তা গণ্ডী নয়, মানুষের স্থিতিগতি তার স্বেচ্ছাধীন। এই তার সুবিধা। তার অসুবিধা এই যে, তাকে জীবনধারণ করবার জন্য শরীর ও মন দুই খাটাতে হয়। পশুকেও শরীর খাটাতে হয়, মন খাটাতে হয় না; উদ্ভিদকে শরীর মন দু'য়ের কোনটিই খাটাতে হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদের জীবন সব চাইতে আরামের। পশুর শরীরের আরাম না থাক, মনের আরাম আছে। মানুষের শরীর মন দু'য়ের কোনটিরই

আরাম নেই। আমরা যদি মনের আরামের জন্য লালায়িত হই, তাহলে আমরা পশুকে আদর্শ করে তুলব; আর যদি দেহমন দুয়ের আরামের জন্য লালায়িত হই, তাহলে আমরা উদ্ভিদকে আদর্শ করে তুলব, এবং সেই আদর্শ অনুসারে নিজের জীবন গঠন করতে চেষ্টা করব। এ চেষ্টার ফলে আমরা শুধু মনুষ্যত্ব হারিয়ে বসব। "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্ম ভয়াবহঃ" এই সনাতন সত্যটি মানুষের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, নচেৎ মানব-জীবন রক্ষা করা অসম্ভব। আর একটি কথা, মানুষের পক্ষে জীবন রক্ষা করার অর্থ জীবনের উন্নতি করা। মানুষের ভিতরে বাইরে যে গতি-শক্তি আছে, তা মানুষের মতির দ্বারা নিয়মিত ও চালিত। এই মতিগতির শুভ পরিণয়ের ফলে যা জন্মলাভ করে, তারই নাম উন্নতি। আমাদের মনের অর্থাৎ বুদ্ধি ও হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধনেই আমরা মানবজীবনের সার্থকতা লাভ করি। জীবনকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করে' তোলা ছাড়া আয়ুঃবৃদ্ধির অপর কোনও অর্থ নেই।

শ্রাবণ, ১৩২৪ সন।